সোনারঙ্গ

প্রফুল্লনাথ সেন

বি-এস-সি, এম-বি, মেজর,

আই-এম-এস

পরগণা উত্তর বিক্রমপুর, থানা টঙ্গীবাড়ী, মহকুমা মুন্সীগঞ্জ,

১৯৭২

প্রকাশক :

শ্রীঅশোককুমার সেন
১২/৩/১ সুইনহো স্ট্রীট
কলিকাতা-১৯
ফোন : ৪৭-৭৫৭৮

মুদ্রণ ও বাইণ্ডিং :

রায় প্রেস
১৪৪ কে, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড
কলিকাতা-২৬
ফোন : ৪১-০৭৫৬

প্রাপ্তিস্থান :

১। ডঃ অবলাকান্ত সেনগুপ্ত
'সোনারঙ্গ সম্মিলনী'
২২ সি, রামধন মিত্র লেন
কলিকাতা-৪

২। শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র দাশগুপ্ত
৭/২ বি, জামির লেন
কলিকাতা-১৯

৩। শ্রীঅশোককুমার সেন
১৩/৩/১ সুইনহো স্ট্রীট
কলিকাতা-১৯

৪। শ্রীপ্রমীলা সেন
৯এ/৫৭ ডব্লু-ই-এ করোলবাগ
নিউদিল্লী-৫

৫। শ্রীগুরুপ্রসাদ সেন
বি ১০৭ সরোজিনী নগর
নিউদিল্লী-২৩

ভূমিকা

বহুদিন হইতেই ইচ্ছা ছিল, আমার বংশের একটি ইতিহাস রচনা করি। এবং এই রচনা অল্প অল্প আরম্ভও করিয়াছিলাম। ইতিমধ্যে একদিন বন্ধুবর ডাক্তার অবলাকান্ত সেনের সহিত সাক্ষাৎ হইল। কথাবার্তা হইতে হইতে তিনিই বলিলেন, "শুধু তোমার বংশের ইতিহাস রচনা না করিয়া সমগ্র গ্রামেরই ইতিহাস রচনা কর না কেন?" সেই শুরু। তাহার পর, আমাদের গ্রামের যাহার কাছেই এই বিষয়ে তথ্যাদি সংগ্রহকার্য্যে সাহায্যের জন্য অনুরোধ জানাইয়াছি, তাঁহারা সকলেই আমাকে অকৃপণভাবে সাহায্য করিয়াছেন ও উৎসাহ দিয়াছেন।

দেশ বিভাগের পর, সোনারঙ্গবাসীরা সকলেই ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছেন। আমার এই গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্যই হইল, সেই সব ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত গ্রামবাসীদের এই গ্রন্থের মাধ্যমে পরস্পরের নিকটবর্ত্তী করা—তাহাদের একসূত্রে আবদ্ধ করা।

আমি এই গ্রন্থের কোন কোন স্থানে, বিশেষ "প্রাচীন বাংলার কথা" পরিচ্ছেদ, কিছু বিখ্যাত লেখকদের রচনা হইতে কয়েকটি অনুচ্ছেদ প্রায় অবিকলভাবে উদ্ধৃত করিয়াছি। সেই সব লেখকদের নাম আমি নির্দ্দেশিকাতে উল্লিখিত করিলাম।

এই গ্রন্থের ভাষার মধ্যে একটু বৈশিষ্ট্য আছে। আমি প্রয়োজনানুসারে স্থানে স্থানে আমাদের পূর্ব্ববঙ্গীয় ভাষা কিছু মিশ্রিত ভাষা ও বিশুদ্ধ ভাষা ব্যবহার করিয়াছি।

ছাপার কিছু ভুল-ভ্রান্তি থাকা সম্ভব। তাহা মার্জ্জনীয়। বিশেষ করিয়া প্রথম দিকের পৃষ্ঠা কয়টিতে সোনারঙ্গের স্থলে সোনারং এবং রোষ বংশের স্থলে রোক্ষ বংশ হইয়াছে। উহা পাঠকেরা মার্জ্জনা করিবেন।

পরিশেষে, আমার এই রচনা কার্য্যে অনেকেই নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহাদের সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

৯এ।৫৭ ডবলিউ, ই, এ,
করোলবাগ, নিউ দিল্লী-৫ প্রফুল্লনাথ সেন
৩১-৩-৭০

আশার্ব্বাণী

সোনারঙ্গ গ্রাম ও তাহার বৈচিত্র্য সোনারঙ্গবাসীদের নিকট এখন স্মৃতি মাত্র। এই দরদী প্রয়াস খানি সেই স্মৃতি চারণে সহায়তা করিবে। যাহাদের সোনারঙ্গ গ্রাম সম্বন্ধে কোনও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নাই, অথচ নানা অনুসন্ধিৎসা আছে, আশা করি তাহারা এই প্রবন্ধাবলী পড়িয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিবেন। প্রকৃত গ্রামদরদী হিসাবে এই প্রয়াস নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবী রাখে।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র দাশগুপ্ত

উৎসর্গ

অতীত, বর্ত্তমান ও আগামী দিনের
সোনারঙ্গবাসীদের উদ্দেশ্যে

নিবেদন

আমার স্বামীর সারা জীবনের আনন্দ ও আকাঙ্ক্ষায় ভরা এই বইখানা। নিজের গ্রামের লোকের প্রতিটি ঘরে সোনারঙ্গের পুরানো স্মৃতি আবার জেগে উঠবে এই বই-এর মাধ্যমে, এই ভেবে তিনি কত আনন্দ পেতেন। কত অধীর আগ্রহ ছিল তাঁর সেই দিনের জন্য, যেদিন এই বই ছাপা হয়ে ঘরে আসবে। কিন্তু বিধাতার অমোঘ বিধানে বইখানা ছাপাতে দিয়ে তিনি চিরশান্তিধামে চলে গেলেন।

আমার বেদনা জড়িত মনের এই প্রার্থনা, তাঁর এই সোনারঙ্গের স্মৃতি কথা সবাই শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করে তাঁর স্মৃতি স্মরণে রাখুন—তাতে তাঁর আত্মার পরিতৃপ্তি ও শান্তি হবে।

প্রমীলা সেন

সূচীপত্র

নির্দ্দেশিকা

১। রমেশ চন্দ্র মজুমদার, বাংলার ইতিহাস, ১ম খণ্ড

২। সৈয়দ মুজ্‌তবা আলী, রামকৃষ্ণ

৩। যোগেন গুপ্ত, বিক্রমপুরের ইতিহাস, ১ম খণ্ড

৪। হিমাংশু চাটার্জী, বিক্রমপুর, ৩য় খণ্ড

৫। আদিনাথ সেন, দীননাথ সেনের জীবনী

৬। ক্ষিতিমোহন সেন, চিন্ময় বঙ্গ

৭। প্রফুল্লচন্দ্র সেন, আউটশাহীর ইতিহাস

৮। নীহার রঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস আদিপর্ব

৯। নীরদচন্দ্র চৌধুরী, বাঙ্গালী জীবনে রমণী

১০। সুধীরঞ্জন দাশ, যা দেখেছি, যা পেয়েছি

১১। Sedition (Rowlatt) Committee's Report, 1918.

১২। Nalini Kanta Bhattashali, Report on Dacca Museun

১৩। Prof. L. Mukherjee, History of Ancient India.

১৪। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

। প্রথম পরিচ্ছেদ ।

প্রস্তাবনা

"বিস্মৃত যত নীরব কাহিনী স্তম্ভিত হয়ে রও
ভাষা দাও তারে হে মুণী অতীত কথা কও কথা কও ॥"

বর্ত্তমানের কথা আমার বলিবার কিছুই নাই, যাহা বলিব তাহা অতীতের কথাই, যতটুকু মনে আছে। অতীতের কথা বলিতে গেলে গান্ধার রাজকন্যা গান্ধারীর কথা আমার মনে পড়ে, আর মনে পড়ে কপিশার রাজপুত্র গুণবর্মনের কথা, যিনি তাঁহার ফেরী-গাঁথা দিকে দিকে সিংহলে, সুবর্ণদ্বীপে, কাঁথিতে গাহিয়া বেড়াইতেন। আজ এতকাল পরে গান্ধারে কিম্বা কপিশাতে তাঁহাদের আর কেহ মনে রাখে নাই। আমাদের সোনারং-এরও হয়তো সেই অবস্থাই হইবে। হয়তো তাহা হইত না। আমাদের অবিমৃষ্যকারিতার জন্য তাহা সম্ভব হইয়াছে। কথিত আছে কালনেমীর লংকা ভাগের সময় কেহ নাকি বলিয়াছিলেন, কাশ্মীর পাকিস্থানভুক্ত হউক, পরিবর্ত্তে পূর্ব্ববঙ্গ ভারতের অংশ থাকুক। কিন্তু আমাদের তৎকালীন কংগ্রেস নেতারা অতি সমৃদ্ধ সংস্কৃতি সম্পন্ন সমতট সভ্যতার বিনিময়েও লুপ্ত গৌরব কাশ্মীর ছাড়িতে রাজি হইলেন না। আমরা আমাদের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য, আমাদের জন্মভূমি চিরতরে হারাইলাম। যে বিরাট সভ্যতা যুগে যুগে এই সমৃদ্ধশালী সমতটকে কেন্দ্র করিয়া বর্দ্ধিত ও পুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা কতিপয় ব্যক্তির ইচ্ছার মান রাখিতে গিয়া চিরকালের জন্য হারাইয়া গেল।

। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

"গ্রাম প্রতিষ্ঠাতা সূর্য্য সেনের কথা"

সোনারং-এর কথা বলিতে গেলে প্রথমেই বলিতে হয় তাহার প্রধান বংশের কথা—ধন্বন্তরী গোত্রীয় রোক্ষবংশের কথা। সোনারংয়ে এই বংশের প্রতিষ্ঠা করেন মহাপণ্ডিত ও সাধক সূর্য্য সেন কবিরাজ। আনুমাণিক পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে কালিয়া বা সেনহাটি হইতে আসিয়া তিনি এখানে বসবাস আরম্ভ করেন। কথিত আছে প্রথম জীবনে তিনি অত্যন্ত নির্ব্বোধ ছিলেন এবং লেখাপড়াও কিছু শেখেন নাই। কিশোর বয়সে একবার তিনি পিতা বিদ্যাধর সেনের সহিত লাঙ্গলবন্ধে (বর্ত্তমান নারায়ণগঞ্জের নিকটে) ব্রহ্মপুত্রে স্নান করিতে আসিয়া হারাইয়া যান। সোনারং গ্রামের নিকটস্থ পুরাপাড়া গ্রামের শ্রীমহানন্দ চক্রবর্ত্তী তাহাকে পাইয়া নিজ গৃহে নিয়া আসেন। তিনিও কতিপয় স্নানার্থীর সহিত ব্রহ্মপুত্র স্নানে আসিয়াছিলেন। সূর্য্য সেন তাঁহার পিতার নাম-ধাম বা ঠিকানা কিছুই বলিতে পারিলেন না। চক্রবর্ত্তী মহাশয় পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার টোলে বহু সংখ্যক পাঠ্যার্থী পড়িত। তখন সোনারং গ্রাম বন জঙ্গলে পূর্ণ ছিল এবং বসতি ছিল কিনা তাহার কোন প্রমাণ এখন পাওয়া যায় না। যাহা হউক, উত্তর কালে যেস্থানে দক্ষিণপাড়া ভুঁইয়াদের বসতবাটি ছিল, সেই স্থান তখন নিবিড় জঙ্গল ছিল। দিনেও সেখানে কেহ ঢুকিতে সাহস পাইত না। একদিন মহানন্দ ঠাকুর সূর্য্য সেনকে ঐ জঙ্গল হইতে তালপত্র সংগ্রহ করিয়া আনিতে আদেশ দিলেন। সূর্য্য সেন তাল

বৃক্ষে আরোহণ করিয়া তালবৃন্ত ছেদন করিতে উদ্যত হইলে এক বৃহৎ সর্প তাহার বাহুমূল বেষ্টন করিয়া ধরে। ইহাতে সূর্য্য সেন দিশেহারা হইয়া পড়েন। ঘটনাক্রমে এক সন্ন্যাসী তখন ঐ তালবৃক্ষের নীচ দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি সূর্য্য সেনের ঐরূপ অবস্থা দেখিয়া তাহাকে তালবৃন্ত দিয়া সাপটিকে কাটিয়া ফেলিতে বলিলেন। সূর্য্য সেন তাহাই করিয়া সাপটির কবল হইতে মুক্তি পান। ঐ সন্ন্যাসীরই আশীর্ব্বাদে বা অধ্যাপনায় মুর্খ সূর্য্য সেন ক্রমে মহাপণ্ডিত হইয়া উঠেন। পরবর্ত্তী কালে তিনি সেই স্থানে আপন বাসস্থান স্থাপন করেন। ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াও তিনি কিন্তু তাহার আশ্রয়দাতা মহানন্দ ঠাকুরের কথা ভুলিলেন না। তাঁহাকে আপন কুলপুরোহিত নিযুক্ত করিলেন। সেই স্মরণাতীত কাল হইতে সেই মহানন্দের বংশধরগণই সূর্য্য সেনের বংশধরদের কুল পুরোহিতের কাজ করিয়া আসিতেছেন।

সোনারং গ্রামের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট জমির উপর সূর্য্য সেনের বসতবাটি অবস্থিত ছিল। প্রায় চতুষ্কোণ উচ্চ সমতল ভূমির উপর এই বসতবাটি নির্মিত হইয়াছিল। ইহা দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ৬০০ বর্গগজ এবং ইহার তিন দিক জলপূর্ণ একটি খাল পরিখার মত ইহাকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছিল। শুধু উত্তর দিকে ইহা গ্রামের সহিত সংশ্লিস্ট ছিল। উত্তরে এক বিস্তৃত দীর্ঘিকা এবং বাড়ীর অন্দর মহলেও দুইটি ছোট পুষ্করিণী ছিল। একটি অন্দর মহলের দক্ষিণে অপরটি পূর্ব্ব দিকে। পূর্ব্ব দিকের পুষ্করিণীটির পশ্চিম তীরে বিস্তীর্ণ বাঁধানো সিঁড়ি এবং স্নানাগার ইত্যাদি ছিল। এই পুষ্করিণীর সহিত নানা কিম্বদন্তী আছে। এইসব কাহিনী আমরা আজকাল ঠাকুরমার ঝুলির রূপকথার মতই

ভাবি। এইসব কাহিনীর সত্যতা নিরূপণের চেষ্টা কেহ করেন নাই।

একটি কাহিনী এইরূপ ঃ এই পুকুরে 'সোনার নাও পবনের বৈঠা' ঘুরিয়া বেড়াইত। মৃদুমন্দ হাওয়া বহিতে থাকিলে এই সোনার নাও পুকুরের জলে ভাসিয়া উঠিত। বাতাস বন্ধ হইলেই আবার জলে তলাইয়া যাইত। কেন যে এই নৌকা আপনা হইতে ভাসিয়া উঠিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত তাহার উল্লেখ কিম্বদন্তীতে নাই। এমন ভাবে অনেক দিন কাটিয়াছিল। তাহার পর এক দাসী উঠান ঝাড়া ঝাড়ু দিয়া ইহাকে আঘাত করে। সেই হইতে নৌকা জলের তলায় ডুবিয়া যায়, আর তাহাকে কেহ কোনদিন দেখে নাই।

দ্বিতীয় কাহিনী এই ঃ শিকল দিয়া বাঁধা সাতটি ঘড়া পুকুরে ঘর্ঘর শব্দ তুলিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত। ইহাতে কি ছিল কিম্বদন্তীর সেকথা আমার মনে নাই। এবিষয়ে কিছু আলোপাত করিতে পারেন এমন কেহ আর বর্ত্তমানও নাই। এই সম্বন্ধে শেষ সংবাদ যে ঐ দাসী যখন সম্মার্জ্জনী প্রহার করে তখন ঐগুলি পুকুরের উত্তর পূর্ব্ব কোণ দিয়া বাহির হইয়া যায়। তাহার পর হইতে পুকুরের গভীরে তাহাদের চলার ঘর্‌ঘর্‌ শব্দ আর শোনা যায় নাই।

তৃতীয় কাহিনী এই ঃ বাড়ীতে কোন উৎসব হইলে প্রয়োজনীয় বাসনপত্রাদি এই পুকুরে খবর দিলেই পাওয়া যাইত। একখানি কাগজে প্রয়োজনীয় জিনিষের তালিকা লিখিয়া জলে ফেলিয়া দিলেই, কিছুক্ষণ পরে ঐ সব বাসনপত্র জলের উপর ভাসিয়া উঠিত। পরে প্রয়োজন শেষ হইলে ঐ বাসনপত্র ভালরূপে মাজিয়া ঘসিয়া জলে ছাড়িয়া দিলেই, তাহারা জলের নীচে অদৃশ্য

হইত। বরাবর এইভাবে চলিতেছিল। পরে বাড়ীর এক ছেলে গ্রামেরই "পাটপাতা সেনের" বাড়ীর মেয়েকে বিবাহ করে এবং এই মেয়ের সাথে একটী দাসী আসে। এই দাসী একখানা বাসন লুকাইয়া ফেলে। বাসনের সংখ্যা কম হইলে বাসনগুলি নাকি আর ডুবিয়া যাইত না, যতক্ষণ না সংখ্যা পূর্ণ করিয়া দেওয়া হইত। এইদিনও বাসন আর ডুবিল না। কিন্তু শত চেষ্টাতেও নাকি আর ঐ বাসন পাওয়া যায় নাই। বাসন আর পাওয়া গিয়েছিল কিনা, এবং সব বাসন জলে ডুবিয়া গিয়াছিল কিনা কিম্বদন্তী সে বিষয়ে নীরব, অথবা আমারই আর মনে নাই। কিন্তু ঐ ঘটনার পর হইতেই নাকি বাসন আর শত অনুরোধ সত্ত্বেও ভাসিয়া উঠে নাই।

এইসব ঘটনা কবে কোন সময়ে ঘটিয়াছিল তাহার কিম্বদন্তী নাই। কিন্তু এই সব ঘটনা গ্রামের সকল শ্রেণীর লোকের কাছেই শোনা যাইত। অতি প্রাচীনকাল হইতে, বোধ হয় যখন লোকে এইসব অবিশ্বাস্য কথা বিশ্বাস করিত, এসব কথা লোকের মুখে মুখে চলিয়া আসিয়াছিল। বেশ কিছু কাল আগে, গ্রাম হইতে সহস্র মাইল দূরে এই দিল্লীতে বসিয়া আমা হইতে প্রাচীনতর, আমার গ্রামস্থ এক বৃদ্ধ আত্মীয়ের নিকটে এই কিম্বদন্তীগুলি আবার নূতন করিয়া শুনিলাম। তিনি প্রাচীনপন্থী, সরল বিশ্বাসেই কাহিনীগুলি বলিলেন। কাহিনীগুলি অবিশ্বাস্য, কিন্তু প্রতিবাদ করিবার কিছুই নাই।

আমাদের এই বসত বাড়ীতে সাধক সূর্য্য সেনের আসন প্রোথিত আছে। এই আসনে বসিয়া সূর্য্য সেন সাধনায় সিদ্ধিলাভ

করিয়াছিলেন। "সিদ্ধিলাভ" সম্বন্ধে আমার কোন ধারণা নাই, তবে সূর্য্য সেন সিদ্ধিলাভ করিয়া ছিলেন আমরা কেবল ইহাই শুনিয়াছি। সিদ্ধিলাভ কাহাকে বলে, ইহা কাহাকেও জিজ্ঞাসা করি নাই। ছেলেবেলায় গ্রামের সেই পারিপার্শ্বিক অবস্থাতে সিদ্ধিলাভ করা ব্যাপারটা বোঝা যেন বালকবৃদ্ধ সকলের পক্ষেই স্বাভাবিক ছিল। এই বিষয়ে প্রশ্ন করাটা যেন মূর্খতারই পরিচয়। তাই কাহাকেও ইহার অর্থ বলিয়া দিতে অনুরোধ করি নাই বা করিবার প্রয়োজন বোধ করি নাই। আজ মনে প্রশ্ন জাগিয়াছে কিন্তু উত্তর দিবার লোক নাই। কাহাকে প্রশ্ন করিব? এই আসন বোধহয় ইষ্টকে নির্মিত ছিল। এবং কথিত আছে ইহার নীচে পাঁচজন চণ্ডালের করোটী এবং এইরূপ কত কি প্রোথিত আছে। এই সব শুনিয়া মনে হয় সূর্য্য সেন তন্ত্রসাধনা করিতেন। কিম্বদন্তী আছে যে সূর্য্য সেনের অধস্তন তেরো পুরুষে আবার এক ব্যক্তির আবির্ভাব হইবে যে ঐ আসনে বসিয়া সাধনায় আবার সিদ্ধিলাভ করিবেন। তিনি হয়তো এখনও জন্মগ্রহণ করেন নাই। কারণ যাঁহারা এই পুরুষে আজ পর্য্যন্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রায় সকলকেই আমি চিনি। সাধনা করিবার ইচ্ছা আছে, এরূপ তো কাহাকেও মনে হয় না। তাছাড়া সে আসনও এখন আমাদের নাগালের বাহিরে।

এই আসনখানা আমাদের এবং বৈকুণ্ঠ ভুঁইঞার বাড়ীর মাঝামাঝি এক জায়গায় প্রোথিত আছে। ঐ বাড়ীর রামমণি সেন মহানন্দ ঠাকুরের বংশধর কুলপুরোহিতকে নিয়া ঐ আসনে গিয়া যোগাসনে বসিয়াছিলেন। পরের দিন প্রাতে রামমণি সেন এবং কুলপুরোহিতকে আসন হইতে দূরে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অজ্ঞান

অবস্থায় পাওয়া যায়। ইহার পর ঐ আসনে বসিবার চেষ্টা আর কেহ করে নাই।

সূর্য্য সেনের কাল আমি ৫০০শত বৎসর পূর্ব্বে বলিয়া অনুমান করিয়াছি। ইহার কারণ সূর্য্য সেন হইতে আমি অধস্তন তেরো পুরুষ। তিন পুরুষে শত বর্ষ ধরিলে তেরো পুরুষে কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে চারিশত পঞ্চাশ বৎসর হয়। সুতরাং সূর্য্য সেন পঞ্চদশ শতাব্দীর কোনও সময়ে জীবিত ছিলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি সূর্য্য সেন রোক্ষ বংশীয় ধন্বন্তরী গোত্রীয় ছিলেন। তাহার পূর্ব্ব পুরুষ শ্রীহর্ষ সেন সেনভূমের রাজা ছিলেন। কমল ও বিমল নামে তাঁহার দুই পুত্র ছিল। কমল পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত হন। বিমল সেনভূম ছাড়িয়া বর্ত্তমান রানাঘাটের অন্তর্গত ফুলিয়া গ্রামের নিকটবর্ত্তী মালঞ্চ গ্রামে আসিয়া বাসস্থান স্থাপন করেন। বিমলের পুত্র বিনায়ক সেন মহাপণ্ডিত ছিলেন। তিনি বাংলার কোন এক রাজার সভা পণ্ডিত ছিলেন। বিনায়ক সেনের বংশে রোক্ষনামে এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম হইতে তাঁহার বংশধরগণ রোক্ষ-বংশ বলিয়া পরিচিত হন। সূর্য্য সেন এই রোক্ষ সেন হইতে নবম পুরুষ। এবং রাজা শ্রীহর্ষ হইতে ত্রয়োদশ পুরুষ। সূর্য্য সেন সোনারংয়ে এই বংশ স্থাপন করেন। ইহা হইতেই তাহার বংশধরগণ সোনারংয়ের রোক্ষ বংশীয় বলিয়া পরিচিত হন।

সম্ভবতঃ বিমলের বংশধরগণ বিনায়ক সেন, রোক্ষ সেন, প্রভৃতি মালঞ্চ গ্রামেই বাস করিতেন। কিন্তু রোক্ষ বংশের পরবর্ত্তী ইতিহাসে দেখা যায় যে তাহার অধস্তন সপ্তম পুরুষ

উর্দ্ধরণ সেন সেনহাটি কালিয়াতে বাস করিতেছেন। এই বংশের কে, কখন মালঞ্চ হইতে সেনহাটি কালিয়াতে আসিয়া বাসস্থান স্থাপন করেন তাহার কোন প্রমাণ নাই। উর্দ্ধরণের পুত্র বিদ্যাধর সেনহাটি কালিয়াতেই ছিলেন। বিদ্যাধরের পুত্র সূর্য্য সেন সোনারঙ্গে আসিয়া বাসস্থান স্থাপন করেন। সূর্য্য সেনের আর কোন ভাই ছিল কিনা এবং থাকিলে তাহাদের বংশধরগণ কোথায় বাস করিতেন তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া

সূর্য্য সেন কবিরাজ ছিলেন। তাহার পুত্র হৃদয়ানন্দ সেন এবং দুই পৌত্র গঙ্গাধর সেন ও রঘুনাথ ভূঁ-ঞাও কবিরাজ ছিলেন। চতুর্থ পুরুষও কবিরাজ ছিলেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ-যোগ্য, শ্রীরঘুনাথ সেন কবিরাজের কথা। সূর্য্য সেনের পৌত্র এই রঘুনাথ সেন খ্যাতিমান কবিরাজ ছিলেন। তিনি মুর্শিদা-বাদের কোন এক নবাবের বেগমকে উৎকট ব্যাধি হইতে নিরাময় করেন এবং তাহাতে নবাব পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে এক সোনার পাল্কি উপহার দেন ও ভূঁঞা উপাধিতে ভূষিত করেন। সেই হইতে তাঁহার বংশধরগণ 'ভূঁঞা' নামে পরিচিত হন।

সোনারংয়ের ভূঁঞাদের বসতবাটি দেখিয়া মনে হয় এক সময়ে, সম্ভবতঃ রঘুনাথ সেনের সময় তাহাদের অবস্থা বিশেষ সমৃদ্ধ ছিল। রঘুনাথ সেনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গঙ্গাধর সেনের বংশ-ধরগণ পরবর্ত্তী যুগে সরকার, লস্কর, মজুমদার ও রমাকান্ত নামে পরিচিত হন। উত্তর পাড়া, ছোট উত্তর পাড়া এবং নৈরবাড়ীর রোক্ষ বংশীয়গণও এই গঙ্গাধরের সন্তান ছিলেন। যদিও ইহারা

এবং ভূঁঞারা একই বংশের লোক ছিলেন, তবুও আমরা দেখিয়াছি ভূঁঞাদের সহিত ইহাদের কোনরূপ জ্ঞাতিসুলভ ক্রিয়াকলাপ ছিল না। এমনকি ভূঁঞারা ইহাদের বাড়ীতে আহারাদি পর্য্যন্ত করিতেন না। মনে হয় রঘুনাথ সেন এবং গঙ্গাধর সেনের মধ্যে কোনরূপ বিরোধ ঘটিয়াছিল, যাহার ফলে দুই ভ্রাতা এবং তাহাদের বংশধরগণের মধ্যে এই সামাজিক বিরুদ্ধতা গড়িয়া উঠিয়াছিল।

গঙ্গাধর সেন পৈত্রিক বসতবাড়ী ত্যাগ করিয়া গ্রামেরই অন্যত্র আপনার বাসভবন স্থাপন করেন। উত্তরকালে দেখি এই ভূঁঞা বাড়ীও দ্বিধাবিভক্ত—দক্ষিণ পাড়ার ভূঁঞা বাড়ী এবং পশ্চিম পাড়ার ভূঁঞা বাড়ী। এই বিভাগের কারণ স্বরূপ একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। তবে কাহিনীটী কিম্বদন্তী নহে, ইহা ইতিহাস। রঘুনাথ সেনের পুত্র লক্ষ্মণ সেনের দুই পুত্র—বিশ্বেশ্বর ও শিব-প্রসাদ। এই সময়ে বিক্রমপুর বৈদ্য সমাজের সমাজপতি হিসাবে সোনারং রোক্ষবংশীয় ভূঁঞাদের খুব নামডাক ছিল। বিশ্বেশ্বর প্রতিদিন সকালে "মটুকপুরের" দরজা দিয়া ঘোড়া ছুটাইয়া প্রাতঃভ্রমণে যাইতেন। এই "মটুকপুরের" দরজা নামে খ্যাত বিস্তীর্ণ রাজপথের কিয়দংশ আমরা দেখিয়াছি। ইহা আমাদের গ্রাম হইতে প্রায় তিন মাইল দক্ষিণে অবস্থিত ছিল এবং এখনও আছে। ইহা প্রস্থে প্রায় পঞ্চাশ গজ এবং দৈর্ঘ্যে তখনও মাইলখানেক ছিল। কথিত আছে, সে সময় ন' পাড়ার জমিদার চৌধুরীরা অত্যন্ত পরাক্রমশালী ছিলেন। কিন্তু বংশ মর্য্যাদায় সমাজের নিম্নস্তরে থাকাতে উচ্চবংশীয়রা কেহ তাহাদের সহিত বিবাহাদি সামাজিক ক্রিয়াকলাপ করিতেন না। কুলীনদের কথা

অবশ্য আলাদা ছিল। উপযুক্ত কৌলিন্য পাইলে তাঁহারা সর্ব্বত্রই বিবাহাদি করিতেন। কিন্তু রোক্ষবংশীয় সমাজপতিগণ কখনও এইরূপ নিম্নস্তরের লোকের সহিত কোন সামাজিক ক্রিয়া করিতেন না।

বিশ্বেশ্বর একদিন ঐ "মটুকপুরের দরজা" দিয়া ঘোড়া ছুটাইয়া যাইতেছিলেন। তখন "ন" পাড়ার (বহরের) চৌধুরীরা তাঁহাকে ধরিয়া নিয়া যায় এবং তাহাদের এক কন্যাকে বিবাহ করিতে অনুরোধ করে। তিনি তাহাতে রাজী না হওয়ায় তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখে। শিবপ্রসাদ এই খবর পাইয়া ভাইকে মুক্ত করিতে বহু চেষ্টা করেন। কিন্তু কিছুতেই কৃত-কার্য্য না হইয়া তিনি চৌধুরীদের বলিয়া পাঠান যে তিনি নিজেই তাহাদের কন্যাকে বিবাহ করিতে সম্মত আছেন। তিনি ঐ কন্যাকে বিবাহ করেন এবং ভ্রাতাকে মুক্ত করিয়া নিয়া আসেন। কিন্তু ইহাতে হিতে বিপরীত হইল। কুল হারাইয়াছে বলিয়া বিশ্বেশ্বর ভ্রাতার উপর ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং ভ্রাতার আর মুখদর্শন করিবেন না বলিয়া দক্ষিণ পাড়ার নিজ বসতবাটি ত্যাগ করিয়া পশ্চিম পাড়ায় গিয়া নতুন ভিটা স্থাপন করিলেন। ভাই-এর সাথে আর কোন রূপ সামাজিক বন্ধন রাখিলেন না। সেই হইতে ভূঁঞা বাড়ী দ্বিধাবিভক্ত হইয়া গেল। এবং পশ্চিম পাড়ার ভুঞারা দক্ষিণ পাড়ার ভূঞাদের বাড়ীতে আহারাদিও করিতেন না। বিশ্বেশ্বর ভাইয়ের উপর এতদূর ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন যে মৃত্যুর সময়ে শিবপ্রসাদ দেখা করিতে আসিলে তিনি তাঁহার চক্ষুদ্বয় বন্ধ করিয়া রাখেন এবং কিছুতেই শিবপ্রসাদের মুখদর্শন করেন নাই।

যে ভ্রাতৃবিরোধ গঙ্গাধরকে নিজের বসত বাড়ী হইতে সরাইয়া নিতে এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা রঘুনাথ হইতে সমস্ত সামাজিক ক্রিয়াকলাপ বন্ধ করিতে বাধ্য করিয়াছিল, কতিপয় পুরুষ পরে বিশ্বেশ্বর ও শিবপ্রসাদের বেলায়ও তাহাই ঘটিয়া গেল।

। তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

সোনারং গ্রামের ভৌগলিক অবস্থান ও প্রাচীন বাংলার কথা

(ক) বিক্রমপুর

সোনারং গ্রামের কথা বলিতে গেলে আগে বিক্রমপুরের কিছুটা পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। ১৯৪৭ খৃঃ পূর্ব্বে যে অঞ্চলকে বাংলাদেশ বলা হইত সেই বাংলা দেশের ঢাকা জেলায় বিক্রমপুর পরগণা অবস্থিত। বিক্রমপুর অতি প্রাচীন স্থান। যে সময়ে সুবর্ণগ্রাম, নবদ্বীপ বা সপ্তগ্রামকে কেহ জানিত না। তাহারও পূর্ব্বে বিক্রমপুর শিক্ষায়, সভ্যতায়, কৃষ্টিতে সুপরিচিত জনপদ ছিল। পূর্ব্ব বাংলার বৃহত্তম প্রাচীন নগর ছিল বিক্রমপুর। বিক্রমপুর কোন এক সময়ে একটী নগরই ছিল। কালক্রমে সমগ্র পরগণাটি বিক্রমপুর নামধারণ করে। বিক্রমপুর পূর্ব্বে বিক্রমণিপুর নামে খ্যাত ছিল।

বিক্রমপুর চন্দ্র, বর্ম, সেন ও দেব বংশীয় রাজাদের অন্যতম জয়স্কন্দাবার ছিল। পরে মুসলমান যুগের প্রাক্কালে রাজা দনুজ রায়ের সময় স্কন্দাবার বিক্রমপুর হইতে সুবর্ণগ্রামে স্থানান্তরিত হয়। মুসলমান যুগে পূর্ব্ব বাংলার রাজধানী সুবর্ণগ্রামে প্রতিষ্ঠিত ছিল।

এই স্থানান্তরের পূর্ব্বে বিমক্রপুর নগরের নাম 'রামপাল' হইয়া গিয়াছিল।

এই বিক্রমপুরের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে মহকুমা শহর মুন্সিগঞ্জের তিন মাইল পশ্চিমে রামপাল নামক স্থানে প্রায় পনেরো বর্গমাইল জুড়িয়া এক সুপ্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ আছে। এই সুবিস্তৃত ধ্বংসাবশেষের উপর প্রায় সতেরো-আঠারোটি গ্রাম অবস্থিত ছিল। সমগ্র স্থানটির ভৌগলিক অবস্থান উল্লেখযোগ্য। উত্তরে ইছামতী নদী - এই নদীর প্রাচীন ধারার দক্ষিণকূলে ইহার সমান্তরাল একটী প্রাচীন ধ্বংসপ্রাপ্ত নগর প্রাচীরের অবশেষ এখনও দেখা যায়। পূর্বে প্রাচীন ব্রহ্মপুত্রের খাত। পশ্চিমে ও দক্ষিণে সুগভীর পরিখা। পশ্চিমের পরিখাটি সোনারং মীরকাদিন খাল নামে বর্ত্তমানে পরিচিত এবং দক্ষিণের পরিখাটীর নাম মাকুহাটির খাল। এই সুপরিবেষ্ঠিত অঞ্চলের মধ্যস্থলে উচ্চতর ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত পরিখাবেষ্ঠিত বিরাট এক রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ ছিল। এই প্রাসাদ "বল্লালবাড়ী" নামে বিখ্যাত। বল্লালবাড়ীর বিখ্যাত গজরীবৃক্ষ, অনতিদূরে রামপালের দীঘি, রাজা হরিশচন্দ্রের দীঘি, প্রভৃতি আমরা বাল্যকালে দেখিয়াছি। জোড়ার দেউল, বজ্রযোগিনী, সুহামপুর, আটপাড়া, পঞ্চসার, চাঁপাবলী, সোনারং, নাটেশ্বর, পাইকপাড়া, আবদুল্লাপুর ইত্যাদি নিয়া রাজধানী রামপাল গড়িয়া উঠিয়াছিল। রামপালের গজারী বৃক্ষের কাহিনী এখানে বিবৃত করিলে বোধকরি অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

রামপালের কাহিনীটি হরিশচন্দ্রের দীঘি লইয়া। এই দীঘিটী বল্লালবাড়ীর অনতিদূরে ছিল। এবং এই দীঘিতেই আমরা

বাল্যকালে একটী আশ্চর্য্যজনক ঘটনা ঘটিতে দেখিয়াছি। সেন রাজবংশের অনেক পরে রামপালে রাজা হরিশচন্দ্র নামে এক রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন। এইখানে তাঁহার রাজধানীর ভগ্নাবশেষ হরিশচন্দ্রের ভিটা নামে পরিচিত ছিল। এবং ইহারই নিকটে হরিশচন্দ্রের দীঘি ছিল। বেশ বড় দীঘি। কিন্তু সমস্ত দীঘিটাই দলঘাসে ভরা ছিল। দলঘাসের নীচে মাটী জমিতে জমিতে তাই বেশ কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। আমরা ঐ স্থানে গরু ইত্যাদি পশুদের চরিতে দেখিয়াছি। দলঘাসে জল একেবারেই দেখা যাইত না। গরুদেরও চরিতে কোন অসুবিধা হইত না। এই দীঘিটি কি জানি কোন এক অজ্ঞাত কারণে বৎসরে একবার মাঘী পূর্ণিমার দিন জলে ভরিয়া উঠিত। এবং দলঘাসগুলিও ভাসিয়া উঠিত। আবার পরদিনই জল নামিয়া যাইয়া দীঘিটি পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া আসিত। এই দীঘিটি আমাদের গ্রাম হইতে তুই মাইল দূরে ছিল। এই ঘটনা আমরা নিজেরা ঘটিতে দেখিয়াছি। পার্শ্ববর্ত্তী আরও একটী ডোবা মাঘী পূর্ণিমার দিন অনুরূপভাবে জলে ভরিয়া উঠিত এবং পরদিন আবার জল নামিয়া যাইত। যোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত তাঁহার "বিক্রমপুরের ইতিহাসে" এই ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি আরও লিখিয়াছেন যে আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র বসুকে তিনি এই বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। আচার্য্য বসু বলিয়াছিলেন যে এই বিষয়ে অনুসন্ধান করা দরকার যে ইহা কেবল মাঘী পূর্ণিমার দিনই হয়, না অন্য পূর্ণিমাতেও হয়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, আশ্চর্য্য দেশ ভারতে এইরূপ আরও কিছু অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা এখনও ঘটে। যেমন তারকেশ্বরের স্বয়ম্ভু শিবলিঙ্গ। মাটির ভিতর ইহার অন্ত নাই। যতই খোঁড়া হউক

না কেন এই লিঙ্গের অন্ত পাওয়া যাইবে না। তাই লোকে বলে শিব এখানে আপনা হইতে উঠিয়াছেন। অমর নাথের শিবলিঙ্গ তুষার নির্মিত। তিথির সঙ্গে সঙ্গে বরফের উপর বরফ জমিয়া লিঙ্গ প্রস্তুত হয়। অপর তিথির সঙ্গে সঙ্গে ইহা ক্ষয় হইয়া যায়। তাহার পর আবার ইহা বাড়িতে থাকে। যুগ-যুগান্ত ধরিয়া এইরূপ চলিতেছে; কিন্তু ইহার কারণ এখনও সঠিকভাবে নির্ণীত হয় নাই।

বরিশালে বোধ হয় জোয়ার আসার সময় কামানদাগার মত একপ্রকার গুম গুম শব্দ হইত এবং এখনও হয়। ইহাকেই 'বরিশাল GUN' বলিত। প্রথমে লোকে মনে করিত ইহা কোন ভৌতিক শব্দ, পরে অনুসন্ধানে জানা গিয়াছিল সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী স্থান হওয়ার জন্য সামুদ্রিক জোয়ার ভাঁটার সহিত ইহার সম্পর্ক ছিল। কিন্তু কি যে সম্পর্ক, তাহা কেহ বলিতে পারে না।

মাদ্রাজের চিঙ্গলপুট জেলার থিরুকাঝুকুন্দরম নামক স্থানে একটি পাহাড়ের উপর এই পক্ষীতীর্থ। দুপুর বেলা রোজ কোথা হইতে দুইটি ঈগল জাতীয় পক্ষী আসে এবং সেখানে তাহাদের জন্য রাখা খাদ্য খাইয়া আবার সেই পথেই ফিরিয়া যায়। তাহারা কোথা হইতে আসে, কোথায় যায় কেহ জানে না। একশত বৎসর পর্য্যন্ত সঠিকভাবে জানা আছে তাহারা প্রত্যহই আসে। বোধহয় তাহারা স্মরণাতীত কাল হইতেই এইরূপ যাতায়াত করিতেছে। কেন এসব ঘটনা ঘটে, আমরা সাধারণ লোক তাহা বুঝি না। নিশ্চয়ই কোন বৈজ্ঞানিক

ব্যাখ্যা ইহার আছে। কিন্তু তাহার উল্লেখ কোথাও পাই নাই।

গজারী বৃক্ষের কথা।

সাধারণতঃ বিক্রমপুরে গজারীবৃক্ষ জন্মে না। রামপালে 'বল্লাল বাড়ীর' নিকটে ঐ একটী ব্যতীত সারা বিক্রমপুরে আর কোনখানে এই গজারী বৃক্ষ নাই। গজারী বৃক্ষের জন্ম-স্থান ঢাকার ভাওয়াল পরগণায় এবং আসামের জঙ্গলে। রাম-পালের এই গজারী বৃক্ষটির বয়স কিম্বদন্তী অনুসারে কমপক্ষে সাত শত বৎসর। এইরূপ অস্থানে জন্মিয়া এতদিন বাঁচিয়া থাকা গজারী বৃক্ষের পক্ষে খুবই বিস্ময়জনক। ইহার জন্ম বিবরণও অতি চমকপ্রদ। পাঁচজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ আশীর্ব্বাদী জল লইয়া রাজার দুয়ারে আসিয়া রাজাকে খবর দেন তিনি যেন তৎক্ষণাৎ আসিয়া আশীর্ব্বাদী জল গ্রহণ করেন। রাজা এত তাড়াতাড়ি বাহিরে আসা সমীচীন মনে করিলেন না, তাই ভিতরেই খানিক অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এদিকে আশীর্বাদী জল হাতে নিয়া ব্রাহ্মণদের পক্ষে আর দাঁড়াইয়া থাকা অসম্ভব হইয়া পড়িল। তাই তাহারা একটী শুষ্ক কাষ্ঠ খণ্ডের উপর জল নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া গেলেন। ঐ কাষ্ঠখণ্ডটী একটি গজারী বৃক্ষের গুড়ি ছিল। মন্ত্রপূত সেই জল পাইয়া সেই কাষ্ঠখণ্ডটী ক্রমশঃ একটি সতেজ গজারী বৃক্ষের আকার ধারণ করিল। সেই রাজার নাম ছিল আদিশূর, শূর বংশের কোন রাজা।

আমরা বাল্যকালেই দেখিয়াছি, সেই পুরাতন গজারী বৃক্ষটি মরিয়া গেল কিন্তু তাহার মূল হইতে আর একটি গজারী বৃক্ষ

জন্মিল। জানিনা আজ ষাট বৎসর পরে সেই শিশু বৃক্ষটি পরিপূর্ণ বৃক্ষের আকার ধারণ করিয়াছে কিনা।

"বল্লালবাড়ী" নামটির সহিত মহারাজ বল্লাল সেনের স্মৃতি বিজড়িত আছে। কিন্তু "রামপাল" নামটি তো রাজা রামপালের। সম্ভবতঃ পালবংশের কোন রাজা এই বিরাট নগরী স্থাপিত করিয়াছিলেন। পরে রাজা রামপাল ইহাকে বিখ্যাত করিয়াছিলেন। সেন বংশীয় রাজা ইহাকে রাজধানীতে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমানে বিক্রমপুর নগরের কোন চিহ্ন নাই। সেন আমল পর্য্যন্ত বিক্রমপুর স্কন্দাবারের সন্ধান পাই। এবং রাজধানী রামপালেরও নাম শোনা যায়। কিন্তু বিক্রমপুর নগরের আর উল্লেখ নাই। এখন বিক্রমপুর বলিতে বুঝায়, মুন্সিগঞ্জ মহকুমা ও ফরিদপুরের কিছু অংশ নিয়া বিস্তৃত ঢাকা জেলার বিক্রমণিপুর—পরবর্ত্তী যুগে রামপাল নামে অভিহিত হইত।

বিক্রমপুর পরগণা অবিভক্ত বাংলাদেশের এক মস্ত বড় অংশ ছিল। কাহারও মতে ইহার অতি প্রাচীন নাম ছিল সমতট। বোধ হয় সে সময়ে বিক্রমপুর সমুদ্রতীরে অবস্থিত ছিল। পুর্ব্বে হিমালয়ের কিছু দক্ষিণ হইতেই তটভূমি আরম্ভ হইত। ক্রমশঃ শত শত শতাব্দী ধরিয়া গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্রের মাটি পড়িতে পড়িতে সমুদ্রকে আরো দক্ষিণে লইয়া যায়। কালক্রমে বিক্রমপুরের দক্ষিণ সীমানায় পরে আরো অনেক নূতন জেলা গড়িয়া উঠে। তাহার পর কোন এক সময়ে 'সমতট' হইয়া গেল

বিক্রমপুর। এই পরিবর্ত্তন কবে হইল তাহার কোন স্থির নির্দ্দেশ নাই। তবে এই নাম গ্রহণ করিয়া বিক্রমপুর হিন্দু রাজাদের আমলে পুণ্ড্রবর্দ্ধনের মধ্যে, মুসলমান আমলে পরগণা বিক্রমপুর নামে সোনার গাঁয়ের মধ্যে, ইংরাজ আমলে বিক্রমপুরের উত্তর অংশ ঢাকা জেলার মধ্যে এবং দক্ষিণ অংশ ফরিদপুর জেলার মধ্যে পড়ে। অধুনা পাকিস্থানে বোধ হয় এই নিয়মই বলবৎ আছে। দেশের সীমানা যেসব কারণে বদলায় প্রাকৃতিক অথবা প্রশাসনিক কারণ তার অন্যতম। বিক্রমপুরও এইসব কারণেই অনেকবার আপনার সীমানা বদলাইয়াছে। বিক্রমপুর নদীমাতৃক অঞ্চল। প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বে নদীর পথ পরিবর্ত্তনের ফলে বিক্রমপুর দ্বিখণ্ডিত হইয়া যায়। দক্ষিণ বাহিনী পদ্মা হঠাৎ পথ পরিবর্ত্তন করিয়া পুরাতন নদী কালীগঙ্গার খাত বাহিয়া পূর্ব্ব-গামিনী হয় এবং পরে মেঘনার সহিত মিলিত হইয়া সমুদ্রে গিয়া মিশে। ফলে বিক্রমপুর উত্তর বিক্রমপুর এবং দক্ষিণ বিক্রমপুর নাম গ্রহণ করিয়া দ্বিধা বিভক্ত হইয়া যায়। আবার ১৮৬৯ খৃঃ প্রশাসনিক্ কারণে দক্ষিণ বিক্রমপুর ঢাকা জেলা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত হয়। ঢাকার অন্তর্গত উত্তর বিক্রমপুর সাধারণ ভাবে বিক্রমপুর নামে পরিচিত। কিন্তু খণ্ডিত হইয়া গেলেও দুই বিক্রমপুরের অধিবাসীরা আচারে ব্যবহারে একই রীতি অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন। সোনারং এই উত্তর বিক্রমপুরেই অবস্থিত। তাই আমরা উত্তর বিক্রম-পুরের কথাই কিছু আলোচনা করিব।

ঢাকা জেলার পুর্ব-দক্ষিণ কোণে ইহা অবস্থিত। ইহার দক্ষিণে পদ্মা নদী, উত্তরে ধলেশ্বরী এবং পুর্বে এই দুইটি নদী

মিলিত হইয়া মেঘনা নাম নিয়া বঙ্গোপসাগরে মিলিয়াছে। পশ্চিমে কিছু অংশে পদ্মা থাকিলেও, বাকিটুকু স্থলভাগই মাণিক গঞ্জ পরগণার সহিত মিলিত। পদ্মা ও ধলেশ্বরীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত বিক্রমপুরের মহকুমা শহর মুন্সীগঞ্জ। বাংলার সুবাদার মিরজুমলা মগ ও আরাকানী দস্যুদের হাত হইতে দেশরক্ষা করিবার জন্য এইখানে "ইদ্রাকপুর দুর্গ" নামে একটি দুর্গ নির্মাণ করিয়াছিলেন। মগ দস্যুরা সাধারণতঃ মেঘনা নদী বাহিয়া দেশে প্রবেশ করিত এবং লুণ্ঠন করিয়া আবার ঐ পথেই ফিরিয়া যাইত। পরে এই দুর্গ মহকুমা অফিসারের আবাসস্থল হইয়াছিল।

আয়তনে বিক্রমপুর ছিল ৩৮৬ বর্গমাইল এবং ইহার মধ্যে ১০১২টি গ্রাম ছিল। ১৯৪১ খৃঃ বিক্রমপুরের জনসংখ্যা ছিল, মুসলমান পুরুষ ৫,০৭,১৮৮ ও মুসলমান স্ত্রী ৫,২০,২৩৪, মোট ১০,২৭,৪২২। অমুসলমান পুরুষ ৩,৩৮,৯৭০ ও স্ত্রী ৩,৭৬,৬০২ মোট ৭,১৫,৫৭২। মুসলমান ও অমুসলমান নিয়া জনসংখ্যা ছিল ১৭,৪২,৯৯৪। বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে ইংরাজ আমলে মুসলমান ও অমুসলমান এই দুই জাতিই ছিল। কিন্তু হিন্দু বলিয়া কোন জাতিই ছিল না। আদমসুমারীতে দেখা যায় যে বিক্রমপুরে মুসলমানেরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন। মুসলমানদের সহিত অমুসলমানদের যথেষ্ট সৌহার্দ্য সম্প্রীতি ছিল। বিক্রমপুর অত্যন্ত জনবহুল পরগণা ছিল। সেই সময় ঢাকা জেলার প্রতি বর্গমাইলে সাধারণতঃ ৯৩৫জন লোক বাস করিত। সেই তুলনায় বিক্রমপুরের বিভিন্ন থানায় ইহা অপেক্ষা বেশী লোক বাস করিত। টঙ্গীবাড়ী সোনারং থানায় ৩০৪৪, লোহাজং থানায় ৩২৪৮, মুন্সীগঞ্জ থানায় ২৪১৩ প্রভৃতি।

এই জনবাহুল্য বিক্রমপুরবাসীকে সর্ব্বদাই বহির্মুখী করিয়া রাখিয়াছিল। ঘরে এত লোকের অন্নসংস্থান হওয়া কষ্টসাধ্য ছিল বলিয়া জীবিকার্জ্জনের জন্য তাহাদের বাহিরে যাইতেই হইত।

পূর্বেই বলা হইয়াছে বিক্রমপুর নদীমাতৃক দেশ। পদ্মা ধলেশ্বরী ব্যতীত অনেক বড় বড় খাল বিক্রমপুরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইত। মুন্সীগঞ্জ হইতে রাজবাড়ী পর্য্যন্ত মুন্সীগঞ্জের খাল প্রায় বড় নদীরই মত। সোনারং মীরক্যাদিন খাল, তালতলার খাল, হলদিয়ার খাল, উত্তরে ধলেশ্বরী হইতে আরম্ভ করিয়া বিক্রমপুরের মধ্য দিয়া আসিয়া পদ্মায় মিশিয়া যাইত। ইহা ভিন্ন বহু ঝোরা বা ছোট খাল ছিল। জ্যৈষ্ঠের শেষ হইতে কার্ত্তিকের শেষ পর্য্যন্ত ৬ মাস দেশ বর্ষার জলে ডুবিয়া থাকিত। তখন যাতায়াতের একমাত্র উপায় ছিল নৌকা। বর্ষায় সমগ্র বিক্রমপুর জলে থৈ-থৈ করিত। গ্রামগুলি ছোট ছোট দ্বীপের মত মাথা উঁচু করিয়া থাকিত। মধ্যে মধ্যে জলস্রোত বেশী প্রবল হইয়া উঠিলে বাড়ির উঠানও জলের নীচে চলিয়া যাইত। কার্ত্তিকের শেষে জল নামিয়া গেলে লোকে আবার হাঁটাপথ ধরিতে পারিত। এই সব নদ নদী ও খালের পারে বেশ বড় বড় হাট বন্দর ছিল যাহার মধ্যে লোহাজং, তারপাশা, তালতলা, মীরকাদিন ও কমলাঘাটের বন্দর বিখ্যাত বানিজ্য বন্দর ছিল। এইসব হাটে সর্ব্বপ্রকার দ্রব্য আমদানী হইত। সোনারূপা, লোহা, কাপড়, জামা, জুতা, ছাতা মনিহারী, কাঠ, ভাল তামাক, চিনি, গুড় ইত্যাদি। রপ্তানী হইত পিতলের বাসন, জোলার কাপড়, ছিট, পাট চামড়া, ঘি, মাছ, মাটির বাসন ও রামপালের বিখ্যাত কলা ও মূলা। এইসব হাট বাজার বিক্রমপুরবাসীদের চরিত্র গঠনেও সাহায্য করিত। বানি-

জ্যের মাধ্যমে বাহিরের সহিত ভাবের আদান প্রদান ঘটিত, পরিচয় ও যোগাযোগও হইত। এইভাবে বহির্জগতের সহিত মিশিবার সুযোগ পাইয়া তাহাদের মনের প্রসারতা তো ঘটিতই, উপরন্তু বাহিরে যাইবার সম্বন্ধে ভয়টাও কাটিয়া যাইত।

বিক্রমপুরে বহু প্রকার জন্তু জানোয়ার ছিল, তাহার মধ্যে প্রধান অসংখ্য প্রকারের তীব্র বিষাক্ত সাপ। সর্ব্বাপেক্ষা ভীতি-জনক ছিল কেউটে। বর্ষাকালে সাপেরা বাহির হইয়া আসিত এবং তখনই বহু লোক সর্পদংশনে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেন। শুনিয়াছি পূর্ব্বে বাঘও ছিল। তবে আমরা ছেলেবেলায় যেগুলির সহিত পরিচিত ছিলাম সেগুলিকে বলিতাম· কুকুর বাঘা, হায়েনার মত। তবে আমাদের ঠাকুরমাদের ঝুলিতে যে সব ভয়ংকর ভয়ংকর বাঘের গল্প ছিল তাহার সকলেই 'মানুষ খেকো'। তাই মনে হয় নর-খাদক বাঘও আগে আমাদের দেশে আসিত।

ঝড়-বাদল, বন্যা দেশে লাগিয়াই থাকিত। অফুরন্ত বৃষ্টি, কখনও চৌদ্দ দিন পর্য্যন্ত আমরা দেখিয়াছি। প্রচণ্ড কালবৈশাখীও খুব হইত। দস্যু, তস্কর বিশেষ ছিল না। কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে মগের অত্যাচার বিক্রমপুরকে নিঃস্ব করিয়া দিয়াছিল। বন্যার জল দেশকে অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর করিয়া তুলিত। ফলে বর্ষাশেষে দেশের লোক নানাপ্রকার ব্যাধিতে দিশাহারা হইয়া পড়িত। কিন্তু এই ব্যাধি, বন্যা, জন্তু, দস্যু, তস্কর প্রভৃতি দেশের লোকদের বেশ কষ্টসহিষ্ণু ও আত্মনির্ভরশীল করিয়া তুলিয়াছিল।

অতি প্রাচীনকাল হইতেই বিক্রমপুর একটি বিশিষ্ট শিক্ষা

কেন্দ্র। দেশের নানাস্থানে টোল, পাঠশালা ইত্যাদি ছিল। জ্যোতিষ, কাব্য, ব্যাকরণ ও আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের বিশেষ চর্চা হইত। বৌদ্ধ যুগে এই ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাব বাংলা দেশে, বিশেষতঃ বিক্রমপুরবাসীদের উপর বিশেষরূপে অনুভূত হইয়াছিল। পাল ও বর্ম রাজাদের আমলে বিক্রমপুরে বিদ্যাশিক্ষার চর্চা অত্যন্ত উন্নত মানের হইয়া উঠিয়াছিল।

সেন রাজাদের আমলে হিন্দুশাস্ত্রের—বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, তন্ত্র ইত্যাদির চর্চা প্রাধান্য লাভ করে। মুসলমান আমলে বিক্রমপুরে একদিকে যেমন বহু সংস্কৃত চতুষ্পাঠী ছিল তেমনই আরবী ও ফারসী শিক্ষা দিবার জন্য বহু মক্তব-মাদ্রাসারও প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। তাহার পর ইংরাজ রাজত্বে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের জন্য অনেক স্কুল খোলা হইল। এই সমস্ত যুগে সর্ব্বপ্রকার বিদ্যার ফলে বিক্রমপুরবাসীদের বুনিয়াদ বেশ শক্ত ভাবেই গড়িয়া উঠিয়াছিল। তাই পরে যখন বিক্রমপুরবাসীরা দিকে দিকে জীবিকার খোঁজে বাহির হইয়া পড়িলেন, যাত্রা তাহাদের সফলই হইয়াছিল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস বলিয়া ছিলেন "যে দেশেই থাকি না কেন, যত দেশেই ঘুরিয়া বেড়াই না কেন যখন মনে করি আমি বিক্রমপুরবাসী, তখনই প্রাণে প্রাণে একটা গর্ব্ব অনুভব করি। বিক্রমপুর যে আমার শরীরের শিরায়, শিরায়, আমার অস্থি-মজ্জাগত! বিক্রমপুরের শত শত কাহিনী আমাদের জীবনের সহিত জড়াইয়া গিয়াছে, আমরা কিছুতেই ভুলিতে পারিনা আমরা বিক্রমপুরবাসী। এই যে স্মৃতি, যাহা ফুলের সহিত জড়ানো গন্ধের মতো আমাদের সর্ব্বদা ঘিরিয়া রাখিয়াছে

তাহাকে সর্বদা হৃদয়-মন্দিরে দেবতার মতো জাগাইয়া রাখিতে হইবে।” কবি গাহিয়াছিলেন,

“বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি,
আমরা হেলায় নাগেরে খেলাই নাগের মাথায় নাচি।
একহাতে মোরা মগেরে রুখেছি, মোগলেরে আর হাতে
চাঁদ প্রতাপের হুকুমে হটিতে হয়েছে দিল্লীনাথে।
বাঙ্গালী অতীশ লঙ্ঘিল গিরি তুষারে ভয়ংকর
জ্বালিল জ্ঞানের দীপ তিব্বতে বাঙ্গালী দীপংকর।”

বিক্রমপুরেরই দক্ষিণ-পূর্বে চাঁদ রায়, কেদার রায়ের রাজধানী শ্রীপুর অবস্থিত ছিল। পরে ইহা পদ্মার কুক্ষিগত হয় এবং ইহার অবশিষ্টাংশ রাজাবাড়ী নামে পরিচিত হয় রাজাবাড়ী গ্রাম আমরা দেখিয়াছি। উহাও পরে রাজাবাড়ীর বিখ্যাত মঠ-সহ পদ্মা গর্ভে তলাইয়া যায়। অষ্টাদশ শতকের মধ্য ভাগে তৎ-কালীন বিখ্যাত ধনী ও রাজনীতিবিদ্ রাজা রাজবল্লভ পদ্মার কূলে বিক্রমপুরের দক্ষিণাংশে রাজনগরের পত্তন করেন। কিন্তু পদ্মা ইহাও গ্রাস করে। বোধ হয় ইহার পরই পদ্মার নাম হয় কীর্ত্তিনাশা।

বিক্রমপুর নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল। ছয়ঋতুর প্রকাশ তাই এখানে বেশ স্পষ্ট। তবে বর্ষা ঋতু প্রধান।

বিক্রমপুরে প্রাচীন ও আধুনিক কালে বহু সু-সন্তান জন্মিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে প্রধান দীপংকর শ্রীজ্ঞান অতীশ।

পাল বংশের মহারাজ নয়পালের রাজত্ব কালে দীপংকর শ্রীজ্ঞান অতীশের আবির্ভাব হয়। আনুমাণিক ৯৮০ খৃঃ বিক্রমপুরের বজ্রযোগিনী গ্রামে (সোনারং এর পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম) ব্রাহ্মণ বংশীয় কল্যাণশ্রীর ঔরসে প্রভাবতীর গর্ভে চন্দ্রগর্ভের জন্ম হয়। প্রভা-বতী বিদুষী মহিলা ছিলেন। তিনি চন্দ্রগর্ভকে বেদশিক্ষা দেন। তখনই চন্দ্রগর্ভের প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। উনবিংশ বৎসর বয়সে তিনি ওদন্তপুরী বিহারের আচার্য্য শীলরক্ষিতের নিকট ভিক্ষুব্রতে দীক্ষা লাভ করেন এবং "দীপংকর" নাম গ্রহণ করেন। তিনি হিন্দু ও বৌদ্ধ দর্শনে অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। ইহার পর তিনি অন্যান্য পণ্ডিতগণকে তর্কে পরাজিত করিয়া "শ্রীজ্ঞান" উপাধি লাভ করেন। ভিক্ষু হইবার কিছুকাল পরেই দীপংকর বিক্রমশীলা বিহারের আচার্য্যগণের নিকট নানা বিদ্যায় শিক্ষালাভ করিয়া সুবর্ণদ্বীপে গমন করেন এবং তথা হইতে অভীষ্ট বিদ্যালাভ করিয়া দেশে আসিয়া বিক্রম-শীলা বিহারের অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করেন। ইহার পর দীপংকর তিব্বতেশ্বরের একান্ত অনুরোধে তিব্বতে চলিয়া যান। তখন দীপংকরের বয়স ৫৯। তিব্বতে যাইতে হইলে তখন পায়ে হাঁটিয়া সমস্ত হিমালয় পার হইয়া যাইতে হইত। তিব্বতাধিপতি তাঁহাকে অতীশ অর্থাৎ 'সর্বশ্রেষ্ঠ' উপাধিতে ভূষিত করেন। তখন দীপংক-রের সম্পূর্ণ নাম হয় দীপংকর-শ্রীজ্ঞান-অতীশ। দীপংকর তিব্বতে গিয়া সেখানকার প্রচলিত বৌদ্ধধর্মের সংস্কার সাধন করিয়া 'মহাযান' ধর্মমত প্রচলন করিলেন। তাঁহার চরিত্রমাধুর্য্যে ও পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া সেখানকার জনসাধারণ তাঁহাকে দেবতার আসনে বসাইয়া-ছিলেন। বহু বৎসর ধরিয়া সেখানে ধর্মপ্রচার করিয়া এবং বহু

গ্রন্থ রচনা করিয়া তিনি ৭৩ বৎসর বয়সে তিব্বতেই দেহ রক্ষা করেন। যে মহাপুরুষের নাম উল্লেখমাত্রেই তিব্বতরাজ ও চীন সম্রাট উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রণাম জানাইতেন, ভাবিলে গর্বের অবধি থাকে না যে তিনি বিক্রমপুরেরই সুসন্তান চন্দ্রগর্ভ, দীপংকর-শ্রীজ্ঞান-অতীশ।

আধুনিক কালের সোহংস্বামী, চন্দ্রমাধব ঘোষ, চিত্তরঞ্জন দাস, জগদীশ বসু, সরোজিনী নাইডুর কথা সকলেই জানেন। ইহারাও বিক্রমপুরেরই সন্তান।

গ্রামের ভৌগলিক অবস্থান।

আমাদের গ্রামের নাম ছিল সোনারং। প্রবাদ আছে, পূর্বে এখানে কোন লোক বসতি ছিল না। সমস্ত গ্রামটিতেই কৃষিক্ষেত্র ছিল। সোনা নামে এক কৃষক একটি উচ্চস্থান বা 'টং' প্রস্তুত করিয়া ক্ষেত্রগুলি পাহারা দিত। সেই 'সোনার টং' হইতে ক্রমশঃ বিবর্ত্তিত হইয়া প্রথমে 'সোনাটং' এবং তাহার পর 'সোনারং' নামটাই দাঁড়াইয়া যায়। আমাদের ছেলেবেলায় পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের অনেককেই আমাদের গ্রামকে 'সোনাটং' বলিয়া অভিহিত করিতে শুনিয়াছি। তবে এই বিষয়ে আরো একটি কিম্বদন্তী আছে।

সতীশ চন্দ্র সেন লিখিয়াছেন যে কোন এক সময়ে এই স্থানে একটি সোনার 'আড়ত' ছিল। সেই হইতেই 'সোনারং' নামের উৎপত্তি। সুরেশচন্দ্র দাসগুপ্ত লিখিয়াছেন যে এইখানে

সোনা বেচা কেনার একটী আড়ৎ ছিল, দেউলবাড়ী খালের পশ্চিম-দিকে। প্রমাণ হইল প্রথমতঃ ইহারই সন্নিহিত একটি স্থান "সোনা-কোড়া" নামে পরিচিত। দ্বিতীয়তঃ পরবর্ত্তী কালে চাষ করিবার সময় কেহ কেহ স্বর্ণপিণ্ড কুড়াইয়া পাইয়াছিলেন। তৃতীয়তঃ পাঁচু ব্যাপারী নামে এক মুসলমানের সোনা কোড়াতে একটি ক্ষেত ছিল। এই ক্ষেতে নিরাণ কার্য্যের সময়ে সোনা কুড়াইয়া পাওয়া যাইত। তাই ঐ ক্ষেত নিরাণের জন্য অল্প পারিশ্রমিকেও মজুরেরা রাজী হইত। হয়তো এই সোনার আড়ত থাকার জন্যই গ্রামের নাম "সোনারং" হইয়াছিল। তবে ইহা আরো যুক্তিমুলক প্রমাণ সাপেক্ষ। এখন আর প্রমাণ পাইবার কোন উপায় নাই। তবে সুরেশবাবুর কাহিনীর একটি সাম্ভাব্য প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, ডাঃ নীহার রঞ্জন রায়ের "বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদি পর্ব্ব" গ্রন্থে। এই গ্রন্থে ৬২ ও ২২৫ পৃষ্ঠায় সোনারং এর উল্লেখ আছে। তিনি বলেন যে প্রথম ও দ্বিতীয় খৃঃ লিখিত Periplus of Erythrean Sea এবং টলেমীর গ্রন্থে জানা যায় যে গঙ্গারীডই রাজ্যের রাজধানী 'গাঙ্গে নগরী' গঙ্গা নদীর শাখা কুমার নদীর পূর্ব্বকূলে অবস্থিত ছিল এবং ইহারই নিকটবর্ত্তী এক স্থানে সোনার খনি ছিল। ডাঃ রায় আরও লিখিয়াছেন, সমাচার দেবের "যুগ্রাহাটা লিপিতে উল্লিখিত গুপ্ত আমলের (ষষ্ঠ ও সপ্তম শতকে) সুবর্ণ বীথি শাসন বিভাগ (বর্ত্তমান ঢাকা — ফরিদপুর — কোটালী পাড়া অঞ্চল) এবং বর্ত্তমান ঢাকা জেলার সুবর্ণগ্রাম, সোনাকাদি, সোনারং, সুবর্ণ রেখা নদী প্রভৃতি সবই সুবর্ণ স্মৃতিবহ। এই সব স্থানের সহিত টলেমী বর্ণিত স্বর্ণখনির নিশ্চয় কোন যোগ আছে। Periplus গ্রন্থে নিম্ন গাঙ্গেয় ভূমিতে "ক্যালটিস্" নামে এক প্রকার সুবর্ণ মুদ্রার খবর পাওয়া যায়। মনে হয় এই সোনার খনি হইতেই অপরিশোধিত

খনিজ মৃত্তিকা সংগ্রহ করিয়া এই সব স্থানে শোধিত হইত এবং সুবর্ণ মুদ্রা প্রস্তুত হইত। সুতরাং "সোনারং" নাম এই স্বর্ণশোধনাগার হইতে আসা একেবারে অসম্ভব নহে। এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করিলে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে সোনারঙ্গ গ্রামের অস্তিত্ব প্রথম শতাব্দীতেও ছিল।

রাজধানীর অংশ সোনারঙ্গ

বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত সোনারং গ্রাম। রাজধানী 'রামপাল' যে সব গ্রাম নিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহাদের পূর্ণ প্রতিষ্ঠার চিহ্ন স্বরূপ এই সব গ্রামে বহু দেউলবাড়ী (দেউল — দেবকুল বা দেবস্থান) দেবমূর্ত্তি ও ধনসম্পদ পাওয়া গিয়াছে। আমাদের সোনারং বর্ত্তমানে রামপালের দুই মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত। সোনারঙ্গে দুইটি দেউলবাড়ী ছিল। এই দেউলবাড়ীতে এবং গ্রামের অন্যান্য স্থানে অনেক প্রস্তর নির্মিত দেবমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। মুসলমান পাড়ার দেউলবাড়ীর দীঘির মধ্যে গ্রানাইট পাথরের এক স্তম্ভ পাওয়া গিয়াছিল, যাহার উচ্চতা ছিল ১৭ফিট ও প্রস্থ ছিল সাড়ে চার ফিট। এখন এই স্তম্ভটি ঢাকা মিউজিয়ামে রাখা আছে। প্রস্তরহীন বাংলদেশে, বিশেষতঃ সমুদ্রতীরবর্ত্তী বিক্রমপুরে এত বড় প্রস্তর স্তম্ভের অবস্থান, গ্রামের পূর্ব্ব সমৃদ্ধির পরিচয়ই বহন করে।

ইহা ছাড়া গ্রামের অনেক স্থানে, বিশেষতঃ দেউলবাড়ীগুলির আশেপাশে সোনা পাওয়া যাইত। সুরেশ চন্দ্র দাসগুপ্ত বর্ণিত গ্রামের অন্তর্গত "সোনাকোড়া" (যেখানে সোনা কুড়াইয়া পাওয়া যায়) অঞ্চলে চাষ করিবার সময়ে মাঠ হইতে স্বর্ণপিণ্ড পাওয়া

যাইত। এমনি এক সোনা পাওয়ার ঘটনা প্রখ্যাত পুরাতত্ত্ববিদ ঢাকা মিউজিয়ামের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডাঃ নলিনী কান্ত ভট্টশালী তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে "A copper vessel, full of treasure was found in the village of Sonarang. The finder went to Calcutta to dispose of his find secretly, fell into the clutches of swindlers and lost everything and was brought back home a raving lunatic." (সোনারং গ্রামে স্বর্ণ ও ধনরত্ন পূর্ণ একটি তাম্রপাত্র পাওয়া গিয়াছিল। যে পাইয়াছিল, সে অতি গোপনে উহা বেচিবার জন্য কলিকাতায় লইয়া গেল। কিন্তু কিছু জোচ্চোরের পাল্লায় পড়িয়া তাহার সর্ব্বস্ব হারাইল এবং যখন বাড়ী ফিরিল, তখন সে একেবারে বদ্ধ উন্মাদ।)

এইরূপ পূর্বযুগীয় সমৃদ্ধির আরও পরিচয় বাংলাদেশের বড় বড় দীঘিগুলি। সোনারঙ্গে এইরূপ আট দশটি দীঘি ছিল।

রামপাল নগরীর পশ্চিমদিকের পরিখা বা সোনারং মীরকাদিম খাল সোনারঙ্গের পূর্ব্ব খণ্ডকে গ্রাম হইতে বিভক্ত করিয়া গিয়াছে। ইহার অর্থ এই যে তখনকার দিনের গ্রামের অবস্থিতি পরিখাবেষ্ঠিত রাজধানীর অন্তর্গত ছিল। এই সব দেখিয়া মনে হয় সোনারং গ্রাম ঐ সময়ে রাজধানী রামপালের একটা অংশ ছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ১০১২টি গ্রাম নিয়া বিক্রমপুর পরগণা গঠিত। ইহাদের মধ্যমণি ছিল সোনারঙ্গ। বিস্তায়, ধনে মানে সোনারঙ্গের সমকক্ষ গ্রাম বিক্রমপুরে কমই ছিল। এই গ্রাম পরগণার উত্তর পূর্ব্ব কোণে অবস্থিত। মহকুমা শহর মুন্সিগঞ্জ হইতে পাঁচ মাইল পশ্চিমে, ধলেশ্বরী নদী হইতে তিন মাইল দক্ষিণে এবং পদ্মা হইতে

আট মাইল উত্তরে এই সোনারঙ্গ। ইহার ঠিক উত্তরে বেতকা, খিলপাড়া ও নাটেশ্বর। পূর্ব্বে মেদিনীমণ্ডল, আটপাড়া, সুয়াপুর ও বড়লিয়া, দক্ষিণে আমতলী ও পশ্চিমে নেত্রাবতী, দ্বারাবতী, আউটশাহী, নোয়াদ্দা প্রভৃতি গ্রামগুলি ছিল। সোনারঙ্গ-এর কাছাকাছি আরও কয়েকটি বৃহৎ ও উন্নত গ্রাম ছিল। যেমন পাইকপাড়া, মালখানগর, বজ্রযোগিনী, স্বর্ণগ্রাম, মধ্যপাড়া, কলমা, ভরাকর, ইছাপুরা, শ্রীনগর ইত্যাদি।

সোনারঙ্গের আয়তন ছিল অনধিক এক বর্গ মাইল। লোক সংখ্যা ছিল ১৮৯১ খৃঃ আদম সুমারিতে ১০৩২ এবং ১৯৪১ খৃঃ আদম সুমারীতে ৭০০০। "সোনারঙ্গ সম্মিলনী"র মতে ১৯৪৩-৪৪ খৃঃ লোক সংখ্যা ছিল ১১,১৭৩। ইহার মধ্যে গ্রামে থাকিতেন ৮০০০ এবং বাহিরে থাকিতেন ৩১৭৩। গ্রামের উত্তর দিয়া এক রাস্তা গিয়াছে গ্রামের পশ্চিম দিকে হইতে মুন্সিগঞ্জ পর্য্যন্ত। বর্ষায় এই রাস্তা একেবারে জলমগ্ন হইয়া পড়িত। তখন হাঁটা পথে এই রাস্তায় যাওয়া যাইত না। গ্রামের পূর্ব্ব প্রান্ত ভেদ করিয়া সমস্ত বৎসর জলপূর্ণ একখাল প্রবাহিত হইত। এই খাল উত্তরে ধলেশ্বরী নদীর কমলাঘাট হইতে আরম্ভ হইয়া দক্ষিণে আট মাইল দূরে পদ্মায় মিশিয়াছে। সারা বৎসরই এই খালে নৌকা চলাচল করিবার মত জল থাকিত। দক্ষিণে আমতলী ও সোনারঙ্গের আর একটি খাল ছিল। এই খালের আর একটি শাখা সোনারঙ্গকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া আবার অর্ধচন্দ্রাকারে ঐ খানেই মিশিয়া গিয়াছে। এই খালে ঘেরা গ্রামের অংশটুকুই গ্রামের সর্বাপেক্ষা ঘনবসতিপূর্ণ ছিল এবং এইখানেই গ্রামের অধিকাংশ লোক বাস করিত। এই খানেও সারা বৎসর জল থাকিত কিন্তু শীতকালে ইহাতে নৌকা

চলাচল করিতে পারিত না। ইহার প্রথমাংশের নাম ছিল ‘ঋষি-বাড়ীর খাল।’

গ্রামের ঘনবসতি পূর্ণ অঞ্চলের এক একটি অংশের বিশেষ বিশেষ নাম ছিল, যেমন দক্ষিণপাড়া, উত্তরপাড়া বা মুন্সিপাড়া, ছোট উত্তরপাড়া বা বর্মাপাড়া, গোঁসাইপাড়া, পশ্চিমপাড়া, কৈবর্ত্ত-পাড়া, রক্ষকান্তপাড়া, লস্করপাড়া ও সরকারপাড়া। বাড়ীগুলিরও আলাদা আলাদা নাম ছিল, যেমন মুন্সিবাড়ী, মুনসেফবাড়ী, নৈর-বাড়ী, পুরান বিশারদবাড়ী, নয়াবাড়ী, ভুঁঞাবাড়ী, বড় ছোট সরকারবাড়ী, সেনেরবাড়ী, উলুরবাড়ী, বিশ্বাসবাড়ী, কাউথারবাড়ী, লখারবাড়ী. ঢংগীবাড়ী, চারু আবাস, গুপ্তেরবাড়ী, রায়েরবাড়ী, জয় ব্রহ্মসার গাড়ী বাড়ী, ইত্যাদি। গ্রামের বিশিষ্ট নির্দ্দেশক চিহ্ন ছিল মুন্সিপাড়ার জোড়ামঠ। এই জোড়া মঠ এই অঞ্চলে বিশেষ খ্যাত ছিল। কারণ রাত্রিতে পথিকের পক্ষে এই জোড়া মঠ পথ-নির্দ্দেশকরূপে কাজ করিত। মুন্সীবাড়ীর রূপমুন্সী একটি মঠ প্রস্তুত করাইয়া তাহাতে কালীমুর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং পরবর্ত্তীকালে রূপমুন্সির পুত্র ভগবান সেন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট উহার পার্শ্বে আর একটি মঠ প্রস্তুত করাইয়া তাহাতে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করাইয়াছিলেন। গ্রামের দক্ষিণ পাড়াতেই সূর্য্যসেনের বসতবাটি ছিল।

গ্রামে আটটি বড় বড় দীঘি ছিল এবং সত্তরটিরও বেশী পুকুর ছিল। দীঘিগুলি ছিল গ্রামের চারিদিকে। দক্ষিণ পাড়ার একটির নাম ছিল ‘বড় পুকুর’। ইহা সূর্য্যসেনের বসতবাড়ীর সংলগ্ন ছিল। গ্রামের “দশহরা” বরাবর এইখানেই হইত। পরে সরকার ইহাকে পানীয় জলের আরক্ষিত ঘোষণা করায় প্রতিমা বিসর্জ্জন

মুন্সিপাড়ার দীঘিতেই করা হইত। অন্যান্য দীঘিগুলি ছিল উত্তর-পূর্ব্বে মুসলমান পাড়ায় ও কৈবর্ত্ত পাড়ায়। গুপ্তের বাড়ীর পূর্বের দীঘিটির একটি নাম ছিল "নৌকাদীঘি" অথবা "মগদেরদীঘি"। কারণ ইহা চতুষ্কোণ হইলেও ইহার দৈর্ঘ্য ছিল পূর্ব পশ্চিমে। বাংলা দেশের দীঘিগুলির দৈর্ঘ্য সাধারণতঃ উত্তর দক্ষিণে হয়। পূর্ব পশ্চিমে বিস্তার থাকিলে লোকে বলিত ইহা মগেরা প্রস্তুত করিয়াছে। অবশ্য এই বিশ্বাসের কারণ কি তাহা আমার জানা নাই। গ্রামের উত্তর পূর্ব কোণে, খাল বেষ্টিত অংশের বাইরে "কাউথ্থার বাড়ী" বলিয়া একটী ভিটা ছিল। ১৯০৫ খৃঃ সোনারঙ্গ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ঐ স্থানে স্থানান্তরিত হয়। শুনিয়াছি বিদ্যালয়টি আজও ওখানেই আছে।

গ্রামে একটি ডাক ও তার ঘর ছিল। প্রথমে ইহা সাধারণ উপ-ডাকঘর হিসাবেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পরে ইহাতে টেলি-গ্রাফ যন্ত্র বসাইয়া ইহাকে "ডাক ও তার ঘর" রূপে রূপান্তরিত করা হয়। যাহাকে ইংরাজীতে বলা হয় Combined Post Office। বৈকুণ্ঠ রায় মহাশয় ইহা প্রতিষ্ঠিত করেন। শুনিয়াছি সমগ্র বিক্রমপুরে ইহাই প্রথম ডাক ঘর। ইহার অধীনে আটটি শাখা ডাকঘর বা 'ব্রাঞ্চ পোষ্ট অফিস' ছিল, যথা— বেতকা, আউটসাহী, বালিগাঁও, পুরাপাড়া, টঙ্গীবাড়ী, বড়লিয়া, নাটেশ্বর, নেত্রাবতী, নয়নন্দ, ও আড়িয়ল ডাকঘরে প্রাতঃকালে ডাক বিলি হইত। গ্রামের লোকেরা সেখানে সমবেত হইতেন। ডাকঘরটি গ্রামের একটি প্রতিষ্ঠান বিশেষ ছিল। ইহা গ্রামের বৈচিত্র্যহীন জীবনে যথেষ্ট বৈচিত্র্যের সঞ্চার করিত। পোষ্টমাষ্টার গ্রামের প্রতি ক্রিয়াকর্মে যোগ দিতেন। বস্তুতঃ তিনি একজন প্রধান ও বৈচিত্র্যময় লোক ছিলেন।

দেউলবাড়ী ঃ—

অতি প্রাচীন ধ্বংসপ্রাপ্ত অট্টালিকাকে দেউলবাড়ী বলা হইত। বিশেষতঃ যেগুলি পুরাকালে ধর্ম্মস্থান ছিল। দেউল অর্থাৎ দেবকুল বা দেবস্থান। এইগুলি সাধারণতঃ বৌদ্ধমন্দির ছিল। অনেক প্রস্তর মূর্ত্তি এইসব দেউলবাড়িতে পাওয়া যাইত। এই মূর্ত্তিগুলি দুই রকমেরই হইত —হিন্দু ও বৌদ্ধ। আমাদের গ্রামের ভিন্ন ভিন্ন অংশে এইরূপ দুইটি দেউলবাড়ী ছিল। একটি গ্রামের পশ্চিমে —যেখানে কিছু মূর্ত্তি ও কিছু তৈজসপত্র পাওয়া গিয়াছিল। ইহার তৎকালীন মালিক রজনী মুখুটি এই দেউলবাড়ী হইতে বহু ইষ্টক সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এবং গ্রামের পশ্চিমে একটি উন্মুক্ত স্থানে একটী পুষ্করিণী খনন করাইয়া উহার তীরে ইষ্টক দিয়া একটি অতি মনোরম উদ্যানবাটী প্রস্তুত করাইয়া ছিলেন। এই পুষ্করিণীর চতুষ্পার্শ্বে খেজুর বৃক্ষ এবং এক পার্শ্বে বট অশত্থ প্রভৃতি বৃক্ষ রোপন করিয়াছিলেন। জায়গাটি তাই বেশ আশ্রমের মত দেখা যাইত। বিশেষ গ্রামের বাহিরে হওয়ার জন্য এখানে জন বাহুল্য একেবারেই ছিল না। আমরা বাল্যকালে দেখিয়াছি গ্রামে সাধু সন্ন্যাসী আসিলে এখানে কিছুদিন থাকিয়া যাইতেন। মুখুটি মহাশয় আরও একটি প্রথার প্রচলন করিয়াছিলেন। এই খেজুর গাছগুলিতে শীত-কালে প্রচুর রস বাহির হইত। তিনি প্রতি শীতে একদিন সমস্ত গ্রাম-বাসিকে এখানে খেজুর রস পান করিতে নিমন্ত্রণ করিতেন। দ্বিতীয় দেউল বাড়ীটি ছিল পূবের খালের পূর্ব পাড়ে, খোয়াজ মিঞার বাড়ীতে। এই বাড়ীকে বোধহয় সরকার বাড়ী বলিত। দেউলটি আকারে খুব বড় ছিল এবং ইহার সম্মুখে একটী বড় দীঘিও ছিল। এখানে একটি সূর্য্যমূর্ত্তি ও একটি দ্বাদশভুজ অবলোকিতেশ্বরের মূর্ত্তি

পাওয়া গিয়াছিল। পরবর্ত্তীকালে আমরা গ্রাম ছাড়িয়া আসার পর এই দীঘিতে একটী ১৭ ফুট দীর্ঘ ও ৪।। ফুট চওড়া গ্রানাইট পাথরের স্তম্ভ পাওয়া গিয়াছিল। প্রস্তর মুর্ত্তি দুইটি মুন্সিবাড়ীর মঠবাড়ীতে আছে।

জয়ব্রহ্মসার

এই নামে একটি বিখ্যাত বাড়ী গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে ছিল। সেখানে কয়েক ঘর সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবার বাস করিতেন। সোনারঙ্গের একমাত্র ও বিখ্যাত সংস্কৃত টোল এই বাড়ীতে ছিল। পণ্ডিত দীনবন্ধু বিদ্যালংকার ইহার প্রধান অধ্যক্ষ ছিলেন। বিক্রমপুর সংস্কৃত অধ্য-পনায় চিরকালই সুবিখ্যাত। এবং এক সময়ে প্রতি গ্রামে সংস্কৃত টোল ছিল। সোনারঙ্গের এই টোলই এই অঞ্চলের শেষ টোল। বিদ্যালংকার মহাশয়ের মৃত্যুর 'পর এই টোলটিও উঠিয়া যায়। দীনবন্ধু বিদ্যালংকার মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র প্রফুল্ল চন্দ্র ব্যানার্জী লিখিয়াছেন "দীনবন্ধু বিদ্যালংকার মহাশয়ের বাড়ীর পূর্ব দিকে এক বিশাল দীঘি ছিল। তাহার পূর্ব দক্ষিণ কোণে এক প্রকাণ্ড অশথ বৃক্ষ ছিল। ঐ বৃক্ষের নীচে একজন সিদ্ধ যোগী পুরুষ—সাগ্নিক ব্রাহ্মণ অহর্নিশি অগ্নি জ্বালাইয়া রাখিতেন ও যজ্ঞ করিতেন। তিনি মাঝে মাঝে "জয় ব্রহ্ম সার" এই ধ্বনি তুলিতেন। সেই হইতে এই দীঘি "জয় ব্রহ্মসারের" নামে পরিচিত এবং সাধারণে ইহার নিকটবর্ত্তী স্থানকেও জয় ব্রহ্মসার নামে অভিহিত করিত।

ঝিকুটিঘর :

গ্রামে কয়েকটী পুরাতন ইষ্টক নির্মিত ও একঘর বিশিষ্ট গৃহ ছিল, ইহাদিগকে বলা হইত 'ঝিকুটি ঘর'। ইহার অনুরূপ

গৃহ আমি পার্শ্ববর্ত্তী কোন গ্রামে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। এই ঘরে তিনটি দরজা থাকিত। কিন্তু দেওয়ালগুলিতে পলেস্তরা ছিল না। অতি পুরাতন, বিসদৃশ ক্ষয় প্রাপ্ত ইষ্টকের দাঁত বাহির করা ঘরগুলি অতীত যুগের কঙ্কালের মতো পড়িয়া থাকিত। কেহ কেহ কিন্তু ইহার দু-একটি ব্যবহারও করিতেন। নারায়ণশীলার পূজা গৃহরূপী বাকিগুলি অব্যবহৃতই থাকিত। আমাদের গ্রামে এরূপ পাঁচটি ঝিকুজী ঘর ছিল। মজুমদার বাড়ীতে দু'টী, লস্কর বাড়ীতে একটি, বড় সরকার বাড়ীতে একটি ও মধ্যম সরকার বাড়ীতে একটি।

গ্রামের বাজার

গ্রামের উত্তর পশ্চিমে মুন্সিবাড়ী প্রদত্ত জমিতে গ্রামের বাজার ছিল। এই বাজারটি গ্রাম বেষ্ঠনকারী· খালের তীরে বসিত। গ্রামের সহিত পাকা সড়ক ও মেঠো পথের মাধ্যমে ইহা যুক্ত ছিল। প্রত্যহ প্রাতে বাজার বসিত। এবং সংসারের প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিষই এখানে পাওয়া যাইত। আমাদের গ্রামবাসীরাও এই বাজারে সওদা করিতে আসিতেন। মুদী, কাপড়চোপড়, মিষ্টান্ন, মনিহারী ও অন্যান্য জিনিসপত্রের দোকানগুলি স্থায়ী ছিল। পোঃ অফিসের মত গ্রামের বাজারও গ্রামবাসীদের পক্ষে পরস্পরের সহিত মিলিবার একটি জায়গা ছিল। একমাত্র গ্রামবাসী দোকানদার ছিলেন গোঁসাইপাড়ার টেঁপাগোঁসাই। আর সব দোকানদাররা অন্য গ্রাম হইতে আসিতেন।

ইহা ছাড়া গ্রামের ভিতরে দুই ভাই, জগবন্ধু ও দীনবন্ধু পালের মুদীর দোকান ছিল। পরবর্ত্তীকালে লস্করবাড়ীর নিকটে

কৈবর্ত্তবাড়ীতেও একটি দোকান হইয়াছিল

গ্রামের শ্মশান

গ্রামের পূর্ব উত্তর কোণে, গ্রাম বেষ্ঠনকারী খালের পাড়ে, সরকারবাড়ীর দেওয়া জমিতে শ্মশানটি ছিল। ইহার বিশেষত্ব কিছুই ছিল না। উন্মুক্ত স্থানে মৃতদেহ দাহ করা হইত। সরকার বা শ্মশানের নিকটবর্ত্তী স্থানে কিছু আম্র বৃক্ষ রোপন করিয়াছিলেন। দেশে দাহ কার্য্য হইত আম্র কাষ্ঠেই কারণ এই কাষ্ঠ কাঁচা অবস্থাতেও জ্বলে। এই উন্মুক্ত শ্মশানের নীচে ছিল খাল এবং উপরে ছিল প্রশস্ত "দরজা" বা রাস্তা। এই দরজার পাশে হাজা মজা এক পুরাতন দীঘি ছিল। এবং এই বিরাট দীঘির পাড়ে তিনটি বিশাল বৃক্ষ ছিল। একটি অশ্বত্থ, একটি ডাল পালা কাটা বট এবং আর একটি বৃদ্ধ বট ·আপন ডাল পালা বিস্তার করিয়া পথ-চারীকে আপনার স্নিগ্ধ ছায়া বিতরণ করিত। ছেলেবেলায় শুনিতাম এই মধ্যের গাছটিতে একটা ভূত থাকিত, যে নাকি দিনের বেলাতেই সকলকে দর্শন দিত। এই শ্মশান স্কুলের নিকটে ছিল। কিন্তু স্থানটি উন্মুক্ত ছিল বলিয়া দিনে আমাদের তত ভয় করিত না। সন্ধ্যার পর উহার ধার কাছ মাড়াইতেও সাহস হইত না। যদিও স্কুলের খেলার মাঠটি উহার খুব কাছেই ছিল। পরে এই শ্মশানের আচ্ছার্দন যুক্ত একটি ইষ্টক নির্মিত ঘর বানাইয়া দেওয়া হইয়াছিল

বড় খালগুলি ব্যতীত আরও কতকগুলি "ঝোরাখাল"ও গ্রামে ছিল। এইগুলি পুকুরের সহিত খালকে যুক্ত করিত। বর্ষায় অন্যান্য গ্রামের মতই আমাদের গ্রামেও প্রচুর জল আসিত, কিন্তু আমাদের গ্রামের বিশেষত্ব ছিল এই যে সেই সময়েও গ্রামের সমস্ত

স্থানে হাঁটা পথে যাতায়াত করা যাইত। তাহার কারণ ছিল এই যে গ্রামটি অন্যান্য গ্রাম অপেক্ষা উচ্চতর জমিতে অবস্থিত ছিল। দ্বিতীয়তঃ জেলা বোর্ড আমাদের গ্রামে বহু কাষ্ঠ নির্মিত সেতু প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছিল। একটা পোল ছিল খুব লম্বা। এত লম্বা পোল অন্য গ্রামে দেখি নাই। বড়কী পাড়ার পুকুরের সারা পূর্ব-পাড়াটি জুড়িয়াই এই পোলটি ছিল। এবং এই পোলটি সারা গ্রামে হাঁটা পথে চলাচল করা খুব সুগম ও সহজ সাধ্য করিয়া দিয়া ছিল।

গ্রামের প্রবেশ পথ

সাধারণতঃ গ্রামে প্রবেশ করিতে হইলে নৌকা যোগেই আসিতে হইত। উত্তরে রেলের ষ্টেশন ছিল শীতললক্ষা নদীর পাড়ে এবং ষ্টিমার ঘাট ছিল কমলা ঘাটে ধলেশ্বরী নদীর পাড়ে। নারায়ণগঞ্জ হইতে শীতললক্ষা বাহিয়া ধলেশ্বরী নদীতে পড়িতে হইত। তারপর দক্ষিণ তীরে কমলাঘাট হইয়া ছোট নৌকায় ঝোরাখাল বাহিয়া মীরকাদিম বাজার হইয়া, আবদুল্লাপুর খাল দিয়া দৈধার মা'র হাটের পাশ কাটাইয়া সোনারং নয়াবাজার আসিতে হইত। এবং তাহার পর ঋষিবাড়ীর খাল দিয়া সোনারঙ্গে প্রবেশ করিতে হইত। এই পথটি ছোট, অনধিক তিন মাইল, তাই এই পথেই সচরাচর লোকে যাতায়ত করিত। উত্তরে আরও একটী ষ্টীমার ষ্টেশন ছিল তালতলা বাজার। সেও গ্রাম হইতে মাইল তিনেক দূরে। দক্ষিণ হইতে আসিতে হইলে "বহর" (পূর্বতন রাজবাড়ী) ষ্টীমার ঘাটে নামিয়া, বহরের খাল দিয়া, দীঘির পাড়, চাচইরতলা, বাহেরক, স্বর্ণগ্রাম, ফুলচর হইয়া মেবাজাবাদ, মাকোহাটীর পাশ দিয়া বিয়াইয়ার খালে পড়িতে হইত, পরে মাইরাল আলদী,

মোকামখোলা, টঙ্গীবাড়ী হইয়া ঋষিবাড়ীর খাল দিয়া গ্রামে প্রবেশ করিতে হইত। তবে লম্বা আট মাইলের মত পথ বলিয়া এপথে কেহ আসিতে চাহিত না। ইহা ছাড়া দক্ষিণে আরও একটী ষ্টেশন ছিল তারপাশাতে। কিন্তু ইহা ছিল বারো-তেরো মাইল দূরে। তাই নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে কেহ এপথে আসিত না।

গ্রামের পাঠাগার

১৯১০-১১ সালে গ্রামে একটি সাধারণ পাঠাগার ছিল। গুপ্তের বাড়ীতে পাঠাগারটি অবস্থিত ছিল। বিরাজ সেন ইহার দেখাশুনা করিতেন। আমার আজও মনে পড়ে সেই পাঠাগার হইতে একখানা বহি 'ভুতের জাহাজ' নিয়া আমি পড়িয়াছি। পাঠাগারটি পরে রায়ের বাড়ী স্থানান্তরিত করা হয়। মাখন সেন একখানা এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকা (সম্পূর্ণ বইখানা) দিয়াছিলেন। ১৯১৩ সালের অগ্নিকাণ্ডে রায়ের বাড়ীর সহিত পাঠাগারটী পুড়িয়া যায়। অনেক কষ্টে আমরা পুস্তকখানা রক্ষা করিয়া স্কুলে স্থানান্তরিত করিয়াছিলাম। ১৯১৭ সালে স্কুলের অগ্নিকাণ্ডে এই বইখানাও পুড়িয়া যায়। আমার দাদা শৈলেন সেন ঐ সময়ে গ্রামের স্কুলে শিক্ষকতা করিতেন। তিনি কিন্তু বলেন ৩৫ ভলিউমের বইখানা রক্ষা পাইয়াছিল।

গ্রামের নাট্যসমিতি

গ্রামে একটি নাট্য সমিতি ছিল। নাম ছিল তার 'সোনারঙ্গ ভারতী নাট্য সমিতি'। এই সমিতির নিজস্ব পোষাক পরিচ্ছদ ও দৃশ্যপট ছিল। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামবাসীরা নিজেদের ব্যবহারের জন্য

প্রায়ই এইগুলি ধার নিত। আমি অতি শৈশবে তারিণী সেনের বাড়ীতে এই থিয়েটার হইতে দেখিয়াছি। পরে ক্রমান্বয়ে মুন্সিবাড়ীর অখিল সেনের বাড়ীতে, গোঁসাইপাড়া সূর্য্য মন্দির প্রাঙ্গণে, তারক ডাক্তারের বাড়ীতে এবং সর্ব্বশেষ রায়ের বাড়ীতে এই থিয়েটার হইত। সেই সময় গ্রামস্থ লোকেরাই নাটক করিত। পরবর্ত্তী যুগে অধিকাংশ কর্মক্ষম ব্যক্তি কার্য্যব্যপদেশে বিদেশে থাকাতে গ্রীষ্মবকাশে বা পূজার ছুটিতে যুবকেরা গ্রামে ফিরিলে নাটক ইত্যাদি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হইত। আমাদের সময়ে ·অবিনাশ রায়, চারু রায়, অতুলানন্দ, তারক সেন, জিতেন দাশ, সুধীর সেন প্রভৃতি ভাল অভিনয় করিতেন। চারু রায়ের চাণক্যের পাঠ হয়তো আজও সকলের মনে আছে। অতুলানন্দের সিরাজের মেয়ে রাজিয়ার গান আজও প্রাণে শিহরণ তোলে। "শুনেছি দুনিয়া তোমার, তুমি বল তুমি আমার", আবার "যতদিন এ ভবে থাকি আমি যেন সুখে থাকি, সুখের বেলা ফুরিয়ে গেলে আমি যেন চলে যাই"। ইহা ভিন্ন অন্য সময়ে ও বিবাহাদি উপলক্ষে থিয়েটারাদি হইত।

সোনারঙ্গের প্রাচীন তত্ত্ব ও সমৃদ্ধি

অনুমিত হয় সোনারং অতি প্রাচীনকালে হইতে দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বেও একটী সমৃদ্ধ জনপদ ছিল। খৃঃ প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে লেখা Periplus এর গ্রন্থে ও টলেমীর বিবরণে গঙ্গানদীর শাখা কুমার নদীর পূর্ব্ব তীরে প্রসিদ্ধ গঙ্গারিডই রাজ্যের রাজধানী গাঙ্গে নগরী অবস্থিত ছিল। এবং তাহারই আশে পাশে কোনও স্থানে সোনার খনি ছিল। এই খনি হইতে স্বর্ণ মিশ্রিত মৃত্তিকা উত্তোলন করিয়া অন্যত্র কতিপয় স্থানে মৃত্তিকা শোধিত হইয়া সোনা প্রস্তুত হইত। এই সব স্থানে পরে আপনাদের নামের সাথে সোনা

নাম সংযুক্ত করিয়া দেয়। ইহা হইতেই পূর্ব্ববঙ্গস্থিত সপ্তম শতকের সুবর্ণ বিথী (শাসন বিভাগ) এবং অধুনা সোনারং গ্রাম সোনাকান্দা গ্রাম, সুবর্ণ গ্রাম সুবর্ণরেখা নদী প্রভৃতি নামের উৎপত্তি হইয়াছে। ইহাও অনুমান করা যায় যে সোনার মত অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পদার্থ যে যে স্থানে শোধিত হইত সেই সব স্থানের কিছু বিশেষত্ব (Importance) তখনকার দিনে নিশ্চয় ছিল। নচেৎ ঐ সব স্থানে কিছুতেই সোনা শোধিত হইত না। সুতরাং সেই প্রথম শতকেও সোনারং সমৃদ্ধ জনপদ ছিল। আজও তাল তাল সোনা এই স্থানে বিশেষতঃ সোনারং গ্রামে পাওয়া যায়।

পূর্ব ভারতের সমতট দেশের বিক্রমণিপুর নগর অতি প্রাচীন স্থান। বর্ম্ম, পাল ও সেন রাজগণের স্কন্দাবার এইখানেই ছিল। এই বিক্রমণিপুরই পরে রাজা রাম পালের সময় রামপাল নাম গ্রহণ করে এবং রাজধানী রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষে সোনার গাঁওয়ে রাজা দনুজ রায় রাজধানী রাম পাল বা বিক্রমণিপুর হইতে সোনার গাঁও এ স্থানন্তরিত করেন। সোনারঙ্গ জনপদ রাজধানীর অংশভূক্ত হইয়া চতুর্দ্দশ শতাব্দী পর্যন্ত আপনার গৌরব ও সমৃদ্ধি অক্ষুন্ন রাখিয়াছিল।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে সূর্যসেন আসিয়া সোনারং গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। তিনি নিজে কবিরাজ ছিলেন এবং তাঁহার বংশের পর পর চার পুরুষ সকলেই কবিরাজ ছিলেন। তন্মধ্যে রঘুনাথ সেন আপনার ব্যবসায়ে এমন প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া ছিলেন যে দেশের রাজা —নবাবের গৃহেও তাঁহার যাতায়াত ছিল। পর পর চার পুরুষ একস্থানে কবিরাজী করা, তার মানে ঐ স্থান নিশ্চয় সমৃদ্ধ ও বসতি পূর্ণ ছিল। কারণ কবিরাজী করিয়া জীবিকা অর্জ্জন

ও তাহাতে সমৃদ্ধ লাভ করা শূন্য বা নির্জন স্থানে হয় না। সুতরাং দেখা যায় পঞ্চদশ হইতে অন্ততঃ ষোড়শ বা সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত সোনারং গ্রাম সমৃদ্ধ জনপদ ছিল। ব্রিটিশ আমলে উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর কথা আমরা নিজেরাই জানি। ধনে জনে মানে শিক্ষা ও কৃষ্টিতে সোনারং গ্রাম তখন বাংলা দেশের একটী মধ্যমণি বলিয়া বিবেচিত হইত। এই দ্বিসহস্র বৎসর ব্যাপী সমৃদ্ধ জনপদ সোনারংকে আমরা হারাইয়াছি।

গ। প্রাচীন বাংলার কথা—সেনবংশ পর্য্যন্ত

রাজ কাহিনী

যে স্থানে অধিবাসীরা বা অধিকাংশ লোক বাংলা ভাষাতে কথা বলে তাহারই নাম বাংলা দেশ এবং সেখানকার অধিবাসীদের নাম বাঙ্গালী। সেই অনুসারে আসামের কতক অংশ, কাছাড় ও গোয়াল পাড়া, বিহারের সিংহভূম, মানভূম ও সাঁওতাল পরগণার কতক অংশ পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব্ববঙ্গ নিয়া বাংলাদেশ গঠিত। কিন্তু এই সংজ্ঞা অনুসারে আবার বাংলার উত্তর পূর্ব অঞ্চলের কয়েকটি পার্ব্বত্য জনপদ বাংলার বাহিরে পড়ে।

প্রাচীন হিন্দু যুগে বাংলার কোন বিশিষ্ট নাম ছিল না। এক একটি অংশের পৃথক নাম ছিল। উত্তরবঙ্গে ছিল পুণ্ড্র বর্দ্ধন ও বরেন্দ্রভূমি, পশ্চিমবঙ্গে তাম্রলিপ্ত ও রাঢ়, দক্ষিণ ও পূর্ব্ববঙ্গে বঙ্গ সমতট, হরিকেল, বঙ্গাল প্রভৃতি। রাজমহলের কাছে কজংগল নামে আরও একটী জনপদ ছিল। ইহা ছাড়াও উত্তর ও পশ্চিম-বঙ্গের কতকটা অংশ গৌড় নামে পরিচিত ছিল। এসব অঞ্চলের সঠিক সীমানা বর্ণনা করা যায় না। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ইহার বিস্তার

ও হ্রাস হইয়াছে। মুসলমান যুগেই সর্ব্ব প্রথম এই সমুদয় দেশ একত্রে "বাংলা" নামে পরিচিত হয়। এবং "বংগাল" হইতেই সমগ্র দেশের নাম "বাংলা" হইয়াছে। অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগে "গৌড়" ও "বঙ্গ" এই দুইটি নামেই সাধারণতঃ বাংলা দেশকে অভিহিত করা হইত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি হিন্দু যুগে বাংলার বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন নাম ছিল। ইহার মধ্যে যে কয়টি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, তাহাদের কথা সংক্ষেপে লিখিতেছি।

বঙ্গদেশ

ইহা বর্ত্তমানের দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গ লইয়া গঠিত ছিল। ইহার দুইটি ভাগ ছিল। বিক্রমপুর ও নাব্য। বিক্রমপুর এখনও সুপরিচিত। নাব্য সম্ভবতঃ বরিশালের ও ফরিদপুরের জলে ভরা নিম্ন ভূমি। এই অঞ্চলে যাতায়াতের প্রধান উপায় নৌকা। সমতট হরিকেল ও বঙ্গাল কখনও সমগ্র বঙ্গ কখনও ইহার অংশ বিশেষের নামরূপে ব্যবহৃত হয়।

পুণ্ড্র ও বরেন্দ্র

পুণ্ড্র একটী জাতির নাম। প্রাচীনকালে এই জাতি উত্তর-বঙ্গে বাস করিত বলিয়া এই অঞ্চলের নাম পুণ্ড্রদেশ বা পুণ্ড্রবর্দ্ধন। কালে ইহার সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র দেশকেই পুণ্ড্র-বর্দ্ধন বলা হইত। বরেন্দ্র উত্তর বঙ্গের আর একটি প্রসিদ্ধ জনপদ।

রাঢ়

ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে রাঢ় দেশ অবস্থিত ছিল। ইহার দক্ষিণে বর্ত্তমান মেদিনীপুর অঞ্চলে তাম্রলিপ্ত ও দণ্ডভুক্তি নামে

দুইটি দেশ ছিল।

গৌড়

বর্ত্তমান মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের একটি ক্ষুদ্র ভাগ। প্রাচীন-কালে গৌড় নামে পরিচিত ছিল। ষষ্ঠ শতকে এই দেশ প্রায় সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল সপ্তম শতাব্দীতে মুর্শিদাবাদের নিকটবর্ত্তী 'কর্ণসুবর্ণ' গৌড়ের রাজধানী ছিল। এই দেশের রাজা শশাংক দিগ্বিজয়ী রাজা ছিলেন। তিনি পূর্বে প্রাগজ্যোতিষপুর জয় করিয়া উত্তরে কনৌজের দ্বার পর্যন্ত হানা দিয়াছিলেন। মুসলমান যুগের প্রারম্ভে মালদহ জেলার লক্ষণাবতী গৌড় নামে পরিচিত ছিল। অষ্টম শতকে প্রসিদ্ধ চম্পানগরী গৌড়ের রাজধানী ছিল। হিন্দু যুগের শেষের দিকে বাংলা দেশ গৌড় এবং বঙ্গ—প্রধানতঃ এই দুই ভাগেই বিভক্ত ছিল। মুসলমান যুগের শেষ ভাগে আবার গৌড় বলিতে সমগ্র বাংলা দেশকেই বুঝাইত।

বাঙ্গালী জাতি

বাংলা অতি প্রাচীন দেশ। তবে ইহার দক্ষিণ-পূর্ব ভাগ অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী যুগে পলিমাটী জমিয়া গঠিত হইয়াছিল। এইদেশে প্রস্তর ও তাম্রযুগের অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গিয়াছে। বৈদিক ধর্মাবলম্বী আর্য্যগণ যখন পঞ্চনদে বসতি স্থাপন করেন তখন ও তাহার পর বাংলা দেশের সহিত তাহাদের কোন সংযোগ ছিল না। বৈদিক যুগের শেষে ঐতরেয় ব্রাহ্মণে অনার্য্য ও দস্যু বলিয়া পুণ্ড্র-জাতির উল্লেখ আছে এবং ঐখানেই আছে যে এই দেশে কেবল পাপাচারী লোক বাস করে। ইহা বৈদিক সভ্যতার বহির্ভূত বলিয়া এই দেশে স্বল্পকালের জন্য বাস করিলেও প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে বলিয়া নির্দ্দেশ ছিল।

প্রস্তরযুগে এখানে "নিষাদজাতি" (Austric) অর্থাৎ কোল, শবর, পুলিঙ্গ, হাঁড়ি, ডোম, চণ্ডাল প্রভৃতি জাতি বাস করিত। নিষাদ জাতির পরে আরও কয়েকটী জাতি এখানে আসিয়া বসবাস আরম্ভ করে। ইহাদের পরাভূত করিয়া যাহারা বাংলা দেশে বাস স্থাপন করে তাহারাই বর্ত্তমান বাংলার ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি বর্ণভুক্ত সমুদয় হিন্দুর পূর্বপুরুষ। ইহারা আর্য্যজাতির বংশ সম্ভুত নহে। মস্তকের গঠন প্রণালী হইতে প্রমাণিত হইয়াছে যে আর্য্যাবর্ত্তের যে স্থানে আর্য্যগণ বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন সেখানকার হিন্দুগণ দীর্ঘশির বা Dolicocephalic কিন্তু বাংলার হিন্দুগণ প্রশস্তশির বা Brachycephalic। সাধারণতঃ মানুষের শ্রেণী বিভাগ নির্ণীত হয় মস্তকের দৈর্ঘ্য ও প্রস্ত হিসাবে। আর্য্যগণ ও বাংলার উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুগণ এক শ্রেণীভুক্ত নহেন। রীজ্‌লী সাহেবের মতে মাঙ্গোলীয় ও দ্রাবিড় জাতির সংমিশ্রণে বাঙ্গালী জাতির উদ্ভব হইয়াছে। কিন্তু এখন এইমত পরিত্যক্ত হইয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন পামীর ও টাকলামাকান অঞ্চলের অধিবাসী বা Homo-Alpinus নামক জাতিই বাঙ্গালীর পূর্বপুরুষ। ইহাদের ভাষা আর্য্যজাতীয় হইলেও ইহারা বৈদিক ধর্মাবলম্বী আর্য্যগণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। কিন্তু বাঙ্গালী একটী স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট জাতি।

আর্য্যগণ বাংলা দেশে উপনিবেশ স্থাপনের পূর্বে বাঙ্গালী জাতির পূর্ণ সভ্যতার পরিচয় এক্ষণে পাওয়া গিয়াছে। কর্মফল, জন্মান্তরবাদ, বৈদিক হোম ও যাগযজ্ঞের বিরোধী পূজা প্রণালী, শিব, শক্তি ও বিষ্ণুর আরাধনা প্রাচীন বঙ্গ সভ্যতার অঙ্গ ছিল। বৈদিক যুগের শেষ ভাগে বাংলা দেশে আর্য্য সভ্যতা আসে। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর প্রারম্ভে বাংলা দেশে আর্য্যগণ প্রথম পদার্পণ

করেন। এই সভ্যতা ঐখানে দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় চতুর্থ—ষষ্ঠ শতকে যখন গুপ্ত বংশীয় সম্রাটগণ এখানে সাম্রাজ্য বিস্তার করেন। এই সময় আর্য্যসভ্যতা বাঙ্গালীর আদি সভ্যতাকে সম্পূর্ণ-ভাবে গ্রাস করিয়া ফেলে বটে, কিন্তু বাঙ্গালীর 'খোকা খুকি' ডাক, বাঙ্গালী মেয়ের শাড়ী, সিন্দুর, পান হলুদ ব্যবহার, বাঙ্গালীর কালী, মনসা ও শিবের গাজন আজিও এই জাতির সেই আদিম সভ্যতার পরিচয় বহন করিতেছে।

পুরাণে ও মহাভারতে কথিত আছে, ঋষি যযাতির বংশধর রাজা বলির পত্নী সুদেষ্ণার পাঁচটী পুত্র হয়—অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম ও পুণ্ড্র। অঙ্গ বর্ত্তমান ভাগলপুর। উড়িষ্যা ও তাহার দক্ষিণ ভূ-ভাগ হইল কলিঙ্গ। পুণ্ড্র, সুহ্ম ও বঙ্গ যথাক্রমে বাংলার উত্তর পশ্চিম ও দক্ষিণ পূর্ব্ব ভূভাগ। সুতরাং এই প্রদেশগুলির অধিবাসীরা সকলেই এই একই বংশদ্ভূত।

গুপ্তযুগের পূর্ব্বে বাংলা দেশের কোন ধারাবাহিক ইতিহাস নাই। তবে নানা ধর্মগ্রন্থে কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যায়। কিন্তু ইহা ইতিহাস নহে। সিংহলের পালি ধর্মগ্রন্থ 'মহাবংশে' আছে যে বঙ্গদেশের রাজা সিংহবাহুর পুত্র বিজয় সিংহ সিংহপুর হইতে তাঁহার সপ্তদশ সঙ্গী লইয়া লংকাদ্বীপ অধিকার করিয়া রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর বাংলাদেশ হইতে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র আসিয়া সিংহাসনে আরোহন করেন। তাঁহার নাম ছিল পাণ্ডু বাসুদেব। ভগবান বুদ্ধের নির্বাণলাভের অব্যবহিত পূর্বে এই ঘটনা ঘটে।

মহাভারতেও বাংলা দেশের কিছু রাজার কথা আছে। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত রাজগণের মধ্যে বঙ্গরাজ সমুদ্র-

সেনের পুত্র চন্দ্রসেন, পৌণ্ড্র রাজ বাসুদেব এবং তাম্রলিপ্তের রাজার উল্লেখ পাওয়া যায়। তাহার পর জরাসন্ধের মৃত্যুর পর অঙ্গরাজ কর্ণের অধীনে কলিঙ্গ, অঙ্গ, সুহ্ম, পুণ্ড্র ও বঙ্গ লইয়া (বর্ত্তমান বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার অধিকাংশ) এক বিশাল রাজ্য গঠিত হয়। ইহা কতখানি সত্য বলা যায়না। কিন্তু খৃঃ পূঃ ৩২৭ অব্দে যখন আলেকজাণ্ডার ভারত আক্রমণ করেন, তখন যে বাংলা দেশে এক প্রবল পরাক্রান্ত সমাজ্য ছিল সম-সাময়িক গ্রীক ও ল্যাটিন লেখক-গণের লেখা হইতে ইহা বেশ বোঝা যায়। সেই সময়ের এই লেখকগণের লেখা অনেক সাহিত্য আছে। ইহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে বিপাশা নদীর পূর্বতীরে দুইটি পরাক্রান্ত সাম্রাজ্য ছিল—একটি প্রাচ্য রাজ্য ও আর একটি গঙ্গারিডই রাষ্ট্র। প্রাচ্য রাজ্যে 'প্রাসিযয়' নামক একজাতি বাস করিত তাহাদের রাজধানীর নাম "পলিবোথরা" (পাটলীপুত্র)। ইহারা গঙ্গারিডই রাজ্যের পশ্চিমে বাস করিত। গঙ্গারিডই রাষ্ট্রের রাজধানী ছিল গাঙ্গে নগরীতে এবং এই নগরী অবস্থিত ছিল গঙ্গার মোহনায়। গঙ্গার শাখা কুমারনদীর পূর্ব্বতীরে এই গাঙ্গে নগর সামুদ্রিক বাণিজ্যের এক বৃহৎ বন্দর ছিল। এই নগরী হইতেই ভারতের বহির্বাণিজ্য মুখ্যতঃ পরিচালিত হইত। তাম্রলিপ্ত নামে আর একটি বাণিজ্য বন্দর প্রাচ্যরাজ্যে অবস্থিত ছিল। খৃঃ পূঃ তৃতীয় ও চতুর্থ শতকে এই দুইটি রাজ্য একই রাজার অধীনে ছিল। পরে বা পূর্বে হয়তো এই দুইটি রাজ্য নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া চলিত। কিন্তু তখনকার গ্রীক ও ল্যাটিন লেখকগণ গঙ্গারিডই রাজ্যকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। কিন্তু ইহারা নন্দরাজার কোন উল্লেখ করেন নাই। তাই অনুমান করা যায় গঙ্গারিডই রাজা মগধাদি জয় করিয়া পাঞ্জাবের বিপাশানদী

পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল এবং পাটলীপুত্রে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিল, যেমন পরবর্ত্তী যুগে পাল রাজাগণ গৌড় হইতে পাটলীপুত্রে আপন রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। পাটলী-পুত্রে রাজধানী স্থাপনের পর গঙ্গারিডই রাজা নন্দরাজা নামে পরিচিত হন। তাহাতে মনে হয়, নন্দরাজ বাঙ্গালী ছিলেন। এই গঙ্গারিডই রাজ্যের চারি সহস্র হস্তী ছিল এবং নৌ শক্তিও যথেষ্ট ছিল। এই হস্তী এবং নৌশক্তির কথা শুনিয়া ভুবনবিজয়ী আলেক-জাণ্ডার এই দেশ জয়ের আশা ত্যাগ করেন।

এই গঙ্গারিডই রাজ্যের কথা আমরা আবার পাঁচ শতাব্দী পরে অর্থাৎ প্রথম ও দ্বিতীয় খৃষ্টাব্দে পেরিপ্লাস গ্রন্থে ও টলেমীর 'ভূগোলে' দেখিতে পাই। এই দুই গ্রন্থে জানা যায়, তখনও কুমার নদের তীরে গাঙ্গে নগরীতেই এই রাজ্যের রাজধানী এবং এইখান হইতেই তখনও ভারতের আন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য পরিচালিত হইত। বাংলার সুবিখ্যাত মসলিন এইখান হইতেই বিদেশে রপ্তানী হইত।

কিন্তু এই সংবাদটুকু ছাড়া খৃষ্ট জন্মের তিনশত বৎসর পূর্বে ও পরে, এই ছয়শত বৎসরের ইতিহাস অন্ধকারে আচ্ছন্ন। বিদেশী ঐতিহাসিকগণ যে গঙ্গারিডই রাজ্য ও তাহার অধিবাসীদের সাম্রাজ্য ও ঐশ্বর্য্যে মুগ্ধ হইয়া ইহাকেই ভারতের শ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং ছয় শতাধিক বৎসর ধরিয়া যাঁহারা বাংলা দেশে রাজত্ব করিয়াছেন, দুঃখের বিষয় এই দেশের পুরাণে বা অন্য কোন গ্রন্থে এই জাতি বা সাম্রাজ্যের কোন উল্লেখ নাই। যাহা হউক, গ্রীক ও ল্যাটিন লেখকদের কৃপায় আমরা বাংলা দেশের কিছু ইতিহাস জানিয়াছি। এই গঙ্গারিডই রাজ্য খৃঃ পূঃ চতুর্থ

শতক হইতে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতক পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিল। গঙ্গারিডই রাজ্যের পরবর্ত্তী দুইশত বৎসর চতুর্থ শতকের প্রারম্ভে গুপ্ত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা পর্য্যন্ত প্রাচীন বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস অল্পই জানা যায়। অথচ পেরিপ্লাস গ্রন্থে ও টলেমীর বিবরণে, জাতকের গল্পে ও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে দেখিতেছি এই দেশের সমৃদ্ধি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত—বাণিজ্য সূত্রে ভারতের অন্যান্য দেশ ও ভারতের বাহিরে মিশর ও রোমক সাম্রাজ্য পূর্ব দক্ষিণ এশিয়ার দেশ ও দ্বীপসমূহ চীন ও সিংহলের সহিত এই রাজ্যের যোগাযোগ। শাস্ত্র ও সমাজগত শাসন শৃঙ্খলা বর্ত্তমান না থাকিলে এইরূপ সুদূর প্রসারী ব্যবসা বাণিজ্য সম্ভব হইত না। ব্যবসা উপলক্ষেই উত্তর ভারতের আর্য্য ভাষা, আর্য্য ধর্ম ও আর্য্য সভ্যতা ক্রমশঃ বাংলা দেশে প্রবেশ করিয়াছিল। তাহারপর আসিল চতুর্থ শতক হইতে ষষ্ঠ শতক পর্য্যন্ত গুপ্তযুগের আধিপত্য। প্রথম চন্দ্রগুপ্ত ও সমুদ্রগুপ্তের সময়ে বাংলা দেশে কতকগুলি স্বাধীন রাজ্য ছিল। বর্ত্তমান বাঁকুড়ার নিকট পুষ্পরণের অধিপতি সিংহ বর্মা ও তাঁহার পুত্র চন্দ্র বর্মা বাঁকুড়া হইতে ফরিদপুর পর্য্যন্ত দেশ শাসন করিতেন। ইহাকে পরাজিত করিয়া গুপ্তরাজ দক্ষিণ ও পশ্চিম বাংলা অধিকার করেন। পুণ্ড্রবর্দ্ধন ও সমতটও ক্রমে গুপ্তরাজার অধীন হয়। প্রাচীন দিল্লী শহরের কুতবমিনারে একটি লৌহস্তম্ভ আছে। উক্ত স্তম্ভের খোদিত লিপি হইতে জানা যায় চন্দ্র নামে একজন রাজা বঙ্গের সম্মিলিত রাজশক্তিকে পরাজিত করিয়া ছিলেন। সেই চন্দ্র রাজা কে ছিলেন তাহা নিয়া মতভেদ আছে। কিন্তু রাজা চন্দ্র যিনিই হউন দিল্লীতে স্তম্ভ লিপি হইতে জানা যায় যে তখন বাংলা দেশে একাধিক রাজা ছিলেন। এবং লিপি অনুযায়ী এই

ঘটনার সময় খৃষ্টীয় চতুর্থ শতক অর্থাৎ গুপ্তযুগের প্রাক্কালে। এবং ইহাও প্রমাণিত হয় যে আত্মরক্ষার জন্য প্রয়োজন হইলে এই রাজারা বহিশত্রুর বিরুদ্ধে একত্র হইয়া যুদ্ধ করিতেন। এই সময়কার আরো কয়েকজন স্বাধীন রাজার নাম পাওয়া যায়। যথা রাজা গোপচন্দ্র, রাজা ধর্মাদিত্য ও রাজা সমাচার দেব। এই রাজাদের সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু জানা যায়না।

সপ্তম শতকের প্রারম্ভে রাজা বৈণ্যগুপ্ত আপনার স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করিয়াছিলেন। বর্দ্ধমান হইতে ত্রিপুরা পর্য্যন্ত রাজা বৈণ্যগুপ্তের রাজত্ব ছিল। বোধ হয় এই সময়েই সমতটে খড়্গ বংশের খবর পাওয়া যায়। কর্মান্তে ত্রিপুরা জেলার বর্ত্তমান বড়কামতায় তাহাদের রাজধানী ছিল।

ষষ্ঠ শতকের শেষে, গুপ্তরাজ্যের অবসানকালে উত্তর পশ্চিম বঙ্গের কতক অংশ নিয়া গৌড় নামে একটি জনপদ প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং সপ্তম শতকের প্রারম্ভে এইখানে গৌড়রাজ শশাংকের অভ্যুদয় হয়। উত্তর ভারতে সার্বভৌম রাজ্যগুলির সমবেত শক্তির (কনৌজ, স্থানেশ্বর, কামরূপ, মৈত্রী) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া, শেষ পর্য্যন্ত স্বাধীন নরপতিরূপে তিনি বিস্তৃত সাম্রাজ্যের অধিকারী হইয়াছিলেন। কর্ণসুবর্ণ ছিল তাঁহার রাজধানী। বাঙ্গালী রাজগণের মধ্যে তিনিই প্রথম সার্বভৌম নরপতি। বাংলার ইতিহাসে শশাঙ্কের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। তিনিই প্রথমে আর্য্যাবর্ত্তে বাঙ্গালীর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেন এবং ইহা আংশিকভাবে কার্য্যে পরিণত করেন। তিনি উত্তর ভারতের তৎকালীন শ্রেষ্ঠ মৌখরীরাজের কূটনীতি সম্পূর্ণরূপে বিফল করিয়া দেন। প্রাগজ্যোতিষপুরের রাজাকে পরাজিত করেন এবং থানেশ্বরের শক্তিশালী

রাজা হর্ষবর্দ্ধনের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যায় আপন আধিপত্য বজায় রাখিয়াছিলেন। শশাঙ্ক মোট একত্রিশ বৎসর (৬০৬ খৃ --৬৩৭ খৃ) রাজত্ব করিয়াছিলেন।

শশাঙ্কের মৃত্যুর পর একশত বৎসর অনৈক্য, আত্মকলহ ও বহিঃশত্রুর পুনঃ পুনঃ আক্রমণের ফলে বাংলার রাজতন্ত্র প্রায় ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই সময়ে গৌড়রাজ কাশ্মিরাধিপতি ললিতা-দিত্য রুদ্রাপীড়ের অধীনতা স্বীকার করেন। ঐতিহাসিক কলহন তাঁহার "রাজতরঙ্গিনী" নামক তৎকালীন কাশ্মিরের ইতিহাস গ্রন্থে গৌড় সম্বন্ধে একটি কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন। ললিতাদিত্য গৌড়রাজকে কাশ্মীর যাইতে আমন্ত্রণ জানান এবং পরিহাস কেশব নামক বিষ্ণুমূর্ত্তির নামে শপথ করিয়া বলেন যে কাশ্মীরে আসিলে গৌড়েশ্বরের কোন ক্ষতি বা বিপদ হইবে না। কিন্তু গৌড়রাজ কাশ্মীরে উপস্থিত হইলে ললিতাদিত্য বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাঁহাকে হত্যা করেন। এই ঘৃণ্য বিশ্বাসঘাতকার প্রতিশোধ লইবার জন্য কতিপয় বাঙ্গালী বীর, নিশ্চিত মৃত্যু জানিয়াও তীর্থযাত্রীর ছদ্মবেশে কাশ্মিরে গিয়া পরিহাস কেশবের মূর্ত্তি চূর্ণ করিবার জন্য ঐ মন্দিরে প্রবেশ করেন। কিন্তু ভুলক্রমে যে মন্দিরে প্রবেশ করিলেন ও মূর্ত্তি ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিলেন তাহা পরিহাস কেশবের মন্দির বা মূর্ত্তি নহে। ভগবান রামমূর্ত্তির মন্দির ও মূর্ত্তি। মথন তাঁহারা মূর্ত্তি ভাঙ্গিতে ছিলেন, তখন কাশ্মীর সৈন্যদল আসিয়া তাঁহাদের হত্যা করে। কল্হন এই বাঙ্গালী বীরগণের বীরত্ব, প্রভুভক্তি ও আত্ম ত্যাগের অনেক প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু কোন বাংলা গ্রন্থে ইহার উল্লেখ নাই এবং গৌড়রাজ কে ছিলেন তাহারও কোন সন্ধান নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি শশাংকের মৃত্যুর পর একশত বৎসর ধরিয়া অনৈক্য, আত্মকলহ ও বহিঃশত্রুর পুনঃ পুনঃ আক্রমণে বাংলার রাজতন্ত্র প্রায় ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল। সমগ্র বাংলা দেশে তখন এক অভূতপূর্ব্ব নৈরাজ্য। গৌড়, বঙ্গ, সমতটে তখন কোন রাজার আধিপত্য নাই। প্রতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আপন আপন এলাকায় স্বাধীন ভাবে শাসন করিতেন। ফলে তখন দুঃখ দুর্দ্দশার অন্ত ছিল না। কোথাও কোন শাসন শৃংখলা ছিল না। এই অবস্থাকে 'মাৎস্যন্যায়' বলা হইয়া থাকে। যে নীতি অনুযায়ী বড় মাছ দুর্ব্বল ছোট মাছকে খাইয়া ফেলে তাহাকেই মাৎস্যন্যায় বলে। এই শতবর্ষব্যাপী (মধ্য সপ্তম শতক হইতে মধ্য অষ্টম শতক) মাৎস্যন্যায়ের দুর্দ্দশা হইতে মুক্তি লাভের জন্য বাঙ্গালী জাতি যে রাজনৈতিক বিজ্ঞতা, দূরদর্শিতা ও আত্মত্যাগের পরিচয় দিয়াছিল বিশ্ব ইতিহাসে তাহা এক চিরস্মরণীয় ঘটনা। দেশের নেতাগণ স্থির করিলেন সর্ব্বপ্রকার আত্মকলহ ভুলিয়া একজনকে রাজপদে নির্বাচিত করিয়া সকলেই স্বেচ্ছায় তাহার অধীনতা স্বীকার করিবেন। দেশের জনসাধারণও এই মত স্বীকার করেন এবং গোপাল নামে এক ব্যক্তি বাংলাদেশের রাজপদে নির্ব্বাচিত হইলেন। বাংলার স্বর্ণযুগের রচনাকারী পাল বংশের সূচনা হইল।

গোপাল যে কে ছিলেন তাহা সঠিক জানা যায় না। তবে সান্ধ্যকর নন্দীর মতে পাল বংশের আদিস্থান বরেন্দ্রভূমি পুণ্ড্র বর্দ্ধনের কোন ক্ষত্রিয় বংশে গোপালের জন্ম। তিনি ছিলেন দয়িতবিষ্ণুর পুত্র এবং বপ্পটের পৌত্র। যাই হোক গোপাল যে একজন যুদ্ধ ব্যবসায়ী ও যুদ্ধে নেতৃস্থানীয় ছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কারণ বাংলার নেতৃবর্গ নিশ্চয়ই একজন কালোপযোগী যোগ্য

ব্যক্তিকেই রাজপদে নির্বাচিত করিয়াছিলেন। অষ্টম শতকের মাঝামাঝি গোপাল পালবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এবং দ্বাদশ শতকের প্রথম দিকে গোবিন্দ পালের রাজত্বকালে এই বংশের সমাপ্তি ঘটে। ৭৫০ খৃঃ হইতে ১১৬০ খৃঃ পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ চারিশত বৎসর ধরিয়া একটি রাজবংশের নিরবচ্ছিন্ন রাজত্বের ইতিহাস খুব কম দেশেই পাওয়া যায়। পাল সাম্রাজ্যের পতনের পরও পালরাজাগণ ১১৯১ খৃঃ পর্য্যন্ত বিহারে রাজত্ব করিয়াছিলেন। মুসলমানগণ তাহার পর এই রাজবংশের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ সাধন করেন।

গোপালের পুত্র ধর্ম্মপাল, পৌত্র দেবপাল আর্য্যাবর্ত্তে এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। গৌড়ে তাঁহাদের রাজধানী ছিল। পরে মগধ জয় করিয়া পাটলীপুত্রে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। ধর্ম্মপাল প্রায় সমগ্র উত্তর ভারতে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহার একটি উপাধি ছিল "পঞ্চগৌড়াধীপ"। "রাজতরঙ্গিনী"তে পঞ্চগৌড়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন গৌড় সারস্বত দেশ (পাণ্ডহারের পূর্ব্বভাগ), কান্যকুব্জ, মিথিলা ও উৎকল। গৌড়েশ্বর ধর্ম্মপালের সাম্রাজ্য হইতে এই নামের উৎপত্তি। এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ধর্ম্মপালের পুত্র সম্রাট দেবপাল। তাঁহার সহায় ছিল তাঁহার দুই বিচক্ষণ মন্ত্রী, দর্ভপানি ও কেদার মিশ্র। এই দুই মহামন্ত্রীর সহায়তায় দেবপাল হিমালয় হইতে বিন্ধ্য ও পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তিনি প্রতিহাররাজ ভোজদেব ও রাষ্ট্রকুটরাজ অমোঘবর্ষকে পরাজিত করিয়াছিলেন। উৎকলরাজ ও প্রাগ্‌জ্যোতিষপুররাজ তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। দেবপালের সময়েই পালসাম্রাজ্য সর্বাধিক বিস্তার লাভ করিয়াছিল।

পালরাজগণ বৌদ্ধ ছিলেন। রাজা গোপাল শ্রীবিক্রমপুরী বিহার নির্মাণ করেন। ধর্ম্মপাল মগধে বিক্রমশীলা বিহার, বরেন্দ্র-ভূমিতে সোমপুর বিহার ও বিহারে ওদন্তপুরী বিহার নির্মাণ করেন। পালরাজগণ ইতিহাসে "গৌড়রাজ" নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। কিন্তু পরে পাটলীপুত্রে রাজধানী স্থানান্তরিত করিবার পর সেখানেই বাস আরম্ভ করেন। এই বংশে আঠারো জন রাজা রাজত্ব করিয়া-ছিলেন। শেষ রাজা গোবিন্দপাল লক্ষ্মণসেনের নিকট পরাজিত হইয়া গৌড়রাজ্য ত্যাগ করেন।

এই পালযুগেই লিপি, ভাষা, ভৌগোলিক সত্ত্বা ও রাষ্ট্রীয় আদর্শকে আশ্রয় করিয়া বাংলাদেশ ও বাঙ্গালী জাতির গোড়াপত্তন হইয়াছে। ধর্ম্মপাল, দেবপাল ও মহীপালের সাম্রাজ্য বিস্তারের ফলে এই রাষ্ট্র একটি আন্তঃর্ভারতীয় রাষ্ট্রের গৌরব ও স্বাদ কিছু দিনের জন্য পাইয়াছিল। এই পাল রাজগণের পৃষ্ঠপোষকতায় ও আনুকূল্যে নালন্দা, বিক্রমশীলা, ওদন্তপুর ও সারনাথের বৌদ্ধসংঘ ও মহাবিহারগুলিকে আশ্রয় করিয়া আন্তঃর্জাতিক বৌদ্ধজগতে বাংলা-দেশ বিশেষ একটি গৌরবময় স্থান ও প্রতিষ্ঠার অধিকারী হইয়াছিল। এই সবের সম্মিলিত ফলে বাংলায় এই যুগে এক সামগ্রিক ঐক্যবোধ গড়িয়া ওঠে। ইহাই বাঙ্গালীর স্বদেশ ও স্বজাতি প্রীতির মূল এবং ইহাই বাঙ্গালীর এক জাতীয়ত্বের ভিত্তি আর ইহাই পালযুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান।

দ্বিতীয় মহীপালের সময়ে বরেন্দ্র বিদ্রোহ হয়। ১০৭২ খৃঃ এই বিদ্রোহের ফলে বরেন্দ্রভূমি পালরাজাদের হস্তচ্যুত হইয়া যায়। কৈবর্ত্তরাজ দিব্য মহীপালের অধীনে রাজকর্মচারী ছিলেন। তিনি যুদ্ধে রাজা মহীপালকে বধ করিয়া বরেন্দ্রভূমিতে এক নূতন রাজ্য

প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি যথেষ্ট শক্তিশালী রাজা ছিলেন। এবং বহিঃশত্রুর হাত হইতে বরেন্দ্রভূমিকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দিব্যের মৃত্যুর পর তাহার ভ্রাতা রুদোক ও তাহার পর রুদোকের পুত্র ভীম বরেন্দ্রভূমির রাজা হন। এই সময়ে মহারাজ রামপাল ভীমকে পরাজিত করিয়া বরেন্দ্রভূমি পুনরুদ্ধার করেন। দিনাজপুরের 'কৈবর্ত্ত্য স্তম্ভ' আজিও দিব্য রাজবংশের স্মৃতি বহন করিতেছে। সান্ধ্যকর নন্দী বিরচিত "রামচরিত কাব্যে" এই বরেন্দ্রবিদ্রোহ ও তাহার পরবর্ত্তী ঘটনা সবিস্তারে বর্ণিত আছে।

একাদশ শতকের শেষ ভাগে যখন পাল রাজশক্তি ক্রমশঃ দুর্বল হইয়া পড়িতেছিল তখন বর্ম উপাধিকারী এক রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। কলিঙ্গের বর্ত্তমান সিঙ্গুপুরমে কলচুরি রাজগণের অধীনে জাতবর্ম নামে এক সামন্ত নরপতি ছিলেন। তিনি কলচুরি রাজের অধীনে অঙ্গ, গৌড় ও বঙ্গে যুদ্ধাভিযান করিয়াছিলেন। এবং এই সুযোগে বঙ্গে নিজেই এক স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। বর্ম রাজগণের আদিম রাজ্য সিংহপুর কোথায় ছিল সে বিষয়ে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন ইহা সিংহলী গ্রন্থে বর্ণিত বিজয় সিংহের পিতা সিংহবাহুর রাজধানী সিংহপুর (প্রাচীনকালে রাঢ়দেশ বর্ত্তমান কালের হুগলী জেলার সিঙ্গুর গ্রাম)। কিন্তু বর্ম রাজগণের রাজধানী ছিল বিক্রমপুর। সামন্তসার গ্রামে প্রাপ্ত তাম্রশাসন হইতে এই বংশের চারিজন রাজার নাম পাওয়া যায়—জাতবর্মা, হরিবর্মা, শ্যামলবর্মা ও ভোজবর্মা। হরিবর্ম্মার প্রধান মন্ত্রী ভবদেব ভট্ট একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বেদ, অর্থশাস্ত্র, গণিত, বেদান্ত ও জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। বাংলার বৈদিক ব্রাহ্মণদের প্রতিষ্ঠার সহিত শ্যামল বর্ম্মার নাম বিশেষ ভাবে জড়িত।

এই বংশ সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু জানা যায় না। দ্বাদশ শতকের প্রথমার্দ্ধে সেনবংশীয় বিজয় সেন এই বংশের উচ্ছেদসাধন করেন।

পালবংশ বাংলাদেশে চারিশত বৎসর রাজত্ব করিবার পর সেনবংশ একশত বৎসর (১১২৫ খৃঃ হইতে ১২২৫ খৃঃ) রাজত্ব করেন। সেন রাজারা হিন্দু ছিলেন।

পালবংশের পতনের কিছু পূর্বে, কর্ণাট হইতে সেন রাজবংশের আদিপুরুষ সামন্তসেন রাঢ়দেশের গঙ্গাতীরে এক ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁহার পুত্র হেমন্ত সেন ও পৌত্র বিজয় সেন বোধ হয় মহারাজ রামপালের অধীন সামন্ত নৃপতি ছিলনে। রামপালের মৃত্যুর পর বিজয় সেন বাংলাদেশের কিয়দংশ অধিকার করিয়া স্বাধীন সেনরাজ বংশ স্থাপন করেন। ইহারা চন্দ্রবংশীয় ও ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয় ছিলেন। বিজয়সেন ক্রমশঃ সমস্ত বঙ্গদেশ অধিকার করিয়া এক সার্বভৌম রাজত্বের স্থাপনা করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর পুত্র বল্লালসেন রাজা হইয়া পিতৃরাজ্য রাঢ়, বাগড়ী, বরেন্দ্র, বঙ্গ ও মিথিলা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া মগধ জয় করিয়াছিলেন এবং যাগ-যজ্ঞ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতেন। বাংলাদেশে তিনিই কৌলিন্য প্রথার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। শাস্ত্র ও শাস্ত্রের সাধনায় জীবন অতিবাহিত করিয়া রাজর্ষিতুল্য বল্লালসেন বৃদ্ধ বয়সে পুত্র লক্ষ্মণসেনের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া সস্ত্রীক ত্রিবেণীর নিকট গঙ্গাতীরে অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করেন।

বল্লালের পর তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণসেন রাজা হন। মুসলমান ঐতিহাসিক মীনহাজ উদ্দীনের গ্রন্থে তাঁহার রাজত্ব সম্বন্ধে অনেক খবর পাওয়া যায়। তিনি মহাপরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন।

পিতৃরাজ্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তিনি কামরূপ, কলিঙ্গ, কাশী ও মগধ জয় করিয়াছিলেন। গৌড়রাজ গোবিন্দ পাল তখন রাজধানী মগধে বাস করিতেন। তাঁহাকে পরাজিত করিয়া তিনি "গৌড়রাজ" উপাধি নিয়াছিলেন। পাল ও সেনরাজগণই ইতিহাসে গৌড়রাজ নামে পরিচিত। তাহার পর নিজ নামে লক্ষ্মণাবতী নামক নগরী স্থাপন করিয়া সেখানেই আপনার রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। মীনহাজ-উদ্দীনের মতে ইনিই আর্য্যাবর্ত্তের রাজগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন। তিনি শাস্ত্র ও ধর্ম্মচর্চ্চায় পিতার উপযুক্ত পুত্র ছিলেন। ষাট বৎসর বয়সে তিনি রাজা হন এবং বিশ বৎসর রাজত্ব করিয়া আশী বৎসর বয়সে তিনি গঙ্গাতীরে নদীয়ায় বাস করিতে আরম্ভ করেন।

সেই সময়ে "কিল্লা-বিহার" লুণ্ঠনকারী দিল্লী সুলতানের অনুগৃহীত এবং বিহারপ্রবাসী বখতিয়ার খিলজী তাঁহাকে বন্দী করিবার জন্য এক ক্ষুদ্র অশ্বারোহী সৈন্যদল নিয়া বিহার হইতে অপ্রত্যাশিত পথে অতি দ্রুতগতিতে আসিয়া অকস্মাৎ ঐ নগরী লুণ্ঠন করিয়া প্রস্থান করে। নদীয়া তখন সেনদের রাজধানী ছিল কিনা অথবা ইহা সুরক্ষিত ছিল কিনা তাহার প্রমাণ নাই। পরে অবশ্য মুসলমানেরা লক্ষ্মণাবতী জয় করিয়া মুসলমান রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। কিন্তু কবে ও কি ভাবে লক্ষ্মণাবতীর পতন হইয়াছিল সে সম্বন্ধে কোন বিবরণ কোথাও পাওয়া যায় নাই। লক্ষ্মণসেন ও তাঁহার বংশধরেরা নদীয়া লুণ্ঠনের পরেও বহু বৎসর বঙ্গে রাজত্ব করিয়াছিলেন। মুসলমানেরা যখন রাঢ় ও বরেন্দ্রে রাজত্ব করিতেন তখন সেনগণ দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার দুই পুত্র বিশ্বরূপ ও কেশব যবনদের সহিত বহু যুদ্ধে জয়ী হইয়াছিলেন।

বখ্‌তিয়ার পরে তিব্বত জয় করিতে গিয়া বিফল হন এবং ফিরিয়া আসিয়া ভগ্ন হৃদয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালের শেষভাগে আভ্যন্তরীণ বিপ্লব দেখা দেয় এবং ঘোরবংশীয় শিহাবউদ্দীন ঘোরীর নেতৃত্বে সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তেই মহাবিপদ আসিয়া উপস্থিত হয়। ঘোরীর হস্তে পৃথ্বীরাজ চৌহান পরাজিত হইবার পর ঘোরী প্রায় সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তেই আপন সাম্রাজ্য বিস্তার করেন। কিন্তু সমসাময়িক কোনও বাঙ্গালী কিম্বা কোনও ভারতীয় লেখক দেশের এই দুর্য্যোগময় সময়ের বৃত্তান্ত লেখেন নাই। তুর্কী কর্তৃক বঙ্গবিজয়—এই ঘটনার অর্দ্ধশতাব্দী পরে লেখা। তুর্কী বিজেতার সভাসদ মীনহাজ-উদ্দীন নামে এক ঐতিহাসিক লোকমুখে এই কাহিনী শুনিয়া ইতিহাস রচনা করিয়াছেন। এই ইতিহাসের প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ না করিয়া কেহ কেহ তাহার বিকৃত ব্যাখ্যা প্রচার করিয়াছেন যে বখ্‌তিয়ার কেবলমাত্র সতের জন অশ্বারোহী সৈন্য নিয়া "বঙ্গবিজয়" করিয়াছিলেন। এবং এই কাহিনী বিশ্বাস করিয়া লোকে লক্ষ্মণসেনকে কাপুরুষ ও সেযুগের বাঙ্গালী জাতিকে দুর্ব্বল বলিয়া হতশ্রদ্ধা করিয়া আসিতেছে। ঘটনাটি ঘটিয়াছিল ঠিকই। তুর্কীগণ ১২১২ খৃষ্টাব্দে বা নিকটবর্ত্তী কোন সময়ে বঙ্গবিজয় করে। কিন্তু নদীয়া লুণ্ঠনই বঙ্গবিজয় নহে। ঘটনাটি বিকৃত ভাবে বর্ণিত হওয়ায় ভিন্ন রূপ নিয়াছে।

সতের জন অশ্বারোহী কোন রাজ্য জয় করিতে পারে না। ইহা অত্যন্ত অবিশ্বাস্য কাহিনী। তবে প্রশ্ন উঠিতে পারে, এতই যদি অবিশ্বাস্য তবে তখন প্রতিবাদ হয় নাই কেন? তাহারও কারণ আছে। প্রথমতঃ তখনকার দিনে প্রচার বলিয়া কিছুই ছিল না। কে কোথায় গ্রন্থ রচনা করিল, লোকের পক্ষে তাহা জানা তখন সম্ভব

ছিল না। তাই এই অবিশ্বাস্য কাহিনী যে রচিত হইয়াছে লোকে তাহা জানিতেই পারে নাই। যখন জানিতে পারিল তখন হয়তো ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী কেহই বাঁচিয়া ছিলেন না। দ্বিতীয়তঃ আজকাল প্রচলিত হইয়াছে, ইতিহাস সব সময় সত্যকথা বলে না। এক-দেশদর্শিতার জন্য একই ঘটনা বিভিন্ন জনে বিভিন্ন ভাবে বর্ণিত করে। মুসলমান ঐতিহাসিক মুসলমান শক্তি কর্ত্তৃক দেশবিজয়ের কথা অতিরঞ্জিত করিয়া লিখিবেন ইহা আর আশ্চর্য্য কি? মীনহাজ-উদ্দীন তাই মুসলমান বখ্‌তিয়ারের ও তাহার মুসলমান সঙ্গীদের বীর্য্যবত্তা উত্তমরূপে প্রস্ফুটিত করিতে গিয়া হিন্দুগণকে কাপুরুষ বানাইয়াছেন। ইতিহাস বিকৃত হইয়াছে। তৃতীয়তঃ হিন্দুরা তারপর মুসলমানদের অধীনে ছিল। গ্রন্থের বিবরণ জানিতে পারিলেও তাহার প্রতিবাদ করিবার সাহস বা সুযোগ তাহাদের হয় নাই। পরে পাঁচশত বৎসর ধরিয়া একই কাহিনী শুনিতে শুনিতে এই কাহিনী লোকে বিশ্বাস করিতে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল।

মীনহাজ-উদ্দীন লোকমুখে এই বিবরণ শুনিয়া তাঁহার তবাকৎ-ই-নাসিরী গ্রন্থে বঙ্গ বিজয়ের এই কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ঘটনার পঞ্চাশৎ বৎসর পরে তিনি এই ঘটনা শুনিয়া-ছিলেন কিন্তু গৌড় বিজয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল এমন কোন ব্যক্তির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই। তাঁহার বিবরণীতে জানা যায় বখ্‌তিয়ার খিলজী দিল্লী সুলতানের বেতনভুক্ কর্ম্মচারী ছিলেন না। তিনি ছিলেন তুরস্ক বংশীয় একজন সেনানায়ক। অযোধ্যার নবাবের কাছে চুনার দুর্গের নিকট কিছু জায়গীর পাইয়া বিহারে লুটপাট করিতেছিলেন। এই দস্যুবৃত্তিতে লব্ধ অর্থাদি উপঢৌকন দিয়া দিল্লীশ্বরের অনুগ্রহভাজন হইয়া ওঠেন। যে কারণে "বিহার

প্রদেশ” অদ্যাবধি বিহার বলিয়া পরিচিত, সেই ‘ওদন্তিপুরী বিহার’ বখতিয়ার কেল্লা মনে করিয়া লুঠ করিয়াছিলেন।

এই সময়ে রাজা লক্ষ্মণসেন বিশ বৎসর রাজত্ব করিয়া আশী বৎসর বয়সে নদীয়ায় গঙ্গাতীরে বাস করিতেছিলেন। নবদ্বীপ তাঁহার রাজধানী ছিল না। রাজধানী ছিল লক্ষ্মণাবতীতে—বিক্রমপুরের গঙ্গাতীরে অবস্থিত বিজয়নগরে। এই বিজয়নগরকে অনেকে নবদ্বীপ হইতে অভিন্ন করিয়া ভুল করিয়াছেন। কিন্তু বিজয়নগর ছিল বর্ত্তমান রাজসাহীর বিজয়নগর গ্রাম। এই নবদ্বীপ তখন সম্পূর্ণ অরক্ষিত ছিল। বিহারে লুণ্ঠনরত বখতিয়ার এই খবর পাইয়া একদল সৈন্য লইয়া অতিদ্রুত নদীয়ায় আসিয়া উপস্থিত হয়। বখতিয়ার জানিতে পারিয়াছিল বৃদ্ধ রাজা লক্ষ্মণসেন নিতান্ত অরক্ষিত অবস্থাতে নদীয়ায় অবস্থান করিতেছেন। বখতিয়ার এরূপ দ্রুতগতিতে আসিয়াছিল যে, সে যখন আসিয়া পৌঁছিল তখন তাহার সহিত মাত্র ১৭ জন অশ্বারোহী ছিল। তাহার সেনাবাহিনী পশ্চাতে আসিতেছিল। নগরে রখতিয়ার ধীরে সুস্থে প্রবেশ করিল। লোকে মনে করিল বিদেশী অশ্বারোহী, অশ্ব বিক্রয় করিতে আসিয়াছে। এরূপ অশ্ব-ব্যবসায়ী তখন দুর্লভ ছিল না। যখন বখতিয়ার প্রাসাদ দ্বারে উপস্থিত হইল তখন বৃদ্ধ রাজা মধ্যাহ্ন ভোজনে বসিয়াছেন। বখতিয়ার অকস্মাৎ সদলবলে রাজ-অনুচরদিগকে হত্যা করিতে লাগিল। রাজা নগ্নপদে প্রাসাদের পশ্চাতের দ্বার দিয়া নৌকাযোগে পলায়ন করিলেন। ইতিমধ্যে বখতিয়ারের সমুদয় সৈন্য নগরে উপস্থিত হইয়া লুটপাট করিয়া নগর ধ্বংস করিল। নগরের চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থানও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল। দলে ভারি একটি দস্যুদলের পক্ষে একটি তীর্থস্থান, অরক্ষিত অবস্থায় আক্রমণ করিয়া লুণ্ঠন ও

ধ্বংস করা কিছু কঠিন কার্য্য নহে। মীনহাজ-উদ্দীন স্বীকার করিয়াছেন, বখতিয়ার কেবল নদীয়া ধ্বংস করিয়াছিল। এখানে বসতি করে নাই। সে এই নগরী ধ্বংসের পর আবার বিহারে ফিরিয়া যায়। গৌড়রাজ পরে আবার নদীয়া অধিকার করেন। এই আক্রমণে শুধু নদীয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল, দেশের অন্যান্য অংশের কোন ক্ষতি হয় নাই। যে প্রকারেই হউক, নদীয়ার এই ঘটনা, একটি সাধারণ লুণ্ঠনের ঘটনাই, ইহাতে কল্পনার রাশ সম্পূর্ণ আলগা করিয়া দিলেও কোন প্রকারেই "বঙ্গবিজয়" বলা চলে না। সুতরাং বখতিয়ার সতের জন অশ্বারোহী নিয়া বঙ্গবিজয় করিয়াছিল, মীনহাজের এই উক্তি সর্ব্বৈব মিথ্যা, ইতিহাস হইতে মুছিয়া ফেলা উচিত। বখতিয়ার পরে অবশ্যই লক্ষ্মণাবতী জয় করিয়াছিল। কিন্তু সে কবে ও কি ভাবে, নদীয়া লুণ্ঠনের কত দিন পরে, তাহা মীনহাজ অথবা কোন সমসাময়িক ঐতিহাসিক লেখেন নাই।

রাজা লক্ষ্মণসেন যে কাপুরুষ ছিলেন না বা বাঙ্গালী জাতিও যে সে যুগে দুর্ব্বল ছিল না তাহার বহু প্রমাণ ইতিহাসেই আছে। লক্ষ্মণসেন যে প্রবল পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন তাহা তাঁহার পুত্র কেশব ও বিশ্বরূপ সেনের তাম্রশাসনে এবং মীনহাজ উদ্দীনের তবাকৎ-ই-নাসিরী গ্রন্থেও উল্লিখিত আছে। মীনহাজ-উদ্দীনের উক্তির উপর নির্ভর করিয়া লক্ষ্মণসেনকে যাঁহারা কাপুরুষ বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন তাঁহারা ভুলিয়া যান যে মীনহাজ স্বয়ং বলিয়াছেন যে লক্ষণসেনই আর্য্যাবর্ত্তের রাজাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান রাজা ছিলেন। কিন্তু জয়চাঁদ বা পৃথ্বীরাজ সম্বন্ধে মীনহাজ কোন কিছুই লেখেন নাই। রাজা লক্ষ্মণসেনের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া মীনহাজ তাঁহার দানশীলতার সুখ্যাতি ও শাসনপ্রণালীর প্রশংসা

করিয়াছেন। ইহা ছাড়া তিনি গোবিন্দ পালকে পরাজিত করিয়া মগধ অধিকার করিয়াছিলেন। কলিঙ্গ জয় করিয়া সেখানে জয়স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন। প্রাগজ্যোতিষপুরও তাঁহার পদানত হইয়াছিল। কাশী ও প্রয়াগ জয় করিয়া সেখানেও জয়স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন। এবং এই জয়স্তম্ভ তাঁহার গাহড়বাল রাজার বিরুদ্ধে অভিযান সূচিত করে। মগধের মধ্যভাগ জয় করিয়া তিনি গয়াতে বিজয়স্তম্ভ বসাইয়াছিলেন। এইরূপে দেখা যায় যে উত্তরে গৌড়, পূর্ব্বে কামরূপ ও দক্ষিণে কলিঙ্গ জয় করিয়া তিনি এক বিরাট সাম্রাজ্যের অধিকারী হইয়াছিলেন। পশ্চিমে মগধে রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন ও চেদীরাজকেও যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন। ধর্মপাল ও দেবপালের পর বাংলার আর কোন রাজা আপন সীমানার বাহিরে এত সাফল্য অর্জন করেন নাই। এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া লক্ষ্মণসেনের চরিত্র ও পৌরুষ সম্বন্ধে উচ্চ ধারণাই হয়। তাঁহাকে কাপুরুষ কিছুতেই বলা চলে না।

বাঙ্গালী দুর্বল ছিল কিনা জানিতে হইলে 'গঙ্গারিডই' রাজ্যের কথা ভাবিতে হইবে, যাহাদের ভয়ে আলেকজাণ্ডার পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে সাহস পান নাই। আর ভাবিতে হইবে রাজা শশাংকের কথা—ধর্মপাল, দেবপাল ও মহীপালের কথা, বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেনের কথা, যাঁহারা বাঙ্গালী সৈন্যের সাহায্যে উত্তর ভারতে সার্বভৌম সাম্রাজ্য গঠন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই সঙ্গে স্মরণ রাখিতে হইবে যে গঙ্গারিডই রাজ্যে ছয়শত বৎসর এবং পালবংশ চারিশত বৎসর আপন আপন সত্ত্বা বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল, ইহা বিশ্ব-ইতিহাসেও বিরল ঘটনা।

নদীয়া লুণ্ঠনের কথা বিশদভাবে আলোচনা করিলাম এইজন্য যে, এই ঘটনা বাঙ্গালীর চরিত্রে অন্যায় ভাবে কলঙ্ক লেপন করিয়াছে। এখন এই বিকৃত ইতিহাসের প্রতিবাদ করিয়া ইতিহাস সঠিক ভাবে লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন।

১২০২ খৃঃ নদীয়া লুণ্ঠনের পর লক্ষ্মণসেন তাঁহার রাজধানীতে ফিরিয়া যান। তাঁহার পর তিনি আরও চার বৎসর বাঁচিয়া ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার দুই পুত্র বিশ্বরূপ সেন ও কেশব সেন মোট পঁচিশ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহাদের রাজত্ব ছিল পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বঙ্গে। তুর্কীরাজ্য গঙ্গার দুই তীরে রাঢ় ও বরেন্দ্রভূমে সীমাবদ্ধ ছিল। পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বঙ্গ অধিকার করিতে তাহাদের বহুদিন লাগিয়াছিল। এই দুই ভাইয়ের পর সেনবংশে আর কোন উল্লেখযোগ্য রাজার নাম পাওয়া যায় না।

সেন-রাজবংশ পতনের পরেও বাংলাদেশে আরও দুইটি রাজ্যের কথা শুনা যায়। প্রথম, দেববংশ। মেঘনার পূর্ব্বতীরে মধুমথন দেব তৎপুত্র বাসুদেব ও তাহার পৌত্র দামোদর দেব, এই তিনজন রাজা এই বংশোদ্ভূত ছিলেন। ঢাকা জিলার আদাবাড়ী নামক স্থানে প্রাপ্ত তাম্রশাসনে আরও এক দেব নামক রাজার নাম পাওয়া যায়। রাজা দনুজ-মাধব দশরথদেব। বোধ হয় ইনিই সুবর্ণ গ্রামের রাজা "দনুজ রায়"। দনুজ রায় বিক্রমপুর রামপাল হইতে রাজধানী সুবর্ণগ্রামে স্থানান্তরিত করেন।

বর্ত্তমান কুমিল্লা জেলায় পট্টীকেরা রাজ্য অবস্থিত ছিল। পট্টীকেরা রাজধানীর ভগ্নাবশেষ লালমাই বা ময়নামতীর পাহাড়ে পাওয়া গিয়াছে। একাদশ ও দ্বাদশ শতকে ইহা একটি বিখ্যাত রাজ্য ছিল এবং নিকটবর্ত্তী ব্রহ্মদেশের সহিত ইহার রাজনৈতিক

সম্বন্ধ ছিল। এই রাজ্যের রাণী ময়নামতী তাঁহার পুত্র রাজা গোপীচাঁদকে অবলম্বন করিয়া সেই যুগে বিখ্যাত চর্য্যাপদ "ময়নামতীর গান" রচনা করা হইয়াছিল। রাজা গোপীচাঁদ নাথসম্প্রায়ভুক্ত ছিলেন এবং গোরক্ষনাথের শিষ্য জালন্ধরীপাদের শিষ্য ছিলেন। সংক্ষেপে ইহাই বাংলার রাজবৃত্তের ইতিহাস।

(ঘ) প্রাচীন বাংলার কথা—ধর্ম্ম-সাহিত্য-সমাজ-কৃষ্টি

বাংলায় আর্য্যধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে যাঁহারা বাংলায় বাস করিতেন তাঁহাদের ধর্ম্মমত কি ছিল তাহা জানিবার উপায় নাই। কারণ ঐতিহাসিক যুগে দেখা যায় যে প্রায় সকলে ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ বা জৈন প্রভৃতি আর্য্যধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহাদের প্রাচীন ধর্ম্মমত, পূজাপদ্ধতি রূপান্তরিত হইয়া আর্য্যধর্ম্মের সহিত মিশ্রিত হইয়া গিয়াছিল। গুপ্তযুগের পূর্বে বাংলার ধর্ম্মমত সম্বন্ধে পরিষ্কার ভাবে কিছু জানিবার উপায় নাই।

গুপ্তযুগের তাম্রশাসন হইতে প্রমাণিত হয় যে বৈদিক যাগ-যজ্ঞাদি ক্রিয়া বাংলায় বহু পরিমাণে অনুষ্ঠিত হইত। পালযুগের তাম্রশাসনে বেদ, বেদাঙ্গ, মীমাংসা প্রভৃতি শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি ও যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠানে অভিজাত ব্রাহ্মণ বংশের বহু উল্লেখ পাওয়া যায়। বর্ম্ম ও সেন রাজাগণের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলায় বৈদিক ধর্ম্ম আরও প্রসার লাভ করে।

গুপ্তযুগে বাংলায় পৌরাণিক ধর্ম্মেরও যথেষ্ট প্রচার ছিল। দেবতারা ইন্দ্র বা পুরন্দর, দৈত্যরাজ বলির হস্তে তাঁহার পরাজয়, বিষ্ণু, লক্ষ্মী তাঁহাদের বাহন গরুড়, বিষ্ণুর নাভিকমল হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি, সত্যযুগে বলি ও দ্বাপরে কর্ণের দানশীলতা, অগস্ত্য কর্ত্তৃক

সমুদ্র পান, পরশুরামের একুশ বার ক্ষত্রিয় বংশ ধ্বংস, রামচন্দ্রের বীরত্ব। পৃথু, সগর, নল ও যযাতি অম্বারীশের উপাখ্যান—ইহাদের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ এই সব তাম্রশাসনে আছে। বাংলায় বৈষ্ণব ও শৈব ধর্ম্মেরও খুব প্রসার ছিল। ভাগবত সম্প্রদায়ের উপাস্য বিষ্ণু এখানে কৃষ্ণে রূপান্তরিত হইয়াছিলেন। কৃষ্ণের জন্ম, বাল্যলীলা, গোপীদিগের সহিত তাঁহার ক্রীড়া এবং তিনি যে বিষ্ণুর অবতার—ইহারও উল্লেখ তাম্রশাসনে পাওয়া যায়। শিবের শক্তি সর্বানী, উমা বা সতী, দক্ষযজ্ঞে সতীর দেহত্যাগ, দুই পুত্র কার্ত্তিক, গণেশ—এই সমস্তেরও উল্লেখ আছে। রাজা বিজয়সেন ও বল্লালসেন শৈব ছিলেন। কিন্তু লক্ষ্মণসেন ও তাঁহার বংশধরগণ বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহার সভাকবি জয়দেব বর্ণিত দশাবতারবাদ ও রাধাকৃষ্ণ লীলা প্রথম বাংলাদেশেই প্রচারিত হয় এবং পরে সমগ্র ভারত ইহা গ্রহণ করে।

প্রাচীনকাল হইতেই বাংলায় শক্তি পূজার প্রচলন হইয়াছিল। রাঢ় ও বরেন্দ্র বামাচারী, শাক্ত সম্প্রদায় বিভিন্নরূপে দেবীকে পূজা করিতেন। বিষ্ণু, শিব ও শক্তি ব্যতীত অন্যান্য পৌরাণিক দেব-দেবীর পূজাও বাংলায় প্রচলিত ছিল। পুণ্ড্রবর্দ্ধনে কার্ত্তিকেয়র পূজা হইত। বৈদেশিক দেবদেবী যেমন, চন্দ্র, মিহির ও অথবা সূর্য্য পূজাও প্রচলিত ছিল।

জৈনধর্ম্ম :—

বাংলাদেশ এক সময়ে বৌদ্ধধর্মের বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছিল। বৌদ্ধধর্মের প্রাবল্য ছিল অষ্টম হইতে দ্বাদশ শতক পর্য্যন্ত। কিন্তু তাহারও পূর্বে জৈনধর্ম এখানে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল।

এই প্রাধান্য ছিল পুণ্ড্র বর্দ্ধনে। জৈনধর্ম্মের ধারা তাই অতি প্রাচীন। অনেকে মনে করেন এই ধারা বেদ হইতেও প্রাচীন। ইহাদের পূর্বে "নিগ্রন্থী" বলা হইত। "নিগ্রন্থী" অর্থাৎ গ্রন্থীহীন বা বন্ধনহীন। ধর্ম্ম অতি প্রাচীন হইলেও মুখে মুখেই ইহা চলিয়া আসিতেছে। অনেকের মতে, বৌদ্ধশাস্ত্র লিপিবদ্ধ হইবার পরই ইহা লিপিবদ্ধ হয়। এই নিগ্রন্থীদের ধর্মগুরুদের বলা হইত 'তীর্থঙ্কর'। মোট চারিশত তীর্থঙ্কর ছিলেন। প্রথম হইলেন ঋষভদেব। ত্রয়োবিংশতিতম তীর্থঙ্কর হইলেন পার্শ্বনাথ। তিনিই জৈনধর্মের সূত্রগুলি একত্র করেন। জৈনতীর্থ পরেশনাথ জৈন নাম সমেতগিরি বা সমেতপর্ব্বত। এখন পার্শ্বনাথের নামে সমেতগিরি পার্শ্বনাথ পর্বত নামে পরিচিত। জৈনদের শেষ তীর্থঙ্কর 'মহাবীর'।

বাংলাদের পাশে হিমালয়ের পাদদেশে কপিলবাস্তুর শাক্য-বংশে গৌতমবুদ্ধ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারই পাশে বৈশালীর লিচ্ছবী বংশে মহাবীরের জন্ম। অনেকে মনে করেন এই দুইজন সমসাময়িক ছিলেন। নিগ্রন্থী সম্প্রদায়ের শিক্ষাকে যুগোপযোগী করিয়া মহাবীর জৈনধর্মকে ইহার বর্ত্তমান রূপ দেন। তাঁহাকে সকলে "জিন" বা "জয়ী" বলিত। এই নাম হইতে তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্মের এই নবরূপকে "জৈনধর্ম" নাম দেওয়া হইল।

মহাবীরের নির্বাণকাল ৫০৫ খৃঃ পূর্ব। পার্শ্বনাথ তাঁহার ২৫০ বৎসর পূর্বে জন্মিয়াছিলেন। পূর্ববর্ত্তী তীর্থঙ্করেরা আরও অনেক প্রাচীন। তীর্থঙ্করের অর্থ পথপ্রদর্শক। মহাবীরের তিন শিষ্য ছিল, তাঁহাদের বলা হইত "কেবলী" অর্থাৎ পূর্ণজ্ঞানী। তাঁহাদের পরে ক্রমানুসারে পাঁচজন শিষ্যকে বলা হইত "শ্রুতকেবলী"। এই

শ্রুতকেবলীদের মধ্যে শেষজন হইলেন ভদ্রবাহু। তিনিই সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের গুরু। চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বের শেষ সময়ে উত্তর ভারতে দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এই দুর্ভিক্ষের সূচনায় ভদ্রবাহু চন্দ্রগুপ্ত সহ তাঁহার বারো হাজার শিষ্য নিয়া দক্ষিণ ভারতে যাত্রা করেন ও কর্ণাটের নিকট শ্রবণবেলগোলা নামক তীর্থে আসিয়া নির্বাণ লাভ করেন। গৃহীত ভিক্ষুব্রতী সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত তখন তাঁহার সেবার জন্য তাঁহার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন। তখন চন্দ্রগুপ্তের নাম ছিল প্রভাচন্দ্র। চন্দ্রগিরিতে ভদ্রবাহুর সমাধি এখনও আছে। ভদ্রবাহুর মৃত্যুর পর তদীয় শিষ্যেরা বিশাখাচার্য্যের সহিত চোলদেশে চলিয়া গেলেন। চন্দ্রগুপ্তও এই শ্রবণবেলগোলা তীর্থেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। শ্রবণবেলগোলা বর্ত্তমান মহীশূর রাজ্যে।

ভদ্রবাহু সংঘের অর্দ্ধাংশ নিয়া দক্ষিণে চলিয়া গিয়াছিলেন কিন্তু বাকি অর্দ্ধাংশ আচার্য্য স্থূলভদ্রের অধীনে মগধেই রহিয়া গেলেন। দুর্ভিক্ষকালে ভিক্ষা সংগ্রহের জন্য নানাদিকে বাহির হইতে বাধ্য হইয়া ভিক্ষুগণ বস্ত্রাদি পরিধান করিলেন এবং আরো কিছু নিয়ম শিখিতে হইল। দুর্ভিক্ষের পরেও পূর্ব্ব নিয়ম পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা গেল না। ইহার ফলে জৈনদের মধ্যে দুই বিভাগ হইল। যাঁহারা ভদ্রবাহুর অধীনে গিয়াছিলেন তাঁহারা বস্ত্রাদি পরিতেন না, তাঁহারা হইলেন দিগম্বর এবং যাঁহারা স্থূলভদ্রের অধীনে রহিলেন তাঁহারা দুর্ভিক্ষের পরও শ্বেতবস্ত্র ত্যাগ করিলেন না তাঁহাদের বলা হইত শ্বেতাম্বর। পরে অবশ্য এই দুই জৈন সম্প্রদায়ের মধ্যে মতেরও অনেক অমিল হইয়াছিল। পার্শ্বনাথের সম্প্রদায় সাধারণতঃ শ্বেতাম্বর এবং মহাবীরের সম্প্রদায় দিগম্বর। বাংলাদেশে দিগম্বর সম্প্রদায়েরই প্রতিষ্ঠা বেশী ছিল।

জৈনাচার্য্যদের মতে এক ভদ্রবাহুই বিস্মৃত সমস্ত পর্ব জানিতেন। অর্থাৎ জৈনদের ধর্ম্মশাস্ত্রের অঙ্গ ভদ্রবাহু—সংহিতা জৈনদের প্রখ্যাত ধর্ম্মশাস্ত্র। তাঁহার রচিত "কল্পসূত্র"ও একটি প্রধান জৈনধর্ম্ম গ্রন্থ। ইহা অনেকটা বৌদ্ধ বিনয়পিটকের অনুরূপ। ইহা অতি শ্রদ্ধার সহিত পঠিত ও শ্রুত হয়।

ভদ্রবাহু সম্বন্ধে আমাদের এই কৌতূহলের প্রধান কারণ তিনি বাঙ্গালী ছিলেন। পুণ্ড্র বর্দ্ধনের কোটিবর্ষ বিষয়ে তাঁহার জন্ম। পুণ্ড্র রাজ পদ্মধরের পুরোহিত সোমশর্ম্মা তাঁহার পিতা ও তদীয় পত্নী সোমশ্রী তাঁহার মাতা। ভদ্রবাহু বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাহার প্রতিটিই জৈনদের ধর্মগ্রন্থ। তাঁহার নির্ব্বাণ লাভের তাঁহার বিষয়ে অনেক পুস্তক লিখিত হইয়াছে। রত্ননন্দী প্রণীত "ভদ্রবাহু চরিত" এইগুলির মধ্যে অন্যতম। ভদ্রবাহুর চারজন প্রধান শিষ্যের মধ্যে গোদামগমী একজনের নাম। গোদামগমীর শিষ্যদের মধ্যে চারিটি শাখার উল্লেখ আছে—তাম্রলিপ্তিরা, কোটি-বর্ষিয়া, পৌণ্ড্র বর্দ্ধনীরা ও দাসীখর্বতীয়া। প্রথম তিনটি বাংলার সুপ্রাচীন ও সুপরীচিত নগরী হইতে উদ্ভূত। সুতরাং বাংলায় যে খুব প্রাচীন কাল হইতেই জৈনধর্ম প্রসার লাভ করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। পুরাতন বাংলা লিপির আকার ও প্রকারের সহিত পুরাতন জৈনলিপির অনেক মিল দেখা যায়। তাই বলা যায় যে জৈনদের সঙ্গে গৌড় ও বঙ্গের ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। আর একটি বড় প্রমাণ হইল পূর্ববঙ্গে জৈনদের স্বতন্ত্র ব্যাকরণের (কলাপ ব্যাকরণ) এত বহুল প্রচার। ক্রমশঃ সপ্তম শতকে বাংলার বৌদ্ধধর্ম প্রবল হইয়া উঠিল এবং জৈনধর্ম ক্ষীণ হইয়া পড়িল।

জৈনধর্মের কথা বিস্তারিত ভাবে সন্নিবিষ্ট হইল কারণ তাহাদের শ্রেষ্ঠ শ্রুতকেবলী ভদ্রবাহুর কথা বাঙ্গালী হইয়াও আমরা বিশেষ কিছু জানি না। কিন্তু আমি মনে করি এই সব মহান বাঙ্গালীদের কথা আমাদের সম্যক্ জানা উচিত।

পুণ্ড্রবর্দ্ধনের রাজধানী ছিল কোটিবর্ষ নগরীতে। ইহা বাংলার একটি সমৃদ্ধ জনপদ ছিল। হিন্দু ও জৈনদের নিকট ইহা একটি মহাতীর্থ রূপে পরিগণিত হইত। বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন নামে কোটিবর্ষ অভিহিত হইয়াছে—যেমন দেওকোট, বার্ণপুর, উসাবন প্রভৃতি। ইহা বর্ত্তমান দিনাজপুর জেলার বাণগড় নামক স্থান। এই স্থানে শ্রুতকেবলী ভদ্রবাহু জন্মিয়াছিলেন।

বাংলাদেশে যে এক সময়ে বৌদ্ধধর্মের বন্যা আসিয়াছিল তাহা সকলেরই জানা। সম্রাট অশোকের সময়ে এই ধর্ম বাংলায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। তবে তাহার পূর্বেও বোধ হয় বাংলায় বৌদ্ধধর্মের কিছু প্রচার ছিল। কিন্তু খৃস্টীয় তৃতীয় শতক অবধি বাংলাদেশ বৌদ্ধধর্মের একটি প্রধান কেন্দ্র হইয়া দাঁড়ায়। পঞ্চম শতকে বাংলার সর্ব্বত্রই বৌদ্ধধর্ম বিস্তৃত হয়। সপ্তম শতকে ইহার প্রভাব খুব বাড়িয়া যায়। রাজমহলের নিকট কজঙ্গলে ছয় সাতটি বিহারে প্রায় তিনশত ভিক্ষু বাস করিতেন। পুণ্ড্রবর্দ্ধনে সমতটের রাজধানী কর্মান্তে, তাম্রলিপিতে, কর্ণসুবর্ণে বহু বৌদ্ধবিহার ছিল এবং সেখানে অনেক বৌদ্ধভিক্ষু বাস করিতেন। সপ্তম শতকে একজন বাঙ্গালী ভিক্ষু বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম শীলভদ্র। সমতটের রাজবংশে তাঁহার জন্ম (বর্ত্তমান সাভারে) এবং তিনি

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রধান আচার্য্য ছিলেন। আরো দুইজন বাঙ্গালী ভিক্ষু—চন্দ্রগোমিম ও শান্তরক্ষিত নালন্দার আচার্য্যপদ লাভ করিয়াছিলেন। অষ্টম শতকে পালরাজগণের অভ্যুদয়ের সাথে সাথে বাংলায় বৌদ্ধধর্ম খুব প্রাধান্য লাভ করে। এই সময় হইতেই ভারতের অন্যান্য প্রদেশে বৌদ্ধধর্ম ক্রমশঃ ক্ষীণবল হইয়া পড়িতে-ছিল। এবং আর দুই-একশত বৎসরেই প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। পাল রাজগণের রাজত্বকালে বাংলা ও বিহারে বৌদ্ধধর্ম প্রবল ছিল। কিন্তু দ্বাদশ শতাব্দীতে মুসলমান আক্রমণের সাথে সাথে বৌদ্ধধর্ম ভারত হইতে বিলুপ্ত হইয়া নেপাল ও তিব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করে। পাল রাজগণের সহায়তায় অষ্টম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে বৌদ্ধ-ধর্ম উত্তরে তিব্বত ও যবদ্বীপ, সুমাত্রা, মালয় প্রভৃতি দক্ষিণ-পূর্ব দ্বীপ ও দেশে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। বৌদ্ধধর্মের শেষ রক্ষক বলিয়া পালরাজগণ বৌদ্ধজগতে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিয়া-ছিলেন। ধর্মপাল বহু বিহার নির্মাণ করাইয়াছিলেন, যেমন মগধে বিক্রমশীলা বিহার, বরেন্দ্রভূমে সোমপুর বিহার ও বিহারে ওদন্তপুর বিহার। নালন্দার ন্যায় বিক্রমশীলা বিহারও বৌদ্ধজগতে বিখ্যাত ছিল। ইহার আচার্য্য ছিলেন দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ। রাজা নয়পাল তাঁহাকে এই প্রধান আচার্য্যপদে নিযুক্ত করেন। অভয়ঙ্কর গুপ্তও এই বিহারে প্রধান আচার্য্য হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে ইনি ছিলেন ওদন্তপুরী বিহারের প্রধান আচার্য্য।

সহজিয়া :—

প্রাচীনকাল হইতেই বৌদ্ধধর্মে বহু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। হীনযান বৌদ্ধধর্ম অপেক্ষা মহাযান বৌদ্ধধর্ম ভিন্নতর। পালযুগে

বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের ভিন্ন ভিন্ন শাখা আত্মপ্রকাশ করে। যেমন বজ্রযান, তন্ত্রযান, সহজযান প্রভৃতি। এগুলিকে সহজিয়া ধর্ম বলা যাইতে পারে। এই ধর্মের আচার্য্যগণ সিদ্ধাচার্য্য নামে খ্যাত। এই ধর্মে গুরুর স্থান বুদ্ধেরও উপর ছিল। ধর্মোপদেশ গুরুর মুখ হইতে শুনিতে হইবে, পুস্তক পড়িয়া কিছু হইবে না। গুরু বুদ্ধ অপেক্ষাও মহৎ, তিনি যাহা বলিবেন, তৎক্ষণাৎ তাহা করিতে হইবে। এই গুরুবাদই এই ধর্মের মূলনীতি। যে ধর্মে কেবল গুরুর বচনই প্রামাণিক সেখানে অনেক তথ্যই গোপন ও রহস্যাবৃত থাকে। চরম গুরুবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত ও গোপন রহস্যে আবৃত থাকায় এই ধর্ম ক্রমশঃ অধঃপতনের পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। ক্রমে এই সহজিয়া ও তান্ত্রিক ধর্ম্ম একাকার হইয়া বাংলায় আধ্যাত্মিক জগতে এক বীভৎস ব্যাভিচারের সৃষ্টি করিয়াছিল। পরে বাংলার শাক্ত-ধর্ম্মের এক অংশও এই সহজিয়া মতের সহিত মিলিত হইয়া গেল। ফলে নানা প্রকার শাক্ত সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হইল, নাথপন্থী, অবধূত, বাউল ইত্যাদি।

বাঙ্গালীর ধর্ম্ম সম্বন্ধে সর্ব যুগেই উদারপন্থী বৈদিক, পৌরাণিক, ব্রাহ্মণ্য, শৈব, বৌদ্ধ, জৈন, বৈষ্ণব, সহজিয়া—প্রতি ধর্ম্মই সমভাবে সম্মানিত হইত। এই উদারতা আজও আছে। নিষ্ঠাবান বাঙ্গালী হিন্দু সমভাবেই শিবপূজা, বিষ্ণুপূজা, নারায়ণশিলা পূজা ও দুর্গাপূজা করে।

প্রাচীনকালে ধর্ম্মদ্বেষের কেবল একটিমাত্র কাহিনী শোনা যায়। গৌড়েশ্বর শশাঙ্ক গয়ার বোধিবৃক্ষ নাকি সমূলে উৎপাটিত করেন এবং পাটলীপুত্রে বুদ্ধের চরণচিহ্ন-অঙ্কিত একখানি প্রস্তর গঙ্গায় নিক্ষেপ করেন। এ ছাড়া কুশীনগরে এক বিহার হইতে

বৌদ্ধদের বিতাড়িত করেন। তবে এই সব কাহিনীর ঐতিহাসিক সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। কারণ এই সব কাহিনীর বিবরণ আমরা পাই শশাঙ্কের প্রতিদ্বন্দ্বী কনৌজের রাজা হর্ষবৰ্দ্ধনের সভাকবি বাণভট্টের রচনায়।

সাহিত্য ও ভাষা :—

আৰ্য্যগণ বাংলায় আসিবার পূর্ব্বে বাঙ্গালী যে ভাষা ব্যবহার করিতেন তাহার কোন নিদর্শন বর্ত্তমান নাই। তবে আর্য্যগণের আগমনের পরে ইহারা সম্পূর্ণরূপে আর্য্যভাষাই গ্রহণ করিলেন। তখন সর্ব্বপ্রথম যে ভাষা ইহারা ব্যবহার করিতেন, কালক্রমে তাহার বহু পরিবর্ত্তন আসিয়াছিল। নিম্নলিখিত শ্রেণীবিভাগ হইতে এই পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে কিছু ধারণা হইতে পারে :

(ক) প্রাচীন সংস্কৃত : ঋগ্বেদের সময় হইতে ৬০০ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত।

(খ) পালি, প্রাকৃত ইত্যাদি অপভ্রংশ : ৬০০ খৃঃ পূঃ হইতে ১০০০ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত।

(গ) অপভ্রংশ হইতে নানা দেশীয় ভাষার উৎপত্তি : ১০০০ ও তাহার পর হইতে।

প্রথমে আর্য্যগণ প্রাচীন সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করিতেন। পরে ইহা হইতে পালি, প্রাকৃত ও অপভ্রংশ, এই তিন ভাষার উৎপত্তি হয়। বাংলাদেশেও এই সব ভাষা ছিল, তবে এই ভাষায় কোন সাহিত্য রচনা হইয়াছিল কিনা তাহার নিদর্শন নাই। হিন্দু-যুগে ১০০০ খৃঃ পর্য্যন্ত সংস্কৃত ভাষাতেই সাহিত্য রচনা হইয়াছিল।

তাহার পর অপভ্রংশ হইতে বাংলার দেশীয় ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে এবং কালে এই ভাষাই সাহিত্যের বাহন হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু ঠিক কোন্ সময়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আবির্ভাব হয় তাহা সঠিক ভাবে নিরূপণ করা যায় না। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপালে কতকগুলি বৌদ্ধ চর্য্যাপদ আবিষ্কার করেন এবং বৌদ্ধগান ও দোঁহা বিষয়ক পুস্তক রচনা করেন। এই চর্য্যাপদগুলির প্রধান বিষয়বস্তু হইল সহজিয়া বৌদ্ধ মতের গূঢ় আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। চর্য্যাপদগুলির সংকলন হইয়াছিল দশম-একাদশ শতকে। ইহাদের ভাষা ঐ সময়ে প্রচলিত বাংলা ভাষার নিদর্শন হিসাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে। ইহার পর ক্রমশঃ বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া বাংলার সাহিত্যিক ভাষায় রূপান্তরিত হয়। মোটামুটি বলা যাইতে পারে দশম হইতে দ্বাদশ শতক বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আদিযুগ। এই চর্য্যাপদ ও দোঁহার রচয়িতাগণ সিদ্ধাচার্য্য নামে অভিহিত হইতেন এবং তাঁহারা সকলেই বাঙ্গালী ছিলেন। প্রসঙ্গতঃ বলা যাইতে পারে, গীতগোবিন্দের রচনাভঙ্গী প্রাচীন বাংলা ও অপভ্রংশে রচিত গীতি কবিতার অনুরূপ। দ্বাদশ শতকের পূর্ব্বে এই চর্য্যাপদগুলি ছাড়া প্রাচীন বাংলা ভাষায় রচিত আর কিছু পাওয়া যায় নাই। প্রচলিত ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষকগণ সংস্কৃতকেই একমাত্র সাধুভাষা ও সাহিত্যের আধার মনে করিতেন। কিন্তু সিদ্ধাচার্য্যগণ প্রচলিত জনসাধারণের ভাষাকেই তাঁহাদের ধর্ম্মমত প্রচারের বাহন করিয়াছিলেন। এবং ইহাই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সৃষ্টি ও পরিপুষ্টির একমাত্র কারণ। মধ্যযুগে বাংলার বৈষ্ণব ধর্ম্মও এই একই কারণে বাংলা সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিয়াছিল।

বাংলালিপি ঃ—

ভারতের সর্ব্বত্রই প্রাচীন যুগে সংস্কৃত, প্রাকৃত ও দেশীয় একই রকম অক্ষরে লিখিত হইত। দেশ-কাল অনুসারে তাহার ভিন্ন ভিন্ন রূপ ছিল। সম্রাট অশোকের সময়ে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত ব্যতীত আর সর্ব্বত্রই একরূপ লিপি প্রচলিত ছিল। ইহার নাম ছিল ব্রাহ্মীলিপি। কাল ও স্থানীয় লোকের রুচি অনুসারে ইহার কিছু কিছু পরিবর্ত্তন ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে হয়। এই পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও গুপ্তযুগের পূর্ব পর্য্যন্ত একদেশের লোক অন্যদেশের বর্ণমালা পড়িতে পারিত। এই যুগেই বিভিন্ন প্রদেশের বর্ণমালার মধ্যে স্বাতন্ত্র্য ও প্রভেদ গড়িয়া ওঠে। পশ্চিম ভারতের ব্রাহ্মীলিপি রূপান্তরিত হইতে হইতে নাগরীতে পরিণত হয় এবং পূর্ব ভারতের ব্রাহ্মীলিপি হইতে বাংলা বর্ণমালার আবির্ভাব হয়। এখানে বলা আবশ্যক যে বহুকাল যাবৎই বাংলায় প্রচলিত অক্ষরেই সংস্কৃত, প্রাকৃত ও দেশীয় ভাষাগুলি লিখিত হইত। সংস্কৃত লিখিবার জন্য নাগরী অক্ষরের ব্যবহার অতি আধুনিক কালে আরম্ভ হইয়াছে।

বাংলার সাহিত্য চর্চ্চা ঃ—

প্রাচীন বাংলায় সাহিত্যের যুগ দুটিই ছিল বলা যাইতে পারে। প্রথম, সংস্কৃত যুগ শুরু হয় বাংলায় আর্য্য-বংশীয়দের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে এবং শেষ হয় দশম শতকে। এবং দ্বিতীয় যুগ, সহজিয়া সাহিত্যের যুগ। সহজিয়া সাহিত্যের যুগ শুরু হয় দশম শতকের পর। সপ্তম শতকের পূর্ব্বেই বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠা সংস্কৃত সাহিত্যে এক অভিনব রচনারীতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। এই রীতিতে শব্দবিন্যাসের প্রাচুর্য্য ছিল। এই যুগে অনেক গ্রন্থ

লিখিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে "হস্ত্যায়ুর্বেদ" অন্যতম। চারিখণ্ডে ও একশত ষাট অধ্যায়ে লিখিত এই বিশাল গ্রন্থে হস্তীর নানা প্রকার ব্যাধির আলোচনা করা হইয়াছে। ঋষি পালদাস্ত চম্পানগরীতে অঙ্গরাজ লোমপাদের নিকট ইহা বিবৃত করেন। ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে তাঁহার আশ্রম ছিল এবং বাংলাদেশে ইহা রচিত হইয়াছিল। তৎকালে এই গ্রন্থটি অতি প্রয়োজনীয় গ্রন্থ ছিল, কারণ আসাম ও বাংলার জঙ্গলে বহু হস্তী পাওয়া যাইত এবং রাজন্যগণের চতুরঙ্গ সেনাবাহিনীর অন্যতম প্রধান অঙ্গই ছিল হস্তীসেনা। অনেকের মতে গঙ্গারিডই রাজ্যের শক্তিশালী হস্তীসেনার কথা শুনিয়া আলেক-জাণ্ডার আর বিপাশা নদী পার হইতে ভরসা পান নাই। আর একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ছিল "চান্দ্র ব্যাকরণ"। ইহার রচয়িতা বৌদ্ধাচার্য্য চন্দ্রগোবিন বাঙ্গালী ছিলেন। ইনি পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। পানিনির সূত্রগুলি নূতন প্রণালীতে বিভক্ত করিয়া ইহা লিখিত হয় এবং সমগ্র ভারতেই ইহা সমাদৃত হয়। তাঁহার প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র ছিল তিব্বত ও সিংহলে। বিখ্যাত দার্শনিক গৌরীপাদ বাঙ্গালী ছিলেন। প্রচলিত কিম্বদন্তী অনুসারে তিনিই ছিলেন আচার্য্য শঙ্করের গুরুর গুরু।

পালযুগে বাংলায় সংস্কৃত কাব্য রচনা ও কাব্যচর্চ্চা আরও প্রসার লাভ করিয়াছিল। সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগেও বাঙ্গালীরা পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। দেবপালের প্রধানমন্ত্রী দর্ভপানি চতুর্বেদে ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং কেদার মিশ্র চতুর্বিদ্যা-পয়োধি পান করিয়াছিলেন। রাজা হরিবর্ম্মদেবের মন্ত্রী ভবভট্টদেব, নাট্যকার বিশাখদত্ত, কবি মুরারী, কবি গৌড় অভিনন্দন প্রভৃতি সাহিত্যিক-গণেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। সন্ধ্যাকর নন্দী বিরচিত বিখ্যাত

"রামচরিত" এই যুগেই লিখিত হয়। সন্ধ্যাকর নন্দী বরেন্দ্রভূমে পুণ্ড্রবর্দ্ধনের অধিবাসী ছিলেন। দর্শনশাস্ত্রে বাঙ্গালী পণ্ডিত "ন্যায় কন্দলী" প্রণেতা শ্রীধরভট্ট অগ্রগণ্য। "জিনেন্দ্র বুদ্ধি" মৈত্রেয় রক্ষিত, বিমলমতি নামে বৈয়াকরণ এই যুগেই আবির্ভূত হন। চরক ও সুশ্রুতের বিখ্যাত টীকাভাষ্যকার চক্রপানিদত্ত গৌড়রাজ নয়পালের সময় একাদশ শতকে জীবিত ছিলেন। "বৈদিক-সাহিত্য কুসুমাঞ্জলী" প্রণেতা উদয়ন, "ধর্ম্মশাস্ত্র" প্রণেতা জিতেন্দ্রিয় বালক ও যোগ্লোক এই যুগেরই মানুষ। শাস্ত্রজ্ঞ জীমুতবাহন এই সময়েই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত "দায়ভাগ" অনুসারে বাংলাদেশের হিন্দুদের এখনও উত্তরাধিকার, স্ত্রীধন প্রভৃতি বিধিগুলি পরিচালিত হয়। আচার্য্য শীলভদ্র পালযুগেই মহাযান বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

সেনযুগেও সংস্কৃত সাহিত্যের অনেক উন্নতি হয়। রাজা বল্লালসেন নিজে ব্রত-সাগর, আচার-সাগর, প্রতিষ্ঠা-সাগর, দান-সাগর, অদ্ভুত-সাগর নামে পাঁচখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। লক্ষ্মণসেনের মন্ত্রী হলায়ূধ একজন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার। লক্ষ্মণসেনের রাজসভায় পাঁচজন ভারত-বিখ্যাত কবি ছিলেন—'পবনদূত' রচয়িতা ধোয়ী, উমাপতি ধর, গোবর্দ্ধন, শরণ ও জয়দেব। জয়দেব-কৃত গীতগোবিন্দ কাব্য ও দশাবতারবাদ প্রচার সর্ব্ব ভারতে সমাদৃত হইয়াছিল। সেই সময়ে ভাষাতত্ত্বে বন্দ্যঘটীয় সর্ব্বানন্দের নাম উল্লেখযোগ্য।

সহজিয়া সাহিত্য :—

পালরাজগণ বৌদ্ধ ছিলেন। এই সময়ে ভারতবর্ষে বাংলায় ও

বিহারেই বৌদ্ধধর্ম্মের প্রসার ঘটে। কিন্তু এই সময়েই বৌদ্ধধর্মও নানাভাবে রূপ পরিবর্ত্তন করিতেছিল, এবং ফলে সহজযান বা সহজিয়া ধর্মের আবির্ভাব ঘটে। এই সহজিয়া ধর্মকে বিষয়বস্তু হিসাবে গ্রহণ করিয়া এক বিশাল সাহিত্যের সৃষ্টি হয় এবং ইহার অধিকাংশই বাঙ্গালীর রচনা। পালযুগের এই বৌদ্ধতান্ত্রিক সাহিত্য বাংলা· সাহিত্যের এক অনবদ্য সম্পদ। এই ধর্মের সিদ্ধাচার্য্যগণ প্রচলিত বাংলা ভাষায় আপন ধর্মমত প্রচার করিতেন যাহাতে সাধারণ লোকে তাঁহাদের ধর্মাদর্শ বুঝিতে পারে। মোট ৮৪ জন সিদ্ধাচার্য্যের উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে। ইঁহারা দশম হইতে দ্বাদশ শতক পর্য্যন্ত ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। ইঁহাদের দ্বারা লিখিত সাহিত্যের নাম চর্য্যাপদ। চর্য্যাপদের মূল গ্রন্থগুলি সবই লোপ পাইয়াছে। কিন্তু তাহাদের কিছু তর্জ্জমা "তেঙ্গুর" নামক তিব্বতীয় ধর্মগ্রন্থে পাওয়া গিয়াছে। এই চর্য্যাপদই বাংলা ভাষার আদি সাহিত্য নামে পরিচিত।

সিদ্ধাচার্য্যগণের মধ্যে লুইপাদ বা মৎস্যেন্দ্রনাথ ও তাঁহার শিষ্য গোরক্ষনাথ সম্বন্ধে অনেক কিম্বদন্তী আছে। বাংলার রাজা গোপী-চাঁদের সন্ন্যাস গ্রহণ অবলম্বনে লিখিত বহু দোঁহা আর্য্যাবর্ত্তে প্রচলিত ছিল। ময়নামতীর গান নামে ঐ সব দোঁহা প্রসিদ্ধ। রাণী ময়নামতী ও তাঁহার পুত্র রাজা গোপীচাঁদ গোরক্ষনাথের শিষ্য জালন্ধরীপাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। রাণী ময়নামতী যোগবলে জ্ঞাত হইয়াছিলেন যে গোপীচাঁদ সন্ন্যাস গ্রহণ না করিলে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন। গোপীচাঁদ তাঁহার দুই পত্নী অদুনা ও পদুনার বিরোধিতা সত্ত্বেও সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। এই সন্ন্যাস গ্রহণের

বিষয়বস্তু লইয়াই ময়নামতীর গান রচিত হয়। ময়নামতী নামে একটি জায়গাও কুমিল্লা জেলায় অবস্থিত আছে।

সমাজ ও কৃষ্টি :—

প্রাচীনকালে আর্য্যসভ্যতা বিস্তারের পর বাংলাতেও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারি বর্ণের উদ্ভব হয়। তাহাদের বৃত্তিও নির্দ্দিষ্ট ছিল। ক্রমে বহু মিশ্র বর্ণের সৃষ্টি হয়। ইহাদিগকে মিশ্র বা বর্ণশংকর বলা হয়। বিভিন্ন জাতির স্ত্রী পুরুষের সন্তান হইতেই এই জাতির সৃষ্টি। হিন্দুযুগে বাংলাদেশে রচিত কোন শাস্ত্রগ্রন্থে এই মিশ্র জাতির তালিকা নাই। কিন্তু ত্রয়োদশ শতকে রচিত বৃহদ্ধর্ম পুরাণে ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে মিশ্র জাতির উল্লেখ আছে। ইহাতে দেখা যায় সমাজে কেবল দুই জাতি আছে—ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর। ব্রাহ্মণেতর সমুদায় লোককে ছত্রিশ ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। পালযুগে হিন্দুগণ সমাজের বিধান বিনা দ্বিধায় মানিয়া লইতেন। কিন্তু পরবর্ত্তী যুগে কিছু পরিবর্ত্তন দেখা যায়। বৃহদ্ধর্ম পুরাণে ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে সামাজিক জাতিভেদের যে চিত্র পাওয়া যায়, বর্ত্তমান কালের সহিত তাহার প্রভেদ অত্যন্ত কম। সমাজে প্রতি জাতিরই নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি ছিল। অন্নগ্রহণ বা বিবাহ সম্বন্ধে কঠোরতা প্রাচীন যুগে ছিল না। ব্রাহ্মণেরা যে কোনও বর্ণে বিবাহ করিতে পারিতেন।

জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ বিষয়ে ভারতের অন্যান্য অংশের শাস্ত্রীয় ব্যবস্থার সহিত বাংলার বিশেষ প্রভেদ ছিল না। বর্ত্তমান কালেও তাহার প্রায় সবই বিদ্যমান আছে। প্রাচীন যুগেও দুর্গাপূজাই বাঙ্গালীর প্রধান উৎসব ছিল। সন্ধ্যাকর নন্দী "রামচরিতে" ইহার

উল্লেখ করিয়াছেন। হোলকা—বর্ত্তমান কালের হোলী—একটি প্রধান উৎসব ছিল। কোজাগরী পূর্ণিমা, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, পাষাণ চতুর্দ্দশী ব্রত, আকাশ প্রদীপ, জন্মাষ্টমী, অক্ষয় তৃতীয়া, দশহরার গঙ্গাস্নান, অষ্টমীতে ব্রহ্মপুত্র স্নান তৎকালে প্রচলিত ছিল। সপ্তম শতকে বাঙ্গালীদের সম্বন্ধে বৌদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন সাং লিখিয়াছেন, "সমতটের লোকেরা স্বভাবতই শ্রমসহিষ্ণু, তাম্রলিপ্তির লোকেরা দৃঢ় ও সাহসী কিন্তু চঞ্চল ও ব্যস্তবাগীশ, কর্ণসুবর্ণবাসীরা সাধু ও অমায়িক। ইহা ছাড়াও তিনি পুণ্ড্রবর্দ্ধন, সমতট ও কর্ণ-সুবর্ণের অধিবাসীদের মধ্যে বিদ্যাশিক্ষার অদম্য আগ্রহের কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। ইহারা জ্ঞানলাভের জন্য দূরদেশে যাইতেও দ্বিধা করিতেন না। বাঙ্গালী মেয়েদের খুব সুখ্যাতি ছিল। বাৎস্যায়ন তাহাদিগকে মৃদুভাষিণী, কোমলাঙ্গী ও অনুরাগবতী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অবরোধ-প্রথা ছিল না। কিন্তু একালের ন্যায় সেকালেও বিধবাদের নানা দুঃখ দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হইত। বঙ্গবাসীরা বেশীর ভাগ গ্রামেই বাস করিতেন। নৈতিক জীবনে খুব আদর্শের পরিচয় পাওয়া যায়। ভাত, মাছ, মাংস, শাকসব্জী, দুধ, ঘি, ক্ষীর প্রভৃতি খাদ্য ছিল। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণেরাও আমিষ ভোজন করিতেন। সেকালের নরনারী এখনকার মতই ধুতি ও শাড়ী পরিত। উর্দ্ধাঙ্গের কোন আবরণ ছিল না। কখন কখন পুরুষেরা উত্তরীয় ও মেয়েরা ওড়না ব্যবহার করিত। পুরুষ ও নারী উভয়ের হস্ত অঙ্গুরীয়, কেয়ুর, বলয়, কঙ্কন, কর্ণে কুন্তল, কণ্ঠে হার, কটিদেশে মেখলা ও চরণে মল পরিতেন। কেহ কোন শিরভূষণ পরিতেন না। সেকালের সাহিত্যে চামড়ার জুতা, কাঠের খড়ম ও ছাতার উল্লেখ আছে। মেয়েদের বিবাহ হইলেই কপালে

সিন্দুর পরিত। চরণদ্বয় অলক্তক ও বিম্বাধর সিন্দুররঞ্জিত করিত। উৎসবে উলুধ্বনি করা, চালবাটা বা পিঠুলীগোলা দিয়া আলপনা আঁকাও বাংলার বৈশিষ্ট্য ছিল। দাবা ও পাশাখেলা, নৃত্যগীত, অভিনয়াদির খুব প্রচলন ছিল। স্থলপথে ও জলপথে গরুরগাড়ী ও নৌকাই প্রধান যানবাহন ছিল।

বাংলা কৃষিপ্রধান দেশ। ধান ও আখের চাষ হইত। নানাবিধ শিল্পদ্রব্যও উৎপাদিত হইত। তন্মধ্যে বস্ত্রশিল্পই ছিল প্রধান। বস্ত্রশিল্পে বাংলাদেশ প্রাচীনকালে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। বাংলার মসলিন পৃথিবী বিখ্যাত ছিল। প্রস্তর ও ধাতুশিল্পও বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। বাংলায় বাণিজ্যের প্রসারও খুব হইয়াছিল। বহু নদনদী থাকায় দেশের সর্বস্থানে শিল্পদ্রব্য প্রেরণ করার খুব সুবিধা ছিল। স্থল ও জল উভয় পথেই অন্যান্য স্থানের সহিত ইহার বাণিজ্য চলিত। সমুদ্র পথেও বাংলার বাণিজ্য সিংহল ও সুবর্ণভূমি অর্থাৎ ব্রহ্মদেশ, মালয় উপদ্বীপ, যবদ্বীপ, সুমাত্রা প্রভৃতি স্থানের সহিত হইত। পরবর্ত্তী যুগে তাম্রলিপ্তি ভারতের প্রধান বন্দর ছিল। খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকে আসাম ও ব্রহ্মদেশের মধ্য দিয়া বাংলার সহিত চীন ও ইন্দোচীনের বাণিজ্য চলিত। খৃষ্টের জন্মের চার পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বেই বাংলাদেশে মুদ্রার প্রচলন হইয়াছিল। প্রাচীন লিপিতে দীনার ও রূপক, এই দুই প্রকার মুদ্রার নাম পাওয়া যায়। দীনার স্বর্ণমুদ্রার নাম ও রূপক রৌপ্য মুদ্রার নাম। বাংলার স্থাপত্যকলার কীর্ত্তি আছে কিন্তু নিদর্শন নাই। ফা-হিয়েন, হুয়েনসাঙ-এর বিবরণ, প্রাচীন শিলালিপি ও তাম্রশাসনে কারুকার্য্যখচিত বহু হর্ম্য ও মন্দিরের উল্লেখ আছে। কিন্তু সবই ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। কারণ, আর্দ্র বায়ু ও অতিরিক্ত

বর্ষা ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ এবং নদনদীতে প্লাবন। ভাস্কর্য্য ও পোড়ামাটির শিল্পেও বাংলাদেশ বেশ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। খুব প্রাচীনকাল হইতেই বাংলাদেশে চিত্রাঙ্কনের চর্চ্চা ছিল। শোনা যায়, ফা-হিয়েন তাম্রলিপ্তির বিহারে অবস্থান কালে বৌদ্ধমূর্ত্তির ছবি আঁকিতেন।

বাঙ্গালী ঃ—

সপ্তম শতাব্দীতে চীনদেশীয় পরিব্রাজক হুয়েনসাঙ বাঙ্গালীদের সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন যে, সমতটের লোকেরা শ্রমসহিষ্ণু, দৃঢ় ও সাহসী। কর্ণসুবর্ণবাসীরা সাধু ও অমায়িক। তিনি আরও লিখিয়া গিয়াছেন যে, পুণ্ড্র বর্দ্ধন, সমতট ও কর্ণসুবর্ণের অধিবাসীদের লেখা-পড়া শিখিবার অদম্য আগ্রহ ও প্রাণপণ চেষ্টা ছিল।

এই সব অধিবাসীরা—কর্ণসুবর্ণের, পৌণ্ড্র বর্দ্ধনের, তাম্র-লিপ্তির, সমতটের—পালযুগে একত্রিত হইয়া একটি জাতি (বাঙ্গালী জাতি) গঠন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ভাষার ঐক্যতা ও দীর্ঘকাল একই দেশে, একই শাসনাধীনে বসবাস ইহাতে সাহায্য করিয়াছিল।

এই জাতির পূর্ণ ইতিহাস এখনও লেখা হয় নাই, কিন্তু যেটুকু লেখা হইয়াছে তাহাতে এই জাতির শৌর্য্য, বীর্য্য, শিক্ষা ও কৃষ্টির শ্রেষ্ঠতার পরিচয় পাওয়া যায়। বিপাশার পূর্বতীর হইতে গঙ্গানদীর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত বাংলার গঙ্গারিডই রাজ্যের বাহুবলের কথা শুনিয়া দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডার বিপাশা অতিক্রম করিতে সাহস করেন নাই। বাঙ্গালী শশাঙ্ক কান্যকুব্জ হইতে কলিঙ্গ পর্য্যন্ত এক সাম্রাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালী ধর্ম্মপাল ও দেবপাল শশাঙ্কের পরিকল্পনা সম্পূর্ণ করিয়া পঞ্চনদ অবধি বাঙ্গালীর

রাজশক্তির দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিতেও বাঙ্গালী বলীয়ান ছিল। জৈনধর্ম বাংলাদেশেই প্রথমে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের গুরু জৈনাচার্য্য শ্রুতকেবলী ভদ্রবাহু বাংলা দেশেরই সন্তান। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ হইতে বিতাড়িত বৌদ্ধধর্ম্ম বাঙ্গালীর রাজত্বেই শেষ আশ্রয় লাভ করিয়া প্রায় চারিশত বৎসর টিকিয়াছিল। তখন বাঙ্গালীই বৌদ্ধজগতের গুরু স্থানীয় ছিল। উত্তরে দুর্গম হিমগিরি পার হইয়া তিব্বতে ও চীনে, দক্ষিণে দুর্লঙ্ঘ্য জলধির পরপারে সিংহলে সুবর্ণ দ্বীপে পর্য্যন্ত বাঙ্গালীরাই বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিয়াছিল। শঙ্করের গুরুর গুরু গৌরীপাদ বাঙ্গালী ছিলেন। বাণিজ্য সম্পদে বাঙ্গালী একদিন ঐশ্বর্য্যশালী ছিল। গাঙ্গে নগরী ও তাম্রলিপ্তি হইতে তাহার বাণিজ্যপোত দূর দূরান্তরে যাইত। বাংলার মসলিন সমগ্র জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। সংস্কৃত সাহিত্যে বাংলার দান জয়দেবের কোমল কান্ত পদাবলী, বল্লালসেন, হলায়ূধ, ভবদেব ভট্ট, সর্ব্বানন্দ, চন্দ্রগোবিন, গৌরপাদ, শ্রীধর ভট্ট, চক্রপানিদত্ত, জীমূতবাহন, অভিনন্দ, সন্ধ্যাকর নন্দী, ধোয়ী, গোবর্দ্ধনাচার্য্য, উমাপতি ধর প্রভৃতির রচনা সমগ্র ভারতে আদৃত হইয়াছে।

নির্দ্দেশিকা :—

১। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার : বাংলার ইতিহাস ১ম খণ্ড
২। সৈয়দ মুজতবা আলী : রামকৃষ্ণ।
৩। যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত : বিক্রমপুরের ইতিহাস।
৪। হিমাংশু চ্যাটার্জ্জি : বিক্রমপুর, ৩য় খণ্ড।
৫। আদিনাথ সেন : দীননাথ সেনের জীবনী।

৬। ক্ষিতিমোহন সেন : চিন্ময় বঙ্গ।
৭। প্রফুল্লচন্দ্র সেন : আউটশাহীর ইতিহাস।
৮। ডঃ নীহাররঞ্জন রায় : বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব্ব।
৯। নীরদচন্দ্র চৌধুরী : বাঙ্গালীর জীবনে রমণী।
১০। সুধীররঞ্জন দাস : যা দেখেছি, যা পেয়েছি।
১১। Sedetion (Rowlatt) Committee's Report 1918.
১২। Nalini Kanta Bhattashali : Report on Dacca Museum.
১৩। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
১৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

॥ চতুর্থ পরিচ্ছেদ ॥

পূজাপার্বণ ও অন্যান্য ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান ঃ—

খৃষ্টীয় সম্প্রদায় উপাসনা করিতে রবিবার গির্জায় যায় এবং মুসলমানেরা যায় শুক্রবারে মসজিদে। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মে এই প্রকার কোন বাধ্যবাধকতা নাই। এই অভাব কিন্তু কোন হীনতাপ্রসূত নহে। আমাদের ধর্মীয় কৃষ্টির রূপই এই যে, প্রতি বৃক্ষতল হিন্দুর মন্দির, প্রতি পদক্ষেপ হিন্দুদের দেবতার আবাস। হিন্দুদের বিশেষ করিয়া শুক্রবার বা রবিবারের প্রয়োজন হয় না। বারো মাসে তেরো পার্ব্বণের দেশে রবিবার, শুক্রবারের প্রয়োজন কোথায়? বাংলার প্রাণ পল্লীগ্রামে। এই বারো মাসে তেরো পার্ব্বণ সেই পল্লী বাংলার দৈনন্দিন জীবনে দেবতার আসন এত পাকা করিয়া দিয়াছে যে, ভক্তের পূজা লইতে দেবতাকে এখানে দিন-তারিখ হিসাব করিয়া আসিতে হয় না।

আমাদের গ্রামেও এই বারো মাসে তেরো পার্বণের কোনও ঘাটতি হইতে দেখি নাই। মাসে একটি তো বটেই, কোন কোনও মাসে তিন চারটি করিয়া পূজা পার্ব্বণও হইত। প্রতি গৃহস্থের বাড়ীতেই গ্রাম্য পুরোহিত আসিয়া পূজা করিতেন। পরিবারের সকলেই এই পূজায় যোগ দিতেন। বিক্রমপুরের সর্বত্রই এই পূজাগুলি একই ভাবে অনুষ্ঠিত হইত, আমাদের গ্রামের পূজাতেও বৈশিষ্ট্য কিছুই ছিল না। তবু এই পরিচ্ছেদে এই অনুষ্ঠানগুলির কিছু পরিচয় দিবার প্রয়াস করিয়াছি। গ্রাম্য জীবনের সুন্দর একটি প্রবাহ বহিত এই পূজাপার্বণের বর্ষব্যাপী পরম্পরকে নিয়া। পূজাপার্বণের প্রত্যাশায়ই বাঙ্গালীর গ্রাম্য জীবনের সর্ব্বোচ্চ আনন্দ ছিল।

বৈশাখের প্রথম দিনেই হইত বিশ্বকর্ম্মা পূজা, পরে দেখিয়াছি পশ্চিমবঙ্গে এই পূজা হয় ভাদ্র মাসের সংক্রান্তির দিনে। এই পূজাতে মা-পিসীমারা দরজা চৌকাঠ বাক্স প্যাটরাতে পিটালী বা চাউল গোলার আলপনা দিতেন। কোন পুরোহিত আসিতেন কিনা তাহা অবশ্য মনে নাই। এই দিনেই "গলাইয়া" নামে এক মেলা বসিত শুধু মাত্র একবেলার জন্য। এই দিন আর দৈনিক বাজার বসিত না তবে ব্যতিক্রমও ছিল বৈকি। টঙ্গীবাড়ীতে এই মেলা পনেরো দিন পর্য্যন্ত বসিত এবং আউটসাহী গ্রামে এই মেলা বসিত প্রায় এক মাস ধরিয়া।

ইহার পর আষাঢ় মাসে রথযাত্রা উৎসব। খুব ছেলেবেলায় এই উৎসব আমরা দেখি নাই। শুনিতে পাই বহু পূর্ব্বে মুন্সেফবাড়ী হইতে বংশদণ্ড নির্মিত একটি রথ বাহির হইত। তাহার পর ১৯০৫/৬ খৃঃ "শবইতার দিদি" নামে এক কৈবর্ত্ত মহিলা একটি কাষ্ঠ

নির্মিত রথ প্রস্তুত করাইয়া এই উৎসবের পুনঃ প্রবর্ত্তন করেন। এই উপলক্ষেও গ্রামে একবেলা ব্যাপী মেলা বসিত। কয়েক বৎসর পরে শ্রীঅপূর্ব সেন আবার এই উৎসব প্রবর্তিত করেন কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর ইহারও অপমৃত্যু ঘটে।

আশ্বিনে দুর্গোৎসব। বাংলার অন্তরের সর্ব আনন্দের জারক রসে সিক্ত এই অপরূপ মহোৎসবের আয়োজনে আমাদের গ্রামেও কম জাঁকজমক হইত না। আমাদের ক্ষুদ্র গ্রামেও প্রায় পনেরো কুড়িখানা পূজা হইত। বিদেশে কর্মরত গ্রামবাসীগণ প্রায় সকলেই এই সময় গ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। প্রবাসীগণের এই প্রত্যাগমন গ্রামবাসীগণের নিকট ছিল সত্যিই এক বড় আনন্দের ঘটনা। ৺পূজায় একটি বড় আনন্দ ছিল রায়ের বাড়ীতে তিনদিন ব্যাপী রামায়ণ গান। তবে সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় ছিল বোধ হয় ৺বিজয়া-দশমীর দিনই। গ্রামের সব কটি ঠাকুরই দশমীর সন্ধ্যায় দক্ষিণ পাড়ার বড় দীঘিতে একত্রিত হইত এবং এই উপলক্ষে সেখানে একটি ছোটখাট মেলাও বসিয়া যাইত। তাহার পর বাজী পোড়ান, প্রতিমার নৌকায় নাচগান ও নানা প্রকার আমোদ আহ্লাদের পরে প্রতিমা বিসর্জ্জন দেওয়া হইত। পরবর্ত্তীকালে পানীয় জলের জন্য বড় পুকুর আরক্ষিত বলিয়া ঘোষণা করায় এই পেতিমা বিসর্জ্জন মুন্সীবাড়ীর পুকুরেই করা হইত।

দুর্গাপূজার পরের পূর্ণিমাতেই কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা হইত। প্রতি গৃহস্থই এই দিনে সন্ধ্যার পর লক্ষ্মীর অর্চ্চনা করিতেন। ধনী গৃহস্থরা পূর্ণাঙ্গ মূর্ত্তি প্রস্তুত করাইয়া এবং সাধারণ গৃহস্থরা "সরার" উপর লক্ষ্মীর মঙ্গলচিহ্ন অঙ্কিত করিয়া পূজা করিতেন। "সরা" হইল মাটির এক প্রকার পাত্র, বড় প্লেটের মত, কুজার মুখ ঢাকা

পাত্রের মত। পূজার উপকরণ ছিল খই, মুড়ি, মোয়া, চিঁড়া ইত্যাদি। কলাগাছের খোল দিয়া বাণিজ্যপোত নির্মিত হইত—ছইঢাকা শস্যপূর্ণ, মাঝিমাল্লাবাহিত এই নৌকাতে চড়িয়া গৃহস্থ বাণিজ্য করিতে যাইবে। পূজান্তে সকলকে মোয়া, নাড়ু ইত্যাদি প্রসাদ দেওয়া হইত। এই প্রসাদকে বলা হইত কোজাগরী প্রসাদ। লক্ষ্মীপূজাকে বলা হইত কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা এবং এই পূর্ণিমাও তাই কোজাগরী পূর্ণিমা নামে অভিহিত হইয়াছে।

তাহার পর কার্ত্তিক মাসের সংক্রান্তির দিন সন্ধ্যার পর প্রতি ঘরেই কার্ত্তিক পূজা হইত। এই দিনের জন্য কুমারেরা নানা প্রকার কার্ত্তিক মূর্তি প্রস্তুত করিত, যেমন নসাই কার্ত্তিক, কালেম কার্ত্তিক, কোকাই কার্ত্তিক, বসা কার্ত্তিক, বাবু কার্ত্তিক ইত্যাদি। এই পূজারও উপকরণ ছিল মুড়ি, খৈ, মোয়া, নাড়ু ইত্যাদি। কিন্তু পূজান্তে আত্মীয়স্বজনেরা কেহ প্রসাদ নিতে আসিতেন না। এই পূজার একটি বিশিষ্ট অনুষ্ঠান ছিল "ভুল উড়ানো"। এই ভুল জিনিসটি বানানো হইত এই ভাবে—একটি ছোট এবং একটি বড় "জিঙ্গেল" অর্থাৎ বাঁশের দুইটি বৃহৎ খণ্ড লইয়া দুটিকে আড়াআড়ি ভাবে বাঁধিয়া একটি ক্রশ বানানো হইত। এই ক্রশটির উপরের তিনটি বাহুতে কিছু সহজ দাহ্য পদার্থ বাঁধিয়া দেওয়া হইত। যেমন 'ফাৎরা" বা শুষ্ক কলার পাতা, "বাইল" বা শুষ্ক সুপারী পাতা, পাটখড়ি বা শুষ্ক পাটগাছ ইত্যাদি। এইগুলিকে একত্রে ভুলের মাথায় তিনটি বাহুতে কিছু "ছটকুল" (অর্থাৎ কলাগাছের গুড়ি হইতে যে এক প্রকার পাতলা সুতার মত বাহির হয়) দিয়া বাঁধা হইত। পরে পুকুর হইতে 'হোচা' (বাঁশের নির্মিত মাছ ধরিবার ফাঁদ) দিয়া ইচা, বৈচা প্রভৃতি মাছ ধরিয়া এবং গোয়ালঘর হইতে

মশা, মাছি প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া ভুলের ঐ তিনটি বাহুতে ভরিয়া দেওয়া হইত। তারপর সন্ধ্যায় পূজার ঘরের দরজায় আসিয়া এই তিনটি বাহুতে আগুন লাগাইয়া "ইচার মুড়া, বৈচার মুড়া—ভুলা যায় উত্তর মুড়া"—এই ছড়াটি বলিতে বলিতে পূজার ঘর প্রদক্ষিণ করিয়া ঐ জ্বলন্ত মশালটি উত্তর দিকের পুকুরে বা জলে ফেলিয়া দেওয়া হইত। ইহাকেই "ভুল উড়ান" বলা হইত। বছরের সমস্ত ভুলের অপসারণ ও নিবারণ করাই বোধ হয় এই অনুষ্ঠানটির মর্মকথা।

মাঘ মাসের শুক্লাপঞ্চমী তিথিতে সরস্বতী পূজা হইত দিনের বেলা কিম্বা সকাল বেলাতেই। অবস্থাপন্ন গৃহস্থ সরস্বতী মায়ের মূর্ত্তি গড়াইতেন, অপেক্ষাকৃত ধনহীন গৃহস্থ পিঁড়ির উপর দোয়াত কলম, খাতাপত্র ও পুস্তকাদি রাখিয়া পূজা করিতেন। ঘরে ঘরে এই পূজা হইত। সকালেই বাড়ীর ছেলেমেয়েরা স্নানের পর পুরোহিতের পূজা শেষ হইলে সেই বিখ্যাত শ্লোক 'টং টং সরস্বতী' আবৃত্তি করিত। গৃহপূজা ব্যতীত বহু বিদ্যালয়েও এই পূজা হইত। ছাত্রেরা দুই পয়সা হইতে ছয় পয়সা চাঁদা দিয়া পূজার খরচ চালাইত।

ইহার পর উল্লেখযোগ্য হইল ফাল্গুনে দোল পূর্ণিমার উৎসব। পূর্ণিমার পরের দিন রং খেলা হইত। এই দিন বৈকালে ঠাকুর বসানো সব কয়খানি দোলনা মৌঘা দীঘির পারে একত্রিত করিয়া নয়াবাজার পর্য্যন্ত শোভাযাত্রা বাহির করা হইত এবং তাহার সাথে সাথেই রং খেলা চলিত। এই শোভাযাত্রাকে আমরা "বুলোনী" বলিতাম। পরবর্ত্তী যুগে এই শোভাযাত্রা স্কুলবাড়ী পর্য্যন্ত গিয়া শেষ হইত। সন্ধ্যাবেলা শোভাযাত্রা ও রং খেলা শেষ হইলে সকলে গিয়া শ্রীআনন্দ সরখেলের বাড়ীতে (পরবর্ত্তী কালে শ্রীঅপূর্ব সেনের

বাড়ীতে) শান্তিজল গ্রহণ করিতেন এবং তাহার পর সকলের দেওয়া চাঁদাতে খিঁচুড়ী ভোগ হইয়া উৎসব শেষ হইত। দোল উৎসবের আগের দিন সন্ধ্যাবেলা দোলমঞ্চের নিকটে নানারূপ দাহ্য পদার্থের দ্বারা প্রস্তুত একটি ঘর "বুড়ীরঘর" পোড়ান হইত।

বৎসরের শেষ উৎসব চৈত্রসংক্রান্তির দিনে নীলপূজা—পশ্চিমবঙ্গে যাহা 'গাজন' বলিয়া প্রসিদ্ধ। একমাস ব্যাপী এই উৎসবের দিনে নানা প্রকার শোভাযাত্রা এবং রাত্রে গ্রাম্য পদ্ধতিতে যাত্রাগান ইত্যাদি হইত। দুই একটির কথা এখনও বিশেষ ভাবে মনে আছে। একটি হইল হরগৌরীর নাচ। মহাদেব ও গৌরীর সাজে সজ্জিত হইয়া ইহারা বাড়ী বাড়ী নাচ দেখাইয়া ফিরিতেন। অমর মাঝিও নানা প্রকার সং সাজিয়া গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়া বেড়াইত। রাত্রে "কালীনাচ" নাচ হইত। একজন মহাকালীর বেশে বাড়ী বাড়ী গিয়া নাচ দেখাইয়া পয়সা, কাপড় ইত্যাদি আদায় করিত। তাহার সহিত ঢাক ঢোল ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র সবই থাকিত। এই সংকে আমরা 'কালীনাচ' বলিতাম। এই সংগুলি গ্রামে খুব জনপ্রিয় ছিল। একমাস ব্যাপী এই উৎসব চৈত্রসংক্রান্তির দিন শেষ হইত। শেষের দিন জয়ব্রহ্মসারের নিকট একটি পুকুরের চারিদিক ঘিরিয়া (অনেকটা কলিকাতার জেলেপাড়া বা ঢাকার জন্মাষ্টমীর মিছিলের মত) নানারকম সং বাহির হইত। গ্রামের কৈবর্ত্তরাই এই উৎসবের প্রধান উদ্যোক্তা এবং অংশীদার ছিলেন। মাঝে দুই এক বৎসর অবশ্য কায়স্থরাও এই উৎসব করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

ইহা ছাড়া আরও কয়েকটি ছোট ছোট পুজা দেবতার মৃণ্ময় মুর্ত্তি গড়িয়া ঘরে ঘরে অনুষ্ঠিত হইত। গ্রাম পুরোহিত আসিয়া গৃহস্থের এই পূজাগুলি সম্পন্ন করাইয়া দিতেন। এই পূজাগুলি

আকারে ক্ষুদ্রতর হইলেও প্রাধান্যে ক্ষুদ্র ছিল না। তাই ইহাদের কথাও কিছু বলিলে বোধ হয় অবান্তর হইবে না।

প্রতি শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তিতে মনসা পূজা হইত। শিবতনয়া নাগেশ্বরী দেবী বিষহরির পূজা প্রতি গৃহস্থ পরিবারেই করা হইত। মনাসার নানারূপ মৃন্ময় সাপমূর্ত্তি প্রস্তুত করাইয়া দুগ্ধ এবং কদলী উপচারে এই পূজা সাধারণতঃ দিনের বেলাতেই সম্পন্ন হইত।

আশ্বিনে দুর্গাপূজার কথা আগেই বলিয়াছি। অত্যন্ত ব্যয়-সাধ্য, শ্রমসাধ্য এবং সময়সাপেক্ষ হইবার জন্য যথেষ্ট সম্পন্ন গৃহস্থ ভিন্ন এই পূজা অনেকেই করিতে পারিতেন না। আর সে যুগে বারোয়ারী পূজার প্রচলন আদৌ ছিল না।

ধর্মীয় অনুষ্ঠান গ্রামে আরও অনেক দেখিয়াছি। তাহার কোনটিতে পুরোহিত আসিতেন, কোনটিতে প্রয়োজন হইত না। বৈশাখ মাসব্যাপী তুলসী গাছে জল দেওয়া, তুলসী গাছের উপর একটি ছিদ্রযুক্ত ঘট বসাইয়া দেওয়া হইত, এবং সেই ছিদ্র দিয়াই তুলসী গাছে জল পড়িত। পুরা বৈশাখ মাস ধরিয়া নারায়ণের বৈকালিক পূজা হইত। এই বিশেষ পূজার উপকরণের নাম ছিল "বৈকালী" বা শীতলী। ভাদ্রমাসে গ্রামের কৈবর্ত্তরা জন্মাষ্টমীর গান গাহিয়া গাহিয়া, নৌকাতে সমস্ত গ্রাম প্রদক্ষিণ করিত। আশ্বিন মাসের সংক্রান্তিতে "গাড়ু সংক্রান্তি" বলা হইত। সেদিন কি পূজা হইত মনে নাই, কিন্তু দ্বিপ্রহরে আহার যে নিতান্তই সাত্ত্বিক হইত এবং সন্ধ্যায় যে ঘরে ঘরে আলো দেওয়া হইত তাহা পরিষ্কার মনে আছে। ইহাকে আমরা বলিতাম 'দ্বীপান্বিতা', এই দিন হইতে পুরা একমাস আকাশ প্রদীপ জ্বালান হইত। পৌষসংক্রান্তির দিন আবার হইত বাস্তুপূজা। গৃহ হইতে দূরে কোন রাস্তার পাশে বাস্তু

দেবতার পূজা হইত। গৃহস্বামীর যে ঐ রাস্তা ব্যবহার করিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে, তাহাই দৃঢ়ভাবে সংস্থাপনের জন্য এই পূজা করা হইত। তবে এই পূজা কোন গৃহস্থের একক পূজা নহে। ইহা সমগ্র পাড়ার দলগত পূজা। পূজার একটি বিশেষ অঙ্গ এবং অবশ্য করণীয় অনুষ্ঠান ছিল ছাগবলি। ফাল্গুনে শিবচতুর্দ্দশীর উপবাস পালন করা হইত এবং প্রহরে প্রহরে শিব পূজা হইত। এই সকল ব্যতীত আরো কত পূজা, ব্রত প্রভৃতি যেমন গঙ্গাসাগর স্নানযাত্রা, লাঙ্গলবন্ধের ব্রহ্মপুত্রে স্নান, গ্রহণে গঙ্গাস্নান, বারুণী স্নান ইত্যাদি হইত তাহার হিসাব নাই।

একটা বিষয়ে আমার একটু আশ্চর্য্য লাগে, হয়তো সময় বদলাইতেছে তাই,—আমাদের সময়ে এত আলো দিয়া বাজী পোড়াইয়া কালীপূজা হইত না। শুধু দেখিয়াছি বারোয়ারী বিপণী বণিকগণ এই পূজার আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠান করিতেন। আজ সব বাঙ্গালীই বাংলার বাহিরে ও বাংলাদেশে অত্যন্ত আড়ম্বরের সহিত কালীপূজা করেন। সে যুগে আলো দেওয়া হইত শুধু দীপান্বিতার দিন এবং বাজি পোড়ান হইত বিজয়া দশমীর দিন। মনে আছে একবার ৺বিজয়ার পর বাজী পোড়াইতে গিয়া অপূর্ব্ব সেনের হাতের পাঁচটি আঙ্গুল. সাংঘাতিক ভাবে পুড়িয়া গিয়াছিল। যাহাই হউক কালীপূজা আমাদের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনের এক বিশেষ অঙ্গ। কালীপূজা প্রতি বাঙ্গালী গৃহস্থের পক্ষে অবশ্য করণীয়। সে যুগে বিবাহাদি সামাজিক কার্য্যে কালীপূজার স্থান সর্ব্বাগ্রে ছিল।

ইহা ছাড়াও কাহারও কাহারও বাড়ীতে প্রায়ই হরির লুঠ বা কীর্ত্তন গান বসিত। দুই এক ঘণ্টা কীর্ত্তনের পর বাতাসা বিতরণ করিয়া এই অনুষ্ঠান শেষ হইত। নানারূপ শান্তি স্বস্ত্যয়ন, শনিবারে

শনিপূজা, পূর্ণিমায় সত্যনারায়ণ পূজা সর্ব্বদাই হইত। প্রতি গৃহস্থ ঘরেই নারায়ণ শীলার দৈনিক পূজার রীতি প্রচলিত ছিল। গ্রামে যে কয়টি প্রতিষ্ঠিত দেবমূর্ত্তি ছিল তাঁহাদেরও দৈনিক পূজা হইত। মুন্সীবাড়ীর গৌড়মঠের কথা আগেই বলিয়াছি। ইহা ছাড়া অখিল বিশারদের বাড়ী মহিষমর্দ্দিনীর মূর্ত্তি, দীনবন্ধু রায় ও মজুমদার বাড়ীতে শিবমূর্ত্তি ও গোঁসাই পাড়াতে সূর্য্যমূর্ত্তি ছিল। বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে গ্রামবাসীগণ পূজা দর্শনাদি করিতে এই সব মন্দিরে আসিতেন।

৺পূজার সময় যেমন রায়বাড়ীতে রামায়ণ গান হইত, সেইরূপ অন্যান্য উপলক্ষে অন্যত্রও এই গানের প্রচলন ছিল। আর ছিল বাংলার কৃষ্টির প্রাণের গভীরের জিনিস, যাত্রাগান। রামায়ণ. মহাভারত বা অন্য পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বন করিয়া গান বাঁধা হইত এবং অনেকটা আধুনিক নাটকের মত রূপ দিয়া উহা দর্শকদের নিকট উপস্থিত করা হইত। অবশ্য যাত্রার মঞ্চ হইত চতুর্দ্দিক খোলা। কয়েকটা পালার কথা এখনও মনে আছে, "কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন বধ", "রাজা সুরথের দুর্গাপূজা", অংশুমানের "অশ্বমেধ যজ্ঞ", "বিজয় বসন্ত" প্রভৃতি। আরও মনে পড়ে, 'দক্ষযজ্ঞের' সেই সতীর গান, "তাই ভাবি গো মনে, বিনা নিমন্ত্রণে কেমন করে যজ্ঞে যাই বলো না, তোমরা যাবে সমাদর পাবে আমি গেলে পিতা কথাও কবে না"। ইহা ভিন্ন কবি গানও হইত। পশ্চিমবঙ্গে যাহাকে বলা হয় "আখড়াই", দুই কবির মধ্যে গানে গানে এই যুদ্ধ দর্শকদের অত্যন্ত উপভোগ্য ছিল। আর ছিল ইহার সাথে কথকতা ও কীর্ত্তন গান। কথকতায় কথকঠাকুর শ্রীমদ্ভাগবতের কথা সরল ভাষায় গ্রামবাসী শ্রোতাদের বুঝাইয়া দিতেন। আর কীর্ত্তন গান হইত

রাধাকৃষ্ণের লীলাপ্রসঙ্গ লইয়া। কীর্ত্তন গায়ক অনেকে ছিলেন, কিন্তু হরিমোহন মিস্ত্রীর অপূর্ব্ব পদাবলী কীর্ত্তনের কথা আমি আজিও ভুলি নাই। তাঁহার সেই "সে যে থাকত তাকে তাকে দেখত পাকে পাকে; সে যে কুম্ভীরিণীর মত ফিরত", এখনও যেন সুরস্পর্শের ছোঁয়ায় কোথায় যেন নিভৃতে অতি মৃদুল নিবিড় কম্পনের সৃষ্টি করে। বাউলেরা প্রায়ই আসিতেন। আরও একজন, বোধ হয় বৈশাখেই, পাশের গ্রাম আউটসাহী হইতে অতি প্রত্যূষে খঞ্জনি বাজাইয়া শ্রীকৃষ্ণের শতনাম গাহিতে গাহিতে পাড়া প্রদক্ষিণ করিতেন—"জয় জয় গোবিন্দ গোপাল গদাধর, কৃষ্ণচন্দ্র কর কৃপা করুণা সাগর।" তাঁহার গানে আমাদের ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইত। কখনও একতারা বাজাইয়া কোন উদাসীও আসিতেন।

আবার কোন সময়ে এক জাদুকর আসিয়া তাহার ভানুমতীর খেলার আশ্চর্য্য মায়ালোকের দুয়ার খুলিয়া বসিত। আমাদের বিস্মিত বালক-মনের আঙ্গিনাতে তখন সে অনায়াসে আমের আঁটি পুঁতিয়া দিয়া তাহাতে গাছ ধরাইয়া আবার আমও ফলাইয়া চলিয়া যাইত। ভাল্লুকওয়ালা, বানরওয়ালা প্রভৃতিও সর্বদাই আসিত। আবার হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হইত পার্শ্ববর্ত্তী বিয়াইনার হাট হইতে "বইদ্যার (বেদিয়া) দল", তাহারা ছিল মুসলমান, কিন্তু হিন্দু দেবদেবীগণকে পূজা দিতেও তাহাদের কোন কার্পণ্য ছিল না। বাস করিত তাহারা দল বাঁধিয়া, বিয়াইনার হাটে খালের উপর নৌকাতে। তাহারা কখনও ছ' সাতজন পুরুষ ও নারী এক সাথে আসিয়া "বাইদ্যার নাচ" দেখাইয়া যাইত। কখনও আবার জন দুই আসিত "গাজীর পাট" নিয়া। একটি আট দশ ফিট লম্বা দণ্ডে, প্রায় দশ বারো গজ কাপড় জড়ান থাকিত। তাহাতে আঁকা থাকিত নানা

বিষয়ে নানা খণ্ড খণ্ড চিত্র। এই কাপড়টার বাহিরের দিকের প্রান্তটি অপর একটি দণ্ডে জড়াইয়া ক্রমশঃ ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া খোলা হইত এবং সঙ্গে সঙ্গে গাহিয়া তাহারা পটে অঙ্কিত কাহিনীর ব্যাখ্যা করিয়া যাইত। বোধ হয় আমি এই ভাবেই প্রথম শচীদেবী ও বিষ্ণু-প্রিয়ার কাহিনী শুনিয়াছিলাম। আর এক শুনিয়াছিলাম "মনসার গান", জঙ্গলে বাঘ আসিয়াছে, কিন্তু মনা জঙ্গলে যাইবেই। তাহাকে নিষেধ করা হইতেছে "যাইছ না মনা জঙ্গলে বাঘ আইসাছে, বাঘের মাথায় কোঁকড়া ঝুটি ফেউ ডাইকাছে।"

১৯১১ খৃঃ মনোমোহন গোঁসাই গোঁসাইপাড়াতে একটি রামকৃষ্ণ আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে প্রতি রবিবার শ্রীআনন্দ সরখেল শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত পাঠ করিতেন। তখন কথামৃতের কেবল প্রথম ভাগই প্রকাশিত হইয়াছে। সেই পাঠ শুনিতে গ্রামের বালক বৃদ্ধ যুবক সকলেই যাইতেন। আমাদের গ্রামের ছেলেদের এই আশ্রমে আসা-যাওয়াটা কি জানি কেন খুব ভাল লাগিত। আশুবাবু গোস্বামী মহাশয়ের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। নিতাই সাধুও প্রায়ই যাইতেন। আশ্রমে একটা না একটা উৎসব লাগিয়াই থাকিত। রাধাকৃষ্ণের কীর্ত্তন, নাম সংকীর্ত্তন প্রায়ই হইত। বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ মনোমোহন গোস্বামী যদিও শিক্ষক ছিলেন, তবু মনে হয় না তাঁহার পড়াশুনা বিদ্যালয়ের গণ্ডী পার হইয়াছিল। গ্রাম হইতে তিনি বাহিরে যাইতেনও না, বাহিরের খবর তাহার বড় একটা জানাও ছিল না। তবু আশ্চর্য্য এই যে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সম্বন্ধে তিনি প্রচুর জানিতেন। এই আশ্রম পাঁচ ছয় বৎসর বেশ চলিয়াছিল, তাহার পর গোস্বামী মহাশয়ের অকাল মৃত্যুতে তাহা বন্ধ হইয়া যায়।

এখন জীবনের শেষে বিস্ময় জাগে কি করিয়া ঐ সময়ে পরমহংসদেব বাঙ্গালীর জীবনে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তবে ধর্ম্মের ইতিহাসে দেখা গিয়াছে, এইরূপই হয়, এইরূপ হওয়াই নিয়ম। জাতির ধর্ম্মের বিপৎকালে যুগে যুগে এইভাবে মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে, তাই বিপদ কাটিয়া গিয়াছে। ধর্ম্মের ইতিহাসে দেখা যায় যে কোন সভ্যজাতির বিত্তশালী সম্ভ্রান্ত সমাজের মাতৃভাষাতে বা অন্য সহজবোধ্য ভাষাতে যদি ধর্ম্মচর্চ্চা না থাকে তবে সে সমাজ কুসংস্কারগ্রস্থ ক্রিয়াকলাপ ও নানা পালাপার্বণ নিয়াই মত্ত থাকে। কলিকাতার গোড়াপত্তনের সময়ে যে সকল হিন্দু ইংরাজকে আশ্রয় করিয়া বিত্তশালী হইয়া উঠেন, তাঁহাদের ভিতর সংস্কৃত ভাষার কোন চর্চ্চা ছিল না। অথচ হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্র সবই সংস্কৃতে রচিত। কাজেই এই বিত্তবান সম্প্রদায় সত্যধর্মের কোন সন্ধান পাইলেন না। ওদিকে হিন্দু বাঙ্গালী স্বভাবতই ধর্মপ্রাণ জাতি। তাই সে পালাপার্ব্বণ নিয়াই মত্ত রহিল। বিপদ আরও বৃদ্ধি পাইল যখন এই সময়েই বিদেশী এক ধর্ম আসিয়া উপস্থিত হইল তাহার সহজ চিন্তাধারা ও সত্যপথ সন্ধানের নবীনতম আন্দোলন নিয়া। এই ধর্ম্ম বাঙ্গালীর পক্ষে বুঝিতে কষ্ট হইল না কারণ যে ভাষাতে এই ধর্ম্ম লিখিত ছিল এবং প্রচারিত হইত, সেই ইংরাজী ভাষা ততদিনে বাঙ্গালী উত্তমরূপে আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছে। তখন সেই বৈদেশিক ধর্ম্মে অনুপ্রাণিত হিন্দুর মনে প্রশ্ন জাগিল, আমাদের ধর্মে আছে কি? আছে তো শুধু অন্তঃসারশূন্য পূজাপার্ব্বণ ও কুসংস্কারগ্রস্থ ক্রিয়াকলাপ। আর এই নতুন ধর্মে দেখি স্বয়ং ভগবান পিতারূপে মানুষের হৃদয়দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

শিক্ষিত বাঙ্গালী হিন্দু তখন একটু দিশাহারা হইয়া পড়িল।

ঠিক তখনই জাতির ধর্ম্মজীবনের এই সংকটকালে দরিদ্র ক্ষুদিরামের ঘরে পরমহংসদেব জন্মগ্রহণ করিলেন। নিরাশ্রয়ের ঘরে আশ্রয় নিলেন জগতের আশ্রয়দাতা। তিনি জনগণের ভাষাতেই সত্যধর্মের গূঢ়তত্ত্ব জনগণকে বুঝাইয়া দিলেন। ধর্ম্মের, জাতির সংকটমোচন হইল। হিন্দু আপন ধর্ম্মের সত্যরূপ আবার নূতন করিয়া বুঝিতে পারিল এবং তাহার পর স্বামীজী আসিয়া এই মহান ধর্ম্মকে বিশ্বময় ছড়াইয়া দিলেন।

মনোমোহন গোঁসাই-এর কাছে এই যুগবাণী পৌঁছিয়া গিয়াছিল। তাই তাঁহার পক্ষে ঐ রামকৃষ্ণ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হইয়াছিল।

কিন্তু পরমহংসদেবের আবির্ভাবের শতবর্ষ পরেও আজিও আমাদের হিন্দুধর্ম্ম সংস্কৃত ভাষাকে ত্যাগ করিতে পারে নাই। ইহার প্রতিকার দরকার। ইংরাজ বাইবেলকে গ্রীক ভাষা হইতে মুক্ত করিয়া জনসাধারণের পক্ষে সহজবোধ্য, তাহাদের মাতৃভাষা ইংরাজীতে প্রচার করিয়াছে। ইহাতে ইংরাজ জাতির অনেক উপকার হইয়াছে। আমাদেরও মুক্তির দরকার। আমাদের সমস্ত ধর্মপুস্তক বাংলাতে অনূদিত হওয়া প্রয়োজন। আমাদের বোধগম্য ভাষাতে আমাদের ধর্মকে নবরূপ ধারণ করাইতে হইবে, তাহলেই আমাদের দেশের মানুষ বালক বয়স হইতেই এই মহান ধর্মের মহিমা ও মূলতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে।

বাঙ্গালী জাতির ধর্মজীবনে এরূপ আর একটি সংকটকাল আসিয়াছিল পাঁচশত বৎসর পূর্বে, যাহার ফলে মহাপ্রভু নিমাই-এর আবির্ভাব। উচ্চ বর্ণের হিন্দুদিগের অত্যাচারে সমগ্র জাতি, বিশেষ করিয়া নিম্ন বর্ণের হিন্দুগণ দলে দলে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিতে-

ছিলেন এবং ইহা বিশেষরূপে ঘটিতেছিল পূর্ব্ববঙ্গে যেখানে শাহ জালাল ও বাবা আদম নামক দুইজন মুসমান পীর ইসলামের মহিমা প্রচার করিয়া বেড়াইতেছিলেন। নিমাই এই সময় আসিয়া প্রেমের বন্যায় সারা বাংলা তথা উড়িষ্যা প্লাবিত করিলেন এবং আপামর সমগ্র জাতিকেই নাম সংকীর্ত্তনের অধিকার দিলেন। ধর্ম্মাচরণের জন্য তিনি উচ্চ বা নীচ বর্ণের কোন প্রভেদ রাখিলেন না। ধর্ম রক্ষা পাইল, কিন্তু ইহার জন্য তাঁহাকে জীবন বলি দিতে হইল। নীম্নবর্ণীয়দের নাম সংকীর্ত্তনের অধিকার দেওয়াটা পুরীর পুরোহিত সম্প্রদায়ের একেবারে পছন্দ হইল না। ফলে একদিন মহাপ্রভুকে পুরীর মন্দিরের সোপান বহিয়া উঠিতে দেখা গেল কিন্তু নামিতে আর দেখা গেল না। ভক্তেরা বলেন, মহাপ্রভু এই ভাবেই জীবন হইতে মহাজীবনে বিলীন হইয়া গেলেন। কিন্তু অপরে বলেন, তাঁহার এই বিলীন হইবার অন্তরালে পুরোহিতদের কিছু হাত ছিল।

চৈতন্যদেবের ধর্মপ্রচার ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ধর্মপ্রচারের মধ্যে কিছু পার্থক্য ছিল। চৈতন্যদেব প্রধানতঃ নীচ জাতিয়দের মধ্যেই ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার ধর্মমত প্রচার করিয়াছিলেন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে। এই প্রভেদের কারণ হইল, ধর্মরক্ষার জন্য চৈতন্যদেবের সময়ে নীচ বর্ণের সমাজকেই ধর্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। আবার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সময়ে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের মনে হিন্দুধর্মকে সংস্থাপিত করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। তবে সন্দেহ নাই যে, এই দুই মহামানবই হিন্দুধর্মের দুই সংকট মুহূর্ত্তে আবির্ভূত হইয়া ধর্মকে বিনাশের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন।

আমার পরম সৌভাগ্য যে শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের পূজনীয় ব্যক্তিদের অনেকের সঙ্গেই আমার দর্শন লাভ হইয়াছিল। ১৯১৬ সালে গৌরীমার সহিত কুচবিহারে আমার দেখা হইয়াছিল। ১৯১৭ সালে ঠাকুরের তিথি উৎসবে আমি বেলুড় মঠে গিয়াছিলাম। তখন সেখানে মহাপুরুষেরা অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী শিবানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী সারদানন্দের কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে। বোধ হয় স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ও স্বামী অদ্ভূতানন্দও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আরও অনেকে ছিলেন কিন্তু আমি তাঁহাদের চিনিয়া উঠিতে পারি নাই। ১৯১৮ সালে শ্রীশ্রীমার দর্শন লাভ হয় বাগবাজারের বাসাবাড়ীতে। আমার বৌদি চারুবালা সেন শ্রীশ্রীমার কাছে দীক্ষা লাভ করেন। আমি তাঁহাকে বাগবাজারে শ্রীশ্রীমার কাছে পৌঁছাইয়া দিতে গিয়াছিলাম। পরে কলিকাতায় এক চন্দ্রগ্রহণ উপলক্ষে আমি কাশীমিত্র ঘাটে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর তত্ত্বাবধান করিবার সময়ে স্বামী অভেদানন্দের দর্শন লাভ করিয়াছিলাম। তাহার কিছু পূর্বে বহু বৎসর পরে ভারতে প্রত্যাগমনের পর স্বামীজীকে University Institute-এ অভ্যর্থনা করা হইয়াছিল, আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। ১৯২৪ সালে রামকৃষ্ণ মিশনের Chief Medical Officer-রূপে গঙ্গাসাগর মেলায় পশুপতি মহারাজের সহিত একত্রে যাই। সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া বেলুড়ে গিয়া Miss Josephine-এর সহিত দেখা হয়। ১৯৩২/৩৩ সালে স্বামী পরমানন্দ আমেরিকা হইতে ফিরিয়া কয়েক দিনের জন্য দিল্লী আসিয়াছিলেন। দিল্লীর টাল-কাটোরা ক্লাবে তাঁহাকে দিয়া কতিপয় বক্তৃতার বন্দোবস্ত করিয়াছিলাম। দিল্লীর রামকৃষ্ণ আশ্রম গঠনে স্বামী সর্ব্বানন্দের সহিত অল্প দিনের জন্য কাজ করিবার সৌভাগ্য

হইয়াছিল। পরবর্ত্তী জীবনে মিশনের সংস্পর্শে নানা কারণে আমার আসা হয় নাই। জীবনের শেষে আজ আমি স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীর আশ্রয়ে আসিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি। কৈশোরে মনোমোহন গোঁসাই-এর রামকৃষ্ণ আশ্রমে যে জীবন আরম্ভ করিয়াছিলাম, আজ এখানে যেন সে জীবনের শেষ হয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

(ক) গ্রামে শিক্ষা-ব্যবস্থা: সংস্কৃত টোল, জাতীয় বিদ্যালয় তথা জাতীয় আন্দোলন।

আমাদের সময়ে (১৯০০—১৯২৫ খৃঃ) গ্রামে শিক্ষা ব্যবস্থা বেশ উঁচু ধরণের ছিল। ছেলেদের জন্য একটি হাইস্কুল, তিনটি পাঠশালা, একটি সংস্কৃত টোল এবং মেয়েদের জন্য একটি পাঠশালা ছিল। ইহা ছাড়া কবিরাজ দীনবন্ধু রায় ও কবিরাজ ললিতমোহন দাস নিজেদের বাড়ীতেই ছাত্রদের কবিরাজী শিক্ষা দিতেন।

যতদূর জানি ১৮৮০-৮৫ খৃঃ মধ্যে গ্রামের ডাকঘরের নিকটে বৈকুণ্ঠ রায় মহাশয় একটি পাঠশালা স্থাপন করিয়াছিলেন। তারিখ সম্বন্ধে আমার অনুমানের ভিত্তি, অবশ্য গ্রামে প্রচলিত একটি কাহিনী যাহা আমি পরে এক জায়গায় লিখিয়াছি। এই পাঠশালার ছাত্র হরিপ্রসন্নকে বাঘে কামড়াইয়াছিল এবং এই পাঠশালারই মাষ্টার জগদীশ সেন এই বাঘের কামড়েই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন।

হরিপ্রসন্ন দাসকে আমরা যে বয়সে দেখিয়াছি তাহাতে মনে হয় তাহার পাঠশালায় যাইবার বয়স ঐ ১৮৮০-৮৫ সালেই হইবে। যাহাই হউক, বৈকুণ্ঠ রায় মহাশয়ের চেষ্টাতেই ঐ পাঠশালা পরে মিডল ইংলিশ স্কুলে পরিণত হয়। এই স্কুল সম্বন্ধে শ্রীপ্রফুল্ল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন, "আমি সাত বৎসর বয়সে সোনারং এম-ই স্কুলে ভর্ত্তি হই। প্রফুল্লবাবুর বয়স এখন ৮৫ বছর। সোনারং মাইনর স্কুল বিক্রমপুরের সর্বশ্রেষ্ঠ স্কুল ছিল। প্রতি বছরই শেষ সরকারী পরীক্ষায় এই স্কুল হইতে একজন কৃতি ছাত্র বৃত্তি পাইত। এই বিদ্যালয় স্থাপনা করিবার সময় বৈকুণ্ঠ রায় মহাশয় একটি পোষ্ট অফিসও স্থাপন করেন এবং এই ডাকঘরটিই সারা বিক্রমপুরে প্রথম ডাকঘর। বৈকুণ্ঠবাবুর মৃত্যুর পর লস্কর বাড়ীর রত্নেশ্বর সেন ও শশীকুমার সেনের উদ্যোগে বিদ্যালয়টি হাইস্কুলে পরিণত হয় ১৯০১ খৃষ্টাব্দে। প্রথম স্কুলটি বৈকুণ্ঠ রায়ের গৃহের নিকটবর্ত্তী স্থানে তাঁহারই দেওয়া জমিতে স্থাপিত হয়। পরে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বিদ্যালয়টি "কাউথ্যার বাড়ীতে" স্থানান্তরিত হয়। নতুন বিদ্যালয়ের জন্য জমি দিয়াছিলেন তারক সেনের জ্যেঠামশাই বিশ্বম্ভর সেন অতি অল্প মূল্যে।

নতুন বাড়ী তৈয়ার করা, আসবাবপত্র তৈয়ার করা ও স্কুল চালাইবার যাবতীয় খরচ ঐ লস্কর বাড়ী হইতেই দেওয়া হইয়াছিল। প্রথম দশ বৎধর স্কুলের পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব লস্কর বাড়ীকেই দেওয়া হইয়াছিল এবং তাঁহারা সুষ্ঠুভাবেই তাঁহাদের কর্ত্তব্য পালন করিয়াছিলেন। প্রথম দিকে শশীকুমার সেনই সকল দিক দেখাশুনা করিতেন। পরে তাঁহার মাতার মৃত্যুর পরে তিনি গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া যান। পরবর্ত্তী কালে রত্নেশ্বর সেন এই ভার নিলেন, কিন্তু তিনি মুন্সীগঞ্জে থাকিতেন

বলিয়া তাঁহার ভাইপো নির্ম্মল ও শীতলই গ্রামে থাকিয়া বিদ্যালয় পরিচালনার কাজ দেখাশুনা করিতেন। প্রথমে এই এইচ-ই স্কুলে হেডমাষ্টার হন কালিকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। পরে রত্নেশ্বর সেনের ভাগিনেয় অবনীমোহন সেন এই পদ লাভ করেন। মাঝে অবশ্য কিছু দিনের জন্য হেডমাষ্টার হইয়াছিলেন কুরমিরা গ্রামের কালিকুমার গুপ্ত। প্রথম প্রবেশিকা পরীক্ষা হয় ১৯০২ সালে এবং ইহাতে কৃতকার্য্য হয় রত্নেশ্বর সেনের ভাগিনেয় অমৃতলাল মজুমদার। দ্বিতীয় বার ১৯০৩ খৃঃ, রত্নেশ্বর সেনের ভ্রাতুষ্পুত্র অতুল সেন পাশ করে। এই অতুল সেন পরে ইণ্ডিয়ান এডুকেশন সার্ভিস-এ যোগদান করিয়া ডি-পি-আই হইয়া অবসর গ্রহণ করেন। অমৃতলাল মজুমদার পরে কলিকাতায় একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ এ্যাডভোকেট হইয়াছিলেন। স্কুল ভালই চলিতেছিল। কিন্তু বোধ হয় ১৯০৭ খৃঃ মাখন সেন আসিয়া গ্রামে জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং বহু ছাত্র এই স্কুলে যোগদান করে। ক্রমে পুরাতন বিদ্যালয়টি অত্যন্ত দুর্দ্দশাগ্রস্থ হইয়া পড়ে। রত্নেশ্বর সেনও স্কুলের কর্তৃত্ব ছাড়িয়া দেন। কিন্তু এই সময় একটি লোকের তৎপরতায় স্কুলটি নিশ্চিত মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পায়, তিনি মুন্সীপাড়ার গোলক সেন মহাশয়ের দৌহিত্র জিতেন্দ্রনাথ মজুমদার। তাঁহার বাড়ী ছিল পার্শ্ববর্ত্তী বালিগাঁও গ্রামে কিন্তু তিনি বাস করিতেন মাতুলালয়ে সোনারঙ্গে। স্কুলের তৎকালীন চারজন শিক্ষক, গ্রামের কালিকিশোর বাড়ড়ী, পুরাপাড়ার চন্দ্রকান্ত ঘটক, খিলপাড়ার মধুসূদন বাড়রী ও আটপাড়ার হরিহর গাঙ্গুলী সমবেত ভাবে রত্নেশ্বর সেনের হাত হইতে বিদ্যালয় পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। স্কুলের অবস্থা তখন টলটলায়মান। স্কুলে হেড মাষ্টারও ছিলনা, সেক্রেটারিও নহে। তদুপরি শিক্ষকগণের মধ্যে প্রতি বিষয়ে

মতভেদ হওয়াতে অবস্থা আরও খারাপ করিয়া তোলে। চারজনই আপন আপন মতানুযায়ী কার্য্য করিতে লাগিলেন। মাহিনা আদায় করা, শিক্ষকদের বেতন বণ্টন করা ইত্যাদি এবং প্রতি ঘণ্টায় প্রতি ক্লাসে কোন না কোন লোককে অধ্যাপনা করিতে পাঠাইয়া তিনি স্কুল চালাইতে লাগিলেন। এমন কি, কখনও কোন মাষ্টারের অভাব হইলে উপরের ক্লাসের ছাত্রদের নীচের ক্লাসে পাঠ দিতে পাঠাইতেন। এই ভাবেই তিনি কোন প্রকারে স্কুলের ভারসাম্য রক্ষা করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে ১৯১০/১১ খৃঃ কোন সময়ে গ্রামের স্বনামধন্য অক্লান্তকর্মী অপূর্ব্ব সেন স্কুলের ভার গ্রহণ করিলেন এবং ক্রমে স্কুলের পূর্ব্বাবস্থা ফিরাইয়া আনিলেন। কিন্তু ঐ সময়ে জিতেন মজুমদার না থাকিলে স্কুল নিশ্চিত রূপে বন্ধ হইয়া যাইত। অপূর্ব্ব সেন কার্য্যভার গ্রহণ করিবার পরে জিতেন মজুমদার গ্রাম ছাড়িয়া ঢাকার কোন স্কুলে চলিয়া যান। ঐ সময়ে আমরা নীচের ক্লাসের ছাত্র ছিলাম। অপূর্ব সেন আসিয়াই স্কুলের প্রায় সমস্ত কিছুরই পরিবর্ত্তন সাধন করিলেন। ভাল ভাল শিক্ষক, আশুতোষ সেন এম-এ, ব্রজনাথ সেন বি-এ, নীরেন্দ্রমোহন সেন বি-এ প্রভৃতি নিযুক্ত করিলেন। পড়াশোনাও ভাল হইতে লাগিল। প্রকৃত পক্ষে ঐ সময় হইতে অপূর্ব সেনের মৃত্যু (১৯১৯ খৃঃ) পর্য্যন্ত সময়টাকে বিদ্যালয়ের স্বর্ণযুগ বলা যায়। প্রবেশিকা পরীক্ষার ফলও ভাল হইতে থাকে। এই সময়েই হীরেন্দ্রমোহন সেন ১৫ টাকা ডিভিশনাল বৃত্তি নিয়া এবং ক্ষেত্রমোহন দে ১০ টাকা বৃত্তি নিয়া ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কিন্তু ১৯১৭ খৃঃ কেহ বিদ্যালয় ভবনটি আগুন লাগাইয়া পোড়াইয়া দেয়। এই সময়ই বিক্রমপুরে স্কুলবাড়ী পোড়াইবার একটা হিড়িক আসিয়াছিল। আরও অনেক স্কুল

এই ভাবে ভস্মীভূত করা হইয়াছিল। যাহা হউক অপূর্ব সেনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আবার নতুন করিয়া বিদ্যালয়ের জন্য ইষ্টক নির্মিত ভবন হয়। গ্রামের লোক, বিশেষত রায় বাহাদুর ললিতমোহন সেন এবং কালীমোহন দাস অপূর্ব্ব সেনকে এই বিষয়ে প্রভূত সাহায্য করেন। অপূর্ব সেনের অক্লান্ত চেষ্টায় বিদ্যালয়ের যে উন্নতি হইয়াছিল, তাঁহার মৃত্যুর পর তাহা কোন প্রকারেও ন্যূন হয় নাই বলিয়াই জানি। স্কুলে ছাত্র আসিত পার্শ্ববর্ত্তী সব গ্রাম হইতেই, যেমন আমতলী, টঙ্গীবাড়ী, বরোলিয়া, নাটেশ্বর, বেতকা, খিলপাড়া, পাইকপাড়া, আউটসাহী, নোয়াদ্দা, নেত্রবতী, নয়নন্দ প্রভৃতি। দূরবর্ত্তী স্থান হইতে আগত অনেক ছাত্র কাহারও কাহারও বাড়ীতে গৃহশিক্ষকের কার্য্য গ্রহণ করিয়া আপনার শিক্ষা সমাপ্ত করিত। সমাজের সকল শ্রেণী হইতেই ছাত্রেরা আসিত। তবে সমাজের নিম্ন শ্রেণীর ছাত্রেরা বেশীদিন পড়াশুনা চালাইত না।

ইহা ভিন্ন বালকদের জন্য দুইটি পাঠশালা ছিল। পশ্চিম পাড়ার বিশ্বাস বাড়ীতে ও মধ্যম সরকার বাড়ীতে। পরবর্ত্তী কালে ঐ দুইটি পাঠশালাই উঠিয়া যায় কিন্তু পরে বাড়ুজ্জে বাড়ীতে মনোমোহন গোঁসাই একটি পাঠশালা খুলিয়াছিলেন।

বালিকা বিদ্যালয় ঃ—

বালিকাদের শিক্ষার্থে একটি পাঠলালা এই শতকের শুরুতে আমরা বৈকুণ্ঠ রায়ের বাড়ীতে দেখি। বৈকুণ্ঠ রায়ের স্ত্রী এবং তাঁহার সুযোগ্যা কন্যা দাক্ষায়ণী দেবী ইহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। দাক্ষায়ণী দেবীর জীবদ্দশায় এই পাঠশালাটি ভালো ভাবেই চলিয়াছিল। তখনকার দিনে গ্রামের সমাজ যতটা শিক্ষা মেয়েদের দরকার

বলিয়া মনে করিত, ঠিক ততটা শিক্ষাই এই পাঠশালাতে দেওয়া হইত। পরবর্ত্তী কালে ছোট উত্তর পাড়ার গোবিন্দ সেনের বাড়ীতে একটি বালিকা বিদ্যালয় দেখিয়াছি। গোবিন্দ সেনের জীবনে প্রধান কাজই ছিল, আমরা জানিতাম, এই পাঠশালাটির তত্ত্বাবধান ও পরিচালনা করা। আরও পরে কালীমোহন দাসের স্ত্রী চিন্ময়ী দেবীর উদ্যোগে ১৯২১ খৃঃ "চিন্ময়ী বালিকা বিদ্যালয়" স্থাপিত হয়। প্রথমে উচ্চ প্রাথমিক হিসাবেই উহা প্রতিষ্ঠিত হয়, পরে ইহা নিম্ন মাধ্যমিক শ্রেণীতে উন্নীত হয়। এখানে শিক্ষয়িত্রীদের থাকিবার ব্যবস্থা ছিল।

সংস্কৃত বিদ্যালয় (টোল) :—

জয়ব্রহ্মসারে দীনবন্ধু বিদ্যালঙ্কারের বাড়ীতে একটি সংস্কৃত টোল ছিল। তিনিই ইহার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তিনি কাব্য ও ব্যাকরণ পড়াইতেন। তাঁহার আত্মীয় ও প্রতিবেশী প্রসন্ন শিরোমণিও কাব্য ও ব্যাকরণ পড়াইতেন। এই টোলে গ্রামের ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের ছাত্ররা তো পড়িতই, এমন কি কুমিল্লা, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ প্রভৃতি হইতেও অনেক ছাত্র আসিত। ছাত্ররা সকলে বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের বাড়ীতে থাকিয়া পড়াশুনা করিত। বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র প্রফুল্ল বন্দ্যোপাধ্যায় জানাইয়াছেন যে, এক সময়ে আট-দশজন ছাত্রও তাঁহাদের বাড়ীতে থাকিয়া অধ্যয়ন করিয়াছেন। বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের মৃত্যুর পর এই টোলটি বন্ধ হইয়া যায়।

মুসলমানদের মখতব :—

নয়াবাজারের মসজিদ বাড়ীতে মুসলমানদের একটি মখতব ছিল। স্কুলের মৌলবী সাহেব সেখানে শিক্ষকতা করিতেন।

কবিরাজী শিক্ষা :—

ইহার কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। কবিরাজ দীনবন্ধু রায় ও কবিরাজ ললিতমোহন —ইঁহাদের বাড়ীতে কতিপয় ছাত্র থাকিয়া কবিরাজী শিক্ষা করিতেন।

জাতীয় বিদ্যালয় তথা জাতীয় আন্দোলন :—

১৯০৫ খৃঃ বঙ্গভঙ্গের পর সমস্ত বাংলাদেশে এক বিরাট আন্দোলন আরম্ভ হয়। তখন যাঁহারা শহরে চাকুরী করিতেন বা যে ছাত্ররা শহরে বিদ্যাশিক্ষা করিতেন তাঁহারা ছুটীতে গ্রামে আসিয়া নানা আন্দোলন করিয়া এই স্বদেশী চেতনাকে উজ্জীবিত করিতে চেষ্টা করিতেন। তখন এই আন্দোলন বাংলার ঘরে ঘরে ছড়াইয়া গিয়াছে।

সোনারঙ্গ গ্রামেও এই আন্দোলন পূর্ণভাবে রূপ গ্রহণ করিয়াছিল। নেতাদের নির্দ্দেশক্রমে গ্রামের সকলেই বিদেশী দ্রব্য বর্জ্জন করিয়াছিল। সভা সমিতিতে "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়", "বাজ রে শিঙ্গা বাজ এই রবে", 'মা-ই দেশের রাজা, মা-ই দেশের রাণী" প্রভৃতি স্বদেশী গান এবং নানা শোভাযাত্রা গ্রামের সর্ব্বত্রই হইত। বঙ্গভঙ্গ অমান্য করার প্রতীক স্বরূপ আশ্বিন মাসের সংক্রান্তির দিনে আমরা "রাখীবন্ধন" উৎসব পালন করিতাম। স্বদেশী গান গাহিতে গাহিতে শোভাযাত্রা করিয়া সেদিন গ্রাম-প্রদক্ষিণ করিতাম এবং তাহার পর মুন্সীবাড়ীর মঠবাড়ীতে স্বদেশ মাতৃকার মৃন্ময়মূর্ত্তি পূজা করিতাম। সেদিন প্রতি ঘরে অরন্ধন থাকিত. ষোড়শ শতাব্দীতেই কেবল এই আন্দোলনের তুলনা পাইয়াছি।

যখন নিমাই-এর প্রভাবে নদীয়া তথা সমগ্র বঙ্গদেশ এক অপরূপ ভাবের বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছিল। আবার এই বিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশকে আবার স্বদেশী আন্দোলনের ভাবের ঘোরে উন্মাদ হইতে দেখিলাম।

গ্রামে একটি সুহৃদ সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। আমরা সেখানে লাঠিখেলা শিখিতাম। তামেচা, বাহেরা, শির প্রভৃতি লাঠির মার অভ্যাস করিতাম। মুন্সীপাড়ার অখিল সেন ও ধীরেন সেন ইহার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। আমাদের মধ্যে প্রফেসার প্রমোদ সেন ও বোম্বাই-এর বীরেন সেন লাঠিখেলায় বিশেষ পারদর্শী হইয়া উঠিয়াছিলেন। গ্রামান্তর হইতে নেতারা এবং কর্মীরা আসিয়া প্রায়ই গ্রামে সভাসমিতি করিতেন।

বিদেশী দ্রব্য বর্জ্জন নীতি সকলেই গ্রহণ করিয়াছিল। এই বর্জ্জন নীতির মধ্যে বিলাতী বস্ত্র বর্জ্জনই শীর্ষস্থান অধিকার করে। এই সময়ই গ্রামের রত্নেশ্বর সেন, মহেন্দ্রলাল সেন ও অপূর্ব্বচন্দ্র সেন একটি শিল্পপ্রসারণ সংস্থা (বয়ন শিল্প) স্থাপিত করেন। এই সংস্থা সুরেশচন্দ্র দাশগুপ্তকে বয়নশিল্প শিখিবার জন্য কলিকাতায় প্রেরণ করেন এবং তিনি গ্রামের স্কুলের শিক্ষকতা ছাড়িয়া দিয়া কলিকাতায় গিয়া এক বৎসর কাল বয়ন শিল্প শিক্ষা করিয়া গ্রামে ফিরিয়া আসেন। গ্রামে আসিয়া তিনি কতকগুলি তাঁত ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া গ্রামে তাঁতী ও যুগীদের উন্নত পদ্ধতিতে তাঁত চালাইতে শিখাইতে আরম্ভ করেন। কিন্তু যে কোন কারণেই হউক ইহা বেশীদিন চলিল না। এমন সময় মাখনলাল সেন আসিয়া গ্রামে রাজনীতির মোড় ফিরাইয়া দিলেন। তিনি স্বামী বিবেকানন্দের বাণীর সঙ্গে বিপ্লববাদ প্রচার আরম্ভ করিলেন। এই উদ্দেশ্যে

সোনারঙ্গে একটি বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার কিছু পূর্বে বিখ্যাত বিপ্লবী নেতা পুলিন দাসের বিশেষ বন্ধু, সোনারং উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের শিক্ষক গগনচন্দ্র দাসের নেতৃত্বে সোনারঙ্গেও অনুশীলন সমিতির একটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু এই জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হইবার সময় পূর্ববঙ্গের অনুশীলন সমিতি ছত্রভঙ্গ হইয়া গিয়াছে—পুলিন দাস তখন জেলে। অনুশীলন সমিতির বিক্ষিপ্ত সভ্যগণ তখন মাখন সেনের জাতীয় বিদ্যালয় হইতে নিজেদের কার্য্যকলাপ মাখন সেনের নেতৃত্বেই চালাইতে লাগিলেন (১৯০৮—১৯১১ খৃঃ)। অগ্নিযুগের যে সকল মুক্তিপাগল বিপ্লবী সোনারঙ্গে সমবেত হন, তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন ত্রৈলোক্য চক্রবর্ত্তী, প্রতুল গাঙ্গুলী, শশাঙ্ক হাজরা, আশুতোষ দাসগুপ্ত, রবীন্দ্র সেন, রমেশ আচার্য্য, বীরেন্দ্র সেন (সোনারং), বীরেন্দ্র সেন (নেত্রাবতী), মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, নরেন সেন (নরেন মহারাজ), প্রিয়নাথ সেন (প্রিয় মহারাজ)। ইহারা কেহ শিক্ষক রূপে, কেহ নৌকার মাঝি রূপে, কেহ দিনমজুর রূপে জাতীয় বিদ্যালয়ে বাস করিতেন। তাঁহারা এতই সাবধানতার সহিত কার্য্যকলাপ চালাইয়া যাইতেন যে সরকারের পুলিশ তাঁহাদের ধরিতে পারিত না। তখন বিক্রমপুরে ও বিক্রমপুরের নিকটে স্বদেশী ডাকাতি ও অন্যান্য বিপ্লবাত্মক কার্য্য-কলাপ প্রচুর ঘটিত। রাউতভোগ, হলদিয়া, ভরাকর, গাওদিয়া প্রভৃতি গ্রামে ডাকাতি হইয়াছিল। আমাদের গ্রামে এক রাত্রেই তিনটি রাজনৈতিক হত্যা সংঘটিত হয়—কালিবিনোদ চক্রবর্ত্তী, দফাদার রসুল মিঞা ও তাহার ভাই। ইংরাজের গোয়েন্দা বলিয়া ইহারা কুখ্যাত ছিল। একদিন আমাদের সত্য লস্করের খালি বাড়ীতে অনেক অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া যায়। কিন্তু সরকার এই সব কাজের

কর্ণধারদের ধরিতে পারিত না কিন্তু তাঁহাদের উপর সন্দেহ ছিল। কাজেই গ্রামে পিউনেটিভ পুলিশ বসান হয় অযথা গ্রামবাসীদের উত্যক্ত করিবার জন্য এবং যদি এদের কোন খবর পাওয়া যায়। গ্রামবাসীদের ভয় দেখাইবার জন্য একদিন গ্রামের মধ্য দিয়া ব্লাক-ওয়াচ রেজিমেণ্টকে কুচকাওয়াজ করাইয়া লইয়া গেল। গ্রামের ললিত বারড়ী ও হরেন সেনের (পরে ডাক্তার) পিছনে সর্বদা চারিজন করিয়া পুলিশ পাহারা থাকিত। পরে তাহাদের অন্তরীণ করিয়া রাখা হয়। হেডমাষ্টার অতুল সেন (ভেচকী অতুল) ও হেডমাষ্টার হেমেন্দ্র মুখুটিও বাদ গেলেন না। তাঁহাদেরও অন্তরীণ করিয়া রাখা হয়। বিরাজ সেনকে ফতেজংপুরের গবেশের ভাই প্রিয়ব্রতকে খুনের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়, কিন্তু পরে প্রমাণ অভাবে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়। গবেশ ইংরাজের গুপ্তচর ছিল কিন্তু ভুলক্রমে তাহার ভাই প্রিয়ব্রত নিহত হয়। এত করিয়াও সরকার জাতীয় বিদ্যালয়ের কিছুই করিতে পারিল না। পরে একরকম জোর করিয়াই ইহাকে ভাঙ্গিয়া দেয়। অজুহাত ছিল, গুজমুদ্দিন নামে গ্রামের এক ডাক-পিয়নের উপর জাতীয় বিদ্যালয়ের লোকেরা রাহাজানি করিয়া তাহার সরকারী ব্যাগ ইত্যাদি ছিনাইয়া নিয়াছে।

বস্তুতঃ বাংলাদেশের জাতীয় আন্দোলন ও বৈপ্লবিক কার্য্য-কলাপের মধ্যে সোনারং একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল। রাউলাট সাহেব তাঁহার রিপোর্টে সোনারংকে বাংলার বৈপ্লবিক আন্দোলনের একটি মুখ্যকেন্দ্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। এই রিপোর্টের কিছু অংশ আমি এই অধ্যায়ের শেষে দিয়াছি।

জাতীয় বিদ্যালয় ভাঙ্গিয়া যাইবার আগেই মাখম সেন

গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া যান। পরে তাহাকে অনেক দিন অন্তরীণ থাকিতে হইয়াছিল। প্রসঙ্গতঃ এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে মাখন সেনের ভ্রাতুষ্পুত্র শচীন সেন (দেবেন সেনের পুত্র) বিখ্যাত আলিপুর বোমার মামলায় একজন আসামী ছিলেন। মুক্তি পাওয়ার পর তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী হইয়া যান।

বৈপ্লবিক কার্য্য করাই কিন্তু জাতীয় বিদ্যালয়ের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল জাতিকে জাতীয় উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া এবং সেই ভাবে কাজও আরম্ভ হইয়াছিল। ১৯০৮ সালে বিদ্যালয় স্থাপিত হয় কিন্তু ১৯১১ সালেই উঠিয়া যায়। এই বিদ্যালয় হইতে দুইটি ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করে, একজন আমাদের গ্রামের বীরেন্দ্রনাথ সেন ও অপরজন পাশের নেত্রবতী গ্রামের বীরেন্দ্রচন্দ্র সেন। কিন্তু এই বিদ্যালয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা স্বীকৃত বিদ্যালয় ছিল না। কিন্তু যাদবপুরে তখন জাতীয় মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, কলিকাতা স্বীকার না করিলেও এখানে ইহাদের স্নাতক শ্রেণীতে ভর্ত্তি করা যাইত। কিন্তু এই মহাবিদ্যালয়ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা স্বীকৃত ছিল না। পরে এই মহাবিদ্যালয়ই বর্ত্তমানের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। আমাদের গ্রামের বীরেন্দ্রনাথ সেন এই যাদবপুর মহাবিদ্যালয় হইতে বি-এস-সি পাশ করিয়া পরবর্ত্তী কালে বোম্বাই সহরে বিশেষ প্রতিষ্ঠিত জীবন যাপন করিয়াছেন। তিনি তখনকার দিনের জি-আই-পি রেলওয়ের ডেপুটি চীফ কেমিস্ট হইয়া অবসর গ্রহণ করেন।

(খ) বাংলার বৈপ্লবিক আন্দোলন (১৯১৮ সাল পর্য্যন্ত) :—

১৯০৫ খৃঃ। কার্জন বাংলাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিলেন। সেই আরম্ভ। সমস্ত বাংলাদেশের বুকে এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটিয়া গেল। বিপ্লবের বহ্নিশিখা হুহু করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। নব বিভক্ত দেশের দুই ভাগেই বিশেষতঃ পূর্বভাগে প্রবল অসন্তোষ ধূম্রাকারে আকাশ ছাইয়া ফেলে। বিদেশী বর্জ্জন ও স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের আন্দোলন বাঙ্গালীদের প্রধান কর্ত্তব্য হইয়া ওঠে। আরম্ভ হয় স্বদেশী আন্দোলন। বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দে মাতরম" গান জাতির নিকট মহামন্ত্র হইয়া ওঠে। সমস্ত বিদ্যালয়ে ও অন্যান্য শিক্ষা-কেন্দ্রে যুগাবতার রামকৃষ্ণ পরমহংস ও বিবেকানন্দের বাণী প্রচারিত হইতে থাকে। শ্রীমদ্ভাবত গীতার অমর বাণী বাংলার নব যৌবনকে নতুন করিয়া প্রেরণা দেয়। যাহাই হউক, আন্দোলনটি প্রধানতঃ হিন্দুদেরই ছিল এবং সাধারণতঃ মধ্যবিত্ত ভদ্রসমাজ হইতে এ আগুন ইন্ধন আহরণ করিয়া এই আবর্ত্তের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

ক্রমে আন্দোলনের রূপ পরিবর্ত্তন হইতে থাকে। রাশিয়ার জাপানের নিকট পরাজয়, বালগঙ্গাধর তিলকের শিবাজী উৎসবকে বঙ্গে আনয়ন, বঙ্কিমের আনন্দমঠ প্রভৃতি এই রূপ পরিবর্ত্তনের সহায় হয়। ভবানীর মন্দির, মুক্তি কোন পথে, বর্ত্তমান রাজনীতি জাতিকে উদ্দীপনা দিতে থাকে। লোক বুঝিতে চেষ্টা করে শুধু আবেদন নিবেদনে কাজ হইবে না, আমাদেরও চেষ্টা করিতে হইবে। শক্তির অধিষ্ঠাত্রী মহাকালী ভবানীর পূজা করিতে হইবে। মুক্তির নতুন পথ দেখিতে পাইয়া জাতি উদ্দীপিত হইয়া ওঠে। যুগান্তর, সন্ধ্যা, বন্দে মাতরম, নবশক্তি প্রভৃতি পত্রিকা ও স্বাধীন ভারত নামে

ধারাবাহিক প্রবন্ধ আন্দোলনের গতি ফিরাইয়া দেয়। আরম্ভ হয় দেশজননীর নতুন পূজা রক্ততর্পণ।

কলিকাতা ও ঢাকায় সংস্কৃতি ও শিক্ষার উন্নতির জন্য অনুশীলন সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। একটি কেন্দ্র উত্তর বঙ্গেও স্থাপিত হয়। অবশ্য বেশ কিছুদিন পরে এই সমিতির সদস্যগণই বিপ্লব পন্থা অবলম্বন করে। ইহা বোধ হয় ১৯০৬ খৃঃ কথা। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, ইহার পূর্ব্বে ১৯০৫ খৃঃ নেতাগণ সুহৃদ্ সম্প্রদায় নামক এক সমিতি গঠন করিয়াছিলেন কিন্তু এই দুইয়ের মধ্যে প্রবলতর ছিল অনুশীলন সমিতি। রাউলাট কমিটি এই অনুশীলন সমিতি সম্বন্ধে বলিয়াছে যে যদি অন্যান্য সমিতিগুলো নাও থাকিত, তাহা হইলেও এক অনুশীলন সমিতিই সরকারের পক্ষে বিশেষ বিপদের কারণ হইত। কালক্রমে এই সমিতি বাংলাদেশের সর্বত্র শাখা বিস্তার করে। উত্তর পশ্চিমে দিনাজপুর হইতে দক্ষিণ পূর্বে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত, উত্তর পূর্বে কুচবিহার হইতে দক্ষিণ পশ্চিমে মেদিনীপুর পর্য্যন্ত অনুশীলন সমিতির কার্য্যকলাপ বিস্তৃত ছিল। পরে প্রায় সমগ্র ভারতেই ইহা বিস্তার লাভ করিয়াছিল।

ঢাকা কলেজের অধ্যাপক পুলিনবিহারী দাস ঢাকায় অনুশীলন সমিতি স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহার সদস্য সংখ্যা ছিল পাঁচ শত কিন্তু ইহার সমর্থক ছিল অসংখ্য। পূর্ববঙ্গে ইহার অনেক শাখা সমিতি ছিল। বিপ্লবীরা চাহিয়াছিলেন বিপ্লবের পথে দেশ স্বাধীন করিতে। কিন্তু তাহাতে প্রথম প্রয়োজন অর্থ। এই অর্থ তাহারা ডাকাতি করিয়া সংগ্রহ করিতেন। দ্বিতীয়তঃ তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল ঐ অর্থে আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ করিয়া ইংরাজ ও তাহার সাহায্যকারীদের হত্যা করিয়া সরকারের মনে ভীতি উৎপাদন করিতে

হইবে এবং তাহার ফলে ইংরাজ দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে। এই সব ডাকাতি ও হত্যাকে রাজনৈতিক ডাকাতি ও হত্যা হিসেবে পরিগণিত হইত। এবং অনেকে এই বিপ্লববাদকে "সন্ত্রাসবাদ" নামে অভিহিত করিতেন। ১৯০৬ খৃঃ হইতে ১৯১৬ খৃঃ পর্য্যন্ত দেশে দুই শত দশটি ডাকাতি ও হত্যা সংঘটিত হয় এবং তাহারই ফলে রাউলাট সাহেবের সভাপতিত্বে "সিডিসন" কমিটি গঠিত হয়।

১৯০৮ খৃঃ পুলিনবিহারী দাস অন্তরীণ হইলে ঢাকা অনুশীলন সমিতিতে ভাঙ্গন দেখা দেয়। কিন্তু ততদিনে সোনারঙ্গে জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। অধ্যক্ষ ও প্রতিষ্ঠাতা মাখনলাল সেন তখন অনুশীলন সমিতির কার্য্যভার গ্রহণ করেন এবং এই স্কুল হইতেই বাংলার বৈপ্লবিক কার্য্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত হইতে থাকে। ১৯১০ খ্রীঃ পুলিন দাস মুক্তি পাইয়া আবার কার্য্যভার গ্রহণ করেন। কিন্তু সেই বৎসরই আবার তিনি ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেপ্তার হন এবং ১৯১২ খ্রীঃ তাঁহার জেল হইয়া যায়। তখন অনুশীলন সমিতি ঢাকা হইতে কলিকাতায় ইহার প্রধান কার্য্যালয় স্থানান্তরিত করে এবং সেখানে মাখনলাল সেন আবার ইহার নেতৃত্ব ভার গ্রহণ করেন।

বাংলার বৈপ্লবিক কার্যকলাপ আরম্ভ হয় ১৯০৮ খ্রীঃ যখন ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী ভুলক্রমে মিসেস ও মিস কেনেডিকে হত্যা করে। ইহার বিবরণ পরে "বিহার" অধ্যায়ে লিখিয়াছি। তাহার পরে সমগ্র বাংলাদেশে ইহা বিস্তৃত হইয়া পড়ে। দশ বৎসর পর্য্যন্ত এই রক্তঝরা বিপ্লববাদ বাংলা তথা ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রকে পরিব্যাপ্ত করিয়া রাখিয়াছিল। ইহা শুধু গান্ধীজীর আগমনের পরেই স্তিমিত হইয়া পড়ে।

এই বিপ্লবের ধারাবাহিক বিবরণ এখানে দেওয়া সম্ভব নহে। তবে কিছু প্রধান ঘটনার উল্লেখ এখানে করিব। এই ঘটনাগুলিই তখনকার যুগে সমস্ত দেশে প্রচণ্ড আলোড়ন আনিয়াছিল। প্রতিটি ঘটনা বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে অমর হইয়া রহিয়াছে। প্রথমটি হইল আলিপুর বোমার মামলা (১৯০৮), কানাই, সত্যেন কর্ত্তৃক নরেন গোঁসাইকে হত্যা (১৯০৮), রডা কোম্পানীর ঘটনা (১৯১৪) ও বালেশ্বরের যুদ্ধ (১৯১৫)। সমগ্র বিপ্লবের ধারাবাহিক ইতিহাসের উপর বহু পুস্তক রচনা করা হইয়াছে। আমি তাই কেবল এই কয়টি ঘটনারই উল্লেখ করিলাম।

১৯০৮ খৃঃ। আলিপুর বোমার মামলা। এই মামলায় প্রধানতঃ শ্রীঅরবিন্দেরই কথা। উনবিংশ শতকের শেষ ভাগে যে সব নীরব কর্মী দুর্ভাগা দেশের জন্যে কাজ করিতেছিলেন, অরবিন্দ তাঁহাদেরই একজন। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন স্বাধীনতা কেহ দান স্বরূপ দেয় না, ক্ষমতাদীপ্ত উদ্ধত রাজপুরুষের হাত হইতে উহা ছিনাইয়া লইতে হয়। এই উদ্দেশ্যে দেশে নানা গুপ্ত সমিতি স্থাপিত হয়। পুণাতে বিপ্লবী বীর ঠাকুর সাহেবের গুপ্ত সমিতি ছিল। ১৮৯৭ খৃঃ অরবিন্দ যখন বরোদাতে কাজ করিতেছিলেন, তখনই তিনি এই সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। তাহার পর ১৯০২ খৃঃ অরবিন্দ বাংলাদেশে আসিয়া "মেদিনীপুর বিপ্লব কেন্দ্র" গঠন করিলেন। ভ্রাতা বারীন ঘোষ তাঁহার প্রধান সহকর্মী ছিলেন। একটি অতি অনুগত যুবকদল জুটিল। অরবিন্দ ইহাদের নিয়া স্বদেশ মুক্তির মহাযজ্ঞে আত্মাহুতি দিবার জন্যে মনপ্রাণ নিয়োগ করিয়া প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। সে যুগের ইতিহাস বার বার ইহাই প্রমাণ করিয়াছে যে অরবিন্দই ভারতে বৈপ্লবিক আন্দোলনের হোতা।

বঙ্গভঙ্গের পরই পাকাপাকি ভাবে বরোদার চাকুরীতে ইস্তফা দিয়া তিনি বাংলায় চলিয়া আসেন এবং কলিকাতাকে তাঁহাদের কার্য্যকলাপের কেন্দ্র করেন। প্রথমেই তিনি "যুগান্তর" নামক এক বাংলা দৈনিক বাহির করিয়া আপন জ্বালাময়ী ভাষায় দেশবাসীকে বিপ্লব মন্ত্রে দীক্ষিত হইবার জন্য আবাহন জানাইলেন। কিন্তু সরকারের হস্তক্ষেপে "যুগান্তর" বন্ধ হইয়া গেল। বিপিন পাল তখন "বন্দেমাতরম" পত্রিকার সম্পাদক। অরবিন্দ তাঁহার সহিত হাত মিলাইলেন। আবার তাঁহার অগ্নিত্‍গারী ভাষা বিপ্লবের বীজমন্ত্র দেশবাসীর অন্তরে ছড়াইতে লাগিল। সরকার আবার রাজদ্রোহী প্রবন্ধের রচয়িতা বলিয়া অরবিন্দকে অভিযুক্ত করিল। কিন্তু বিপিন পাল অরবিন্দের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে রাজী হইলেন না। ফলে আদালত অবমাননার দায়ে তাঁহার ছয় মাস জেল হইল কিন্তু অরবিন্দ মুক্তি পাইলেন। এই দেশসেবাকে লক্ষ্য করিয়াই রবীন্দ্রনাথ গাহিয়াছিলেন, "অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার! হে বন্ধু, হে দেশবন্ধু, স্বদেশ আত্মার বাণীমূর্ত্তি তুমি।" কিন্তু অরবিন্দের এই মুক্তি ক্ষণস্থায়ী হইল। পর বৎসরই শ্রীঅরবিন্দ পঁয়ত্রিশজন যুবকসহ আলিপুর বোমার মামলায় রাজদ্রোহের অপরাধে অভিযুক্ত হইলেন। অরবিন্দের কৌঁসুলী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তাঁহার অন্তরস্পর্শী ভাষায় বলিলেন :—

"My appeal to you therefore is that a man like this who is being charged with the offence with which he is being charged, stands not only before the bar of this Court but before the bar of the High Court of History and my appeal to you is this that long after this controversy will be hushed in silence,

long after this turmoil, this agitation will have ceased, long after he is dead and gone, he will be looked upon as the poet of patriotism, as the prophet of nationalism, and as the lover of humanity, long after he is dead and gone, his words will be echoed and rechoed not only in India but across the distant seas and lands."

আদালতে এই বলিয়া চিত্তরঞ্জন তাঁহার বক্তব্য শেষ করেন। আদালত নিস্তব্ধ। বিচারক ছিলেন মিষ্টার বীচ্ ক্রফট। তিনি আই-সি-এস পরীক্ষায় অরবিন্দের তিন চার স্থান নীচে ছিলেন।

১৯০৯ খৃঃ বিচারের রায় বাহির হয়। অরবিন্দ কয়েকজন সঙ্গীসহ মুক্তি পান এবং বাকী সকলের সাজা হয়।

কিন্তু দীর্ঘদিন জেলে থাকার দরুণ অরবিন্দের মনে এক বিরাট পরিবর্ত্তন আসিয়াছিল। জেলের ক্ষুদ্র কক্ষে তিনি গীতা উপনিষদ প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিতেন। সেই অন্ধকার কক্ষেই তিনি আদিত্যবর্ণ মহাপুরুষের দর্শন পাইলেন। তাঁহার মন দিগন্তব্যাপী বিকশিত ও প্রসারিত হয়। তিনি অনুভব করিলেন কেবল বিপ্লবেই তাঁহার আত্মিক ক্ষুধা মিটিবে না। তাঁহার প্রয়োজন বৃহত্তর জীবনের আদর্শধারা, পরমাত্মার আরাধনায় তিনি নিজেকে নিঃশেষ করিতে চাহিলেন। বৃটীশ ভারত তাঁহার পক্ষে বিপজ্জনক। তাই ফরাসী এলাকা পণ্ডিচেরীতে গিয়া আশ্রম করিয়া সেখানেই তিনি বাকী জীবন ধ্যান সাধনায় কাটাইয়া দেন। ১৯০৯-এর পর হইতে বিপ্লবী হইলেন ঋষি অরবিন্দ।

কিন্তু যাইবার পূর্ব্বে তিনি যে বীজ রোপণ করিয়া গেলেন, কালক্রমে তাহাই মহান মহীরুহের আকার ধারণ করে। তাঁহার

বিপ্লববাদ বাংলা দেশের রাজনৈতিক চিন্তাধারাকে শক্ত বুনিয়াদের উপর স্থাপন করে। বাংলার বিপ্লবের তিনিই ছিলেন স্রষ্টা।

দ্বিতীয় ঘটনাও ১৯০৮ খ্রীঃ। আলিপুর বোমার মামলায় ধৃত আসামী নরেন্দ্রনাথ গোস্বামী (নরেন গোঁসাই) দলের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া আদালতে রাজসাক্ষী বা 'অ্যাপ্রুভার' হইতে স্বীকৃত হইল। ফলে তাহাকে অন্যান্য আসামী হইতে পৃথক করিয়া পুলিশের রক্ষণাবেক্ষণের মধ্যে রাখা হইল। কিন্তু দলের লোকেরা তাহার কথা জানিতে পারিয়া স্থির করিল এই ঘৃণ্য বিশ্বাস-ঘাতকতার দণ্ড দিতে হইবে। বাহির হইতে বিচিত্র উপায়ে পিস্তল আনাইল। এখন সুযোগ প্রয়োজন। নরেন্দ্রনাথ হঠাৎ অসুস্থ হইয়া জেল হাসপাতালে ভর্ত্তি হইল। অপূর্ব্ব সুযোগ হইল। কানাইলাল ও সত্যেন আরও অপর দুইজন বিপ্লবী তাহাকে জেল-হাসপাতালেই গুলি করিয়া হত্যা করিলেন এবং পরে ফাঁসীর মঞ্চে দুইজন বীর মৃত্যু বরণ করিলেন।

তৃতীয় ঘটনা ঘটে ১৯১৪ খৃঃ। কলিকাতার বিখ্যাত আগ্নেয়াস্ত্র বিক্রেতা মেসার্স রডা এ্যাণ্ড কোম্পানী। ১৯১৪ খৃঃ আগষ্ট মাসে এই কোম্পানীর নামে পঞ্চাশ বাক্স আগ্নেয়াস্ত্র আসে। কিন্তু উনপঞ্চাশটি বাক্স খালাস হইবার পর পঞ্চাশতম বাক্সটি আর পাওয়া যায় না। বাক্স তো উধাও হইলই, সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল কোম্পানীর যে বাবুটি মাল খালাস করাইতেছিলেন, তিনিও বেপাত্তা হইয়া গিয়াছেন। বোঝা গেল তিনি বিপ্লবীদলের লোক ছিলেন এবং সুযোগমত কিছু অস্ত্র ও গুলি সরাইবার মতলবেই কোম্পানীতেই ছদ্মনামে চাকুরী নিয়েছিলেন। যাহাই হউক, এই বাক্সটিতে পঞ্চাশটি অতি উৎকৃষ্ট ধরণের "মশার" পিস্তল ছিল। এই উৎকৃষ্ট অস্ত্র

বিপ্লবীদের হাতে আসায় তাহাদের অত্যন্ত সুবিধা হইয়া যায়। পরে প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে ইহার পরে যতগুলি ডাকাতি ও হত্যাকাণ্ড ঘটিয়াছে, প্রায় সবগুলিতেই এই অস্ত্র ব্যবহার করা হইয়াছে। অবশ্য পরে এর অনেকগুলিই বিপ্লবীদের হাত হইতে উদ্ধার করা হইয়াছিল।

তাহার পর ১৯১৫ খৃঃ। জার্মানীর সহায়তায় দেশময় মহাবিপ্লবের দ্বারা স্বাধীনতার পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনার প্রধান রচয়িতা ছিলেন রাসবিহারী বসু, নরেন ভট্টাচার্য্য ওরফে মার্টিন ওরফে মানবেন্দ্রনাথ রায়, অবনী মুখার্জী, যতীন মুখার্জী ওরফে বাঘা যতীন, পিংলে এবং হরদয়াল। পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল জার্মানীর সাহায্যে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিয়া ভারতে ইংরেজকে সম্পূর্ণরূপে পর্য্যুদস্ত করা। ইউরোপে অবস্থিত বিপ্লবীগণ যেমন চম্পাকরণ পিল্লে, তারকনাথ দাস, হেরেম্বলাল গুপ্ত, চন্দ্রকান্ত চক্রবর্ত্তী, বরকতুল্লা, বীরেন্দ্র সরকার বার্লিনে গিয়া জার্মান সরকারের সহিত যোগাযোগ করিয়াছিলেন। বার্লিন হইতে ওয়াশিংটনে তৎকালীন জার্মান এম্বাসাডার ও বাটাভিয়া এবং সাংহাই-এর জার্মান কনসাল-জেনারেলের নিকট আদেশ গেল, ভারতীয়দের অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করিতে হইবে। এইবার ক্যালিফোর্নিয়া ও সান্‌ফ্রান্সিসকো হইতে হরদয়াল ও রামচন্দ্র তাহাদের কার্য্য আরম্ভ করিলেন। ক্যালি-ফোর্নিয়া হইতে পিংলে এবং সিঙ্গাপুর হইতে সত্যেন সেন ভারতে প্রেরিত হইলেন। পরিকল্পনা এইরূপ হইল যে "মাভেরিক" নামে একটি ভাড়া করা জাহাজ ত্রিশ হাজার রাইফেল ও প্রতি রাইফেলের জন্যে চারিশত রাউণ্ড বুলেট এবং দুই লক্ষ টাকা সুন্দরবনের রায়মঙ্গল নামক স্থানে বিপ্লবীদের হাতে পৌঁছাইয়া দিবে। জাহাজটি

ব্যাটাভিয়া হইয়া আসিবে। পরে আরও ছুইখানি জাহাজ 'অ্যানি লারসন' ও 'হেনরী' মাল নিয়া হাতিয়া ও বালেশ্বর অঞ্চলে মাল পৌঁছাইবে। অ্যানি লারসন আনিবে কুড়ি হাজার রাইফেল, ছুই হাজার পিস্তল, চল্লিশ লক্ষ বুলেট ও ছুই লক্ষ টাকা এবং হেনরী আনিবে দশ হাজার রাইফেল, দশ লক্ষ বুলেট ও হাতবোমা। ভারতে এই সবের ব্যবস্থা করিবার জন্য ছুইটি কোম্পানী খোলা হইল কলিকাতায়, শ্রমজীবি সমবায় হ্যারিস এ্যাণ্ড কোম্পানী এবং বালেশ্বরে ইউনিভার্সাল এম্পোরিয়াম। ইহারা ওয়াশিংটন ক্যালি-ফোর্নিয়া, সান্‌ফ্রান্সিসকো, সাংহাই ও ব্যাটাভিয়ার সহিত সংযোগ রাখিত। নরেন ভট্টাচার্য্য মার্টিন নাম নিয়া ব্যাটাভিয়া, বার্মা ও ভারতে যাতায়াত করিত। কথা ছিল এই সব অস্ত্রশস্ত্র ভারতে পৌঁছিলে বিপ্লবীদের মধ্যে বিতরণ করা হইবে। বিপ্লবীদের সংখ্যা তখন অনেক ছিল। নেতারা মনে করিয়াছিলেন এই অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া বিপ্লবীদল বাংলায় অবস্থিত ইংরাজ সেনাকে অনায়াসে পর্য্যুদস্ত করিতে পারিবে। বাংলার বাহির হইতে যাহাতে সহজে সাহায্য না আসিতে পারে সেজন্য সমস্ত নদীর ব্রীজগুলি উড়াইয়া দিতে হইবে স্থির হইল। তিন দিকে ব্রীজ উড়াইবার জন্য লোকও পাঠান হইল। যাছগোপাল গেল চক্রধরপুরের বি-এন-আর এর ব্রীজ উড়াইতে, বাঘা যতীন গেল বালেশ্বরে এম-এস-এম রেলের ব্রীজ উড়াইতে এবং আর একজন গেল অজয় নদীর ব্রীজ উড়াইতে। তাহার পর পরিকল্পনায় ছিল, ফোর্ট উইলিয়াম আক্রমণ করিয়া অধিকার করা হইবে। কলিকাতা লুণ্ঠন করা হইবে এবং সমগ্র বাংলাদেশ অধিকার করা হইবে। 'মাভেরিক' এবং অন্যান্য জাহাজের অফিসাররা বাংলাদেশে থাকিবে জনগণকে সামরিক শিক্ষা

দিবার জন্য। রায়মঙ্গলের এক জমিদারের সহিত ব্যবস্থা হয় যে সে মাল খালাস করাইবার সমস্ত ব্যবস্থা করিবে। ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইল।

নির্দ্দিষ্ট দিনের কিছু পূর্বেই বিপ্লবীরা রায়মঙ্গলে পৌঁছিল, কিন্তু 'মাভেরিক' সেদিন আসিয়া পৌঁছিল না। কয়েকদিন থাকিয়া ভগ্নহৃদয়ে বিপ্লবীরা ফিরিয়া আসিল। খবর পাওয়া গেল সরকার পূর্বেই ইহার সংবাদ পাইয়া যায় এবং এই পরিকল্পনাটি বানচাল করিয়া দিবার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করে। মার্টিন বাটাভিয়াতে গিয়া জানিতে পারিল যে অ্যানি লারসন পূর্ব্ব ব্যবস্থামত মধ্য সমুদ্রে মাভেরিকের মাল সরবরাহ করিতে পারে নাই। সে আবার ওয়াশিংটনে অস্ত্রশস্ত্র দিয়া আরো দুইখানি জাহাজ পাঠাইল। কথা ছিল বালেশ্বরে ইহারা মাল পৌঁছাইয়া দিবে। কিন্তু ইহাও সফল হইল না। ইতিমধ্যে আমেরিকাতে ভারতীয় বিপ্লবীদের গ্রেপ্তার করা আরম্ভ হইল। হরদয়াল আমেরিকা ত্যাগ করিলেন। মার্টিনও ধরা পরিলেন না, কিন্তু বালেশ্বরে বুড়ীবালামের তীরে পুলিশের সহিত খণ্ডযুদ্ধে বাঘা যতীন ও চিত্তপ্রিয় প্রাণ হারাইলেন। এই পরিকল্পনাটি সফল হইলে ভারতের বুকে এক প্রলয় কাণ্ড হইয়া যাইত। সফল হইল না সংবাদ আদান প্রদান করিবার সুবিধা-জনক ব্যবস্থা ছিল না বলিয়া। বাটাভিয়ার জার্ম্মান কনসাল পরে অবশ্য কিছু টাকা কলিকাতার হ্যারিস কোম্পানীকে পাঠাইয়া দেন কিন্তু অস্ত্রশস্ত্র আর পাঠাইতে পারেন নাই। আমেরিকাতে ধৃত ভারতীয় বিপ্লবীদের নিয়া যে বিচার হয় তাহা ইতিহাসে Sanfrancisco Trials নামে অভিহিত হইয়া আছে। এই বিচারের আসামীরা অধিকাংশই বাঙ্গালী ছিলেন।

বাংলার বৈপ্লবিক আন্দোলনে সোনারঙ্গের অংশ ঃ—

১৯০৫ সনে তদানীন্তন ভারতের গবর্ণর জেনারেল (বড়লাট) লর্ড কার্জন বঙ্গদেশ বিভাগ করিয়া দিলেন। এই বিভাগের দরুণ দুইটি ভিন্ন প্রদেশ গঠিত হয়—একটি পশ্চিম বাংলা, কলিকাতা ইহার রাজধানী হয় এবং অপরটি পূর্ব বাংলা ও আসাম, ঢাকা নগরী ইহার রাজধানী হয়। পূর্বে আসাম একটি চীফ কমিশনার দ্বারা শাসিত প্রদেশ ছিল। এই সময়ে আসামকে পূর্ব্ব বাংলার সহিত যোগ করিয়া দেওয়া হয়। ১৯০৫ সনের ৭ই আগষ্ট কার্জন ইহা ঘোষণা করেন এবং ঐ বৎসরের ১৬ই অক্টোবর ইহা কার্য্যে পরিণত হয়। বাঙ্গালীরা ইহা গ্রহণ না করিয়া যে আন্দোলন শুরু করে তাহাই পরে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন নামে পরিচিত হয়।

এই স্বদেশী আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বঙ্গভঙ্গ রহিত করিতে হইবে। শ্রীঅরবিন্দ আসিয়া বলিলেন, "শুধু বঙ্গভঙ্গ রহিত করিলেই চলিবে না, আমরা স্বাধীনতা চাই।" এই স্বাধীনতা লাভের জন্য যে আন্দোলনের সূত্রপাত হয় পরবর্ত্তী কালে ইহা হইতেই বৈপ্লবিক আন্দোলন আরম্ভ হয়। স্বদেশী আন্দোলন চালাইতে দেশে সুহৃদ সমিতি গঠিত হয় ১৯০৫ সনে এবং ১৯০৬ সনে শ্রীঅরবিন্দের মতবাদ চালাইবার জন্য অনুশীলন সমিতি গঠিত হয়। দুই আন্দোলনই বঙ্গদেশে চলিতে থাকে।

এই স্বদেশী আন্দোলন সমগ্র বাংলা দেশের গ্রামে গ্রামে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে এবং পূর্বেই বলিয়াছি, গ্রামেও ইহা পূর্ণ অনুমোদন লাভ করে। সভা-সমিতি করিয়া, স্বদেশী গান গাহিয়া এবং কিছু কিছু সংগঠনের কাজ করিয়া ইহা মোটের উপর শান্ত ভাবেই চলিতে থাকে। এমনি সময়ে, বোধ হয় ১৯০৭ সনে,

মাখন সেন শিক্ষা সমাপনান্তে গ্রামে ফিরিয়া আন্দোলনের গতি ঘুরাইয়া দিয়া শ্রীঅরবিন্দের বিপ্লবের বাণী প্রচার করেন। গ্রামের ছেলে এম-এ পাস করিয়া আসিয়াছে কিছুদিন গ্রামে থাকিবে। এদিকে গ্রামের স্কুলেও উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষক নাই। লস্কর বাড়ীর স্কুল-কর্ত্তৃপক্ষ তাহাকে বোধ হয় অবৈতনিক শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত করেন। মাখন সেন ছেলেদের সংস্পর্শে আসিয়া আপনার উদ্দীপনাময় ভাষায় বিপ্লবের মন্ত্র প্রচার করিতে থাকেন। সমস্ত স্কুল বিপ্লবের মন্ত্রে উদ্দীপিত হইয়া ওঠে। আমরা নীচের ক্লাসের ছেলেরাও ক্লাস পালাইয়া উপরের ক্লাসে গিয়া মাখন সেনের বক্তৃতা শুনিতাম। এই স্কুলের ছাত্রদেরই কতক অংশ নিয়া মাখন সেন গ্রামের জয়ব্রহ্মসারের নিকট এক স্থানে যে স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন পরে তাহা সোনারঙ্গ জাতীয় বিদ্যালয় নামে পরিচিত হয়। এই বিদ্যালয় স্থাপনে মাখন সেনকে সাহায্য করেন গ্রামেরই পাটপাতা সেনের বাড়ীর ডিঃ ম্যাজিষ্ট্রেট শশী সেনের ছেলে, আমার মাসতুতো মামা বগলা সেন, কলিকাতার শৈলেন সেনের বাবা। আমি যতদূর জানি, সমস্ত আর্থিক সাহায্য বগলা সেনই দেন। এই বিদ্যালয়ের সহিত একটি ছাত্রাবাসও প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রথমে এই বিদ্যালয়ের কার্য্যকলাপ সাধারণ বিদ্যালয়ের ধারাই মানিয়া চলিত। কিন্তু ১৯০৮ সনে ঢাকা অনুশীলন সমিতি এবং ঢাকা জাতীয় বিদ্যালয় সরকার বন্ধ করিয়া দেওয়াতে উহার কর্মীগণ সোনারঙ্গ জাতীয় বিদ্যালয়ে আসিয়া তাহার কর্ম্মধারা বিপ্লবের পথে চালিত করিয়া দেয়। ধীরে ধীরে গ্রামের সাধারণ স্বদেশী আন্দোলন স্তিমিত হইয়া যায়। পরিবর্ত্তে একদিন শুনিতে পাই রাজনগরে ত্রিশ হাজার টাকা ডাকাতি হইয়া গিয়াছে।

ডাকাতেরা সকলেই ভদ্রঘরের ছেলে, কাহারও উপর কোনরূপ অত্যাচার করে নাই, প্রাণে কেহ মরে নাই যদিও ডাকাতদের বন্দুক পিস্তল সবই ছিল। শুধু টাকা পয়সা, গহনা ইত্যাদি নিয়া গিয়াছে এবং যাইবার সময় বলিয়া গিয়াছে, "এ টাকা পয়সা গহনা আমরা দেশের কাজের জন্যে ধার স্বরূপ নিয়া যাইতেছি, পরে সুবিধা মত সুসময়ে এই ধার শোধ দেব।" তারপর ক্রমে ক্রমে হলদিয়া, বাহ্রা, নারিয়া, গাওদিয়া, ভরাকর ও আরও বহু স্থানে ঐ একই ধরণের ডাকাতি হয়। কোন কোন স্থানে নরহত্যাও হয়। এখানেও দেখা যায় যাহাদের হত্যা করা হইয়াছে তাহারা সবাই ইংরাজের গুপ্তচর রূপে সাধারণের কাছে পরিচিত ছিল। সোনারঙ্গ গ্রামে একই রাত্রে তিনটি খুন হয়—রসুল দফাদার, তাহার ভাই ও কালীবিনোদ চক্রবর্ত্তী। আমরা কিন্তু তাহাদের ইংরাজের সহযোগীই জানিতাম। দেশের নানা স্থানে নানা রকম অস্ত্রশস্ত্রের ডিপোও পাওয়া যায়। এই বৈপ্লবিক কাজকর্ম্ম বন্ধ করিবার জন্য সরকার নানা স্থানে পিউনেটিভ পুলিস বসাইয়া দেয় এবং দেশের লোককে ভয় দেখাইবার জন্য নানা স্থানে ইংরেজ সৈন্যদের কুচকাওয়াজ করাইয়া নিয়া যায়। এই সব স্থানের মধ্যে আমাদের সোনারঙ্গ গ্রামও বিশেষ একটি স্থান হিসাবে বিবেচিত হইত। গ্রামে পিউনেটিভ পুলিস বসিয়া যায়, ইংরেজ সৈন্য, ব্লাকওয়াচ সৈন্য একদিন গ্রামের ভিতর দিয়া কুচ-কাওয়াজ করিয়া যায়। গ্রামের সত্য লস্করের খালি বাড়ীতে অনেক অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া যায়। পুলিস কিন্তু শত চেষ্টাতে এ ব্যাপারে কাহাকেও ধরিতে পারে নাই। সন্দেহ ক্রমে গোঁসাই পাড়ার ললিত বাড়রী ও মুন্সীপাড়ার হরেন সেনের পিছনে চারি জন করিয়া পুলিস রাখা হয়। তাহারা চব্বিশ ঘণ্টা উহাদের নজরে রাখিত। পরে গুপ্তের বাড়ীর

অতুল সেন এবং রজনী মুখুটীর ছেলে হেমেন্দ্র মুখুটীরও এই দশা হয়। বিরাজ সেনকে ফতেজঙ্গপুরের হত্যা মামলায় জড়িত করিয়া ধরিয়া নিয়া যায়। মাখন সেনের ভাগিনেয় অকিঞ্চনের দাদা সন্তোষ সেনকে কিন্তু কোন ক্রমেই এই সব হাঙ্গামায় জড়িত করিতে পারে নাই। যদিও আমরা জানিতাম যে এই সব বৈপ্লবিক কাজে সন্তোষ সেন বিশেষ ভাবে জড়িত আছে। গ্রামের লোয়ার আলী, ভীম মজুমদার (মুসলমান) আমাদের বলিত সন্তোষবাবু বাচ্চা বন্দুক নিয়া তাহাদের মুর্গিগুলোকে তাড়া করে। নৌকার মাঝি রাজমোহন ছিল খুব জোয়ান। সে বলিত, সন্তোষবাবু যখন আমার নৌকায় আসেন তখন তাঁহার সহিত প্রায়ই ছোট ছোট বাক্স থাকে আর সে সব বাক্স কি ভারী, টাকায় ভরা বাক্স ভারীই হয়। হরেন আমার বিশেষ বন্ধু ছিল, সে প্রায়ই আমাকে তাহার ছোরা খেলার কসরত দেখাইত। ললিত বাড়রীর বৈপ্লবিক কাজের সহিত আমার সাক্ষাত পরিচয় ঘটিয়াছে। সে যাহাই হউক, এই সব রাজনৈতিক ডাকাতি, হত্যা ও অন্যান্য কার্য্য কাহাদের দ্বারা সাধিত হইত তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইত না। ফলে কেহ ধরাও পড়িত না। কিন্তু পুলিসের বরাবরই সন্দেহ ছিল জাতীয় বিদ্যালয়ের লোকেরা ইহাতে জড়িত আছে। গ্রামবাসীদেরও সেই সন্দেহ ছিল কিন্তু সাক্ষাৎ ভাবে কাহারা এই সব কাজে কতটা জড়িত আছে তাহা অনুমান করিতে পারিত না।

১৯০৮ সন হইতে ১৯১১ সন পর্য্যন্ত এই ভাবেই যায়। ১৯১১ সনে পুলিস একরূপ জোর করেই জাতীয় বিদ্যালয় বন্ধ করে দেয়। মাখন সেন ইহার কিছু পূর্ব্বেই গ্রাম ছাড়িয়া কলিকাতায় যান। তাহার পর গ্রামের সমস্ত আন্দোলন স্তিমিত হইয়া আসে। বছর খানিক পরে পিউনেটিভ পুলিসও উঠিয়া যায়। গ্রামের

আন্দোলন স্তিমিত হইয়া আসে বটে, কিন্তু দেশব্যাপী রাজনৈতিক ডাকাতি, হত্যা এবং অন্যান্য বৈপ্লবিক কাজ সমান ভাবেই চলিতে থাকে। ১৯১৪ সন থেকে ১৯১৬ সনে ইহা ভীষণ আকার ধারণ করে যাহার ফলে এই দেশব্যাপী বৈপ্লবিক কাজ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে তাহার প্রতিকারের উপায় নির্দ্ধারণের জন্য ভারত সরকার ১৯১৮ সনে 'Sedition committee' নামে এক কমিটি গঠন করেন।

বিলাতের হাইকোর্টের জজ শ্রী এস, এ, টি রাউলাট (S. A. T Rowlatt) ইহার সভাপতি হন এবং সদস্য হন যথাক্রমে (১) সার বেসিন স্কট (Sir Basin Scott) বম্বে হাইকোর্টের জজ, (২) দেওয়ান বাহাদুর কুমার স্বামী (Dewan Bahadur Coomar Swamy) মান্দ্রাজ হাইকোর্টের জজ, (৩) শ্রীপি, সি, মিত্র (Sir P. C. Mitra) কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল, (৪) স্যার হেনরী লোভেট (Sir Henry Lovett) যুক্তপ্রদেশের রেভিনিউ বোর্ডের সদস্য। মিঃ জে, ডি, ভি, লজ (Mr. J. D. V. Lodge) এই কমিটীর সেক্রেটারী হন। কমিটীর বেশির ভাগ অধিবেশনই কলিকাতায় হয় এবং চারিটি অধিবেশন লাহোরে হয়। এই অনুসন্ধান আরম্ভ হয় জানুয়ারী ১৯১৮ খৃঃ এবং শেষ হয় ঐ বছরেরই মাঝামাঝি। কমিটী রিপোর্ট দাখিল করে এপ্রিল মাসে। দুই শত ছাব্বিশ পৃষ্ঠার এই রিপোর্টের মধ্যে এক শত পঁচিশ পৃষ্ঠাই বাংলা দেশের কথা নিয়া লেখা হয়। সভাপতি রাউলাট সাহেবের নামে 'রাউলাট কমিটী' নামেও ইহা পরিচিত হয়। সোনারঙ্গের সুসন্তান মাখনলাল সেনের অনেক কথা এবং অপর সুসন্তান হেমেন্দ্র মুখুটীর কথাও ইহাতে লিখিত হয়। সোনারঙ্গ গ্রামের নাম ইহাতে এগার

বার (11 times) উল্লিখিত হইয়াছে। রিপোর্টের ৪১, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ১০৫, ১১৩, ১১৫, ১১৬, ১২২ ও ১২৩ পৃষ্ঠা হইতে বক্তব্যগুলি নিম্নে সন্নিবেশিত হইল।

References of Sonarang in the Sedition (Rowlatt) Committees Report 1918

Page 41.

Both these dacoities were planned at Sonarang National School (dacoity of Rs. 28000/- at Rajnagar, Dacca dt. on 10-11-09, dacoity of Rs. 16000/- at Mohanpur, Tipperah dt. on 11-11-09)

These dacoities were clearly the work of Dacca Society which it is observed was using a school for the organisation of such crimes.

Page 48.

A dacoity was planned to take place in which conspirators of Calcutta, Mymensingh and Sonarang were to take part (1910). It appears that the three last mentioned dacoities originated amongst the students and teachers at Sonarang National School which attained greater notoriety in 1911.

The dacoities are : Sept. 1910 Haldia, Dacca, Rs. 1500/-, Nov. 1910 Kalaigas, Faridpur Rs. 12,660, one man murdered, Nov. 1910 Dadpur, Barisal, Rs 49,368.

Page 49.

Postal Peon assault case, 21-1-1911. 14 men arrested, 1 man sentenced to 4 M/RI, 1 man for 1 M/RI, 4 fined for Rs. 25/- each (rest disposed).

Page 50.

Murders, three men killed 11-7-1911
(Three men killed—Rasul Dewan, his brother, Kalibenode Chakrabarty)

Page 51. The Sonarang National School.

In the year 1911 there were 18 outrages (in Bengal by Revolutionaries). The first of these outrages was an assault by the students and teachers of the Sonarang National School who seized the bag of a postal peon with its contents including registered orders for money and cash. Fourteen teachers and students were arrested and seven were ultimately punished by fine or imprisonment.

The Sonarng murders of the following) 11th July appear to have been offshoot of this case for upon that date Rasul Dewan was shot dead and his brother and another man (Kalibenode Chakrabarty) were mortally wounded at their houses at Sonarang. They had been assisting the Police with information and Rasul Dewan particularly had assisted the Police in the Postal Peon Case.

There is reason to believe that the students and

teachers of the Sonarang National School participated in the Gaodia dacoity mentioned before. The notorious school had been founded in the year 1908 and at the time of Dacca conspiracy (1910-12) had been attended by 60 or 70 boys. The curriculum was the same as in the Govt. schools up to the Entrance or Matriculation standard with the addition that Physical Exercise and Lathe Play was taught and a blacksmith's and a carpenter's shop were utilised for the teaching of practical carpentary and iron work. No syllabus of subjects taught or text books used at this school had ever been issued and it has not been ascertained what books were in use there but on the occasion of a search there in August 1910 in connection with the Dacca conspiracy case, the following books were found in the school library (i) History of Tilak's case and sketch of his life, (ii) Chhatrapati Shivaji by S. C. Shastri and (iii) History of the Sepoy Mutiny.

Page 105. Size of organisation.

It must not be supposed that the various organisations were necessarily small. The Dacca Anusilan Samity and the bodies which we call the West Bengal and the North Bengal Parties were widely extended and overlapped each other's territory. The Dacca Samity throughout the whole period was the most powerful of these associations.

The existence of this body alone, if there had been no other would have constituted a public danger. It was originally founded in Dacca by Pulin Behari Das ostensiblely as a society for social and religious culture. It took advantage of the bitterness which animated the Swadeshi movement and altruistic spirit (admirable so long imparted), shown by the band of National volunteers, which, at that period used to hold themselves ready to assist at fires, bloods and similar calamities. It penetrated the school. The National School at Dacca where Pulin and Bhupesh Ch. Roy were teachers was one of the chie training and recruiting centre of the Samity. The Sonarang National School founded by Makhan La. Sen who succeeded Pulin as leader of the Dacca Anusilan when Pulin was deported, exercised as most sinister influence over the students and was responsible for several crimes detailed in the section dealing with outrages. In the Barisal supplementary conspiracy case the High court held that there was no doubt that a number of dacoities put forward as over tacts to the conspiracy case were engineered and carried out from the Sonarang school.

For the first two years (1906-08) of it existence the Samity flourished openly. When at the end of 1908 it was declared an illegal association under the Criminal Law Amendment Act of that year, Pulin Behari Das and others were deported, it rendered its Head Quarters to Calcutta where it found an able

leader in Makhan Lal Sen. In after years it spread itself over all Bengal and extended its operations to other provinces. While its organisation was most compact in Dacca and Mymensingh it was active from Dinajpore in the North-west to Chittagong in the South-east and from Coochbehar in the North-east to Midnapore in the South-west. Outside Bengal we find its members working in Assam, Behar, Punjab, U.P., C.P. and at Poona.

Page 113.

Sri Hemendra Mukhuti S/o. Rajani Mukhuti of Sonarang, well known head master and later an internee for several years is referred here.

Girindra Mohan Das, approver in the Barisal supplementary conspiracy case submitted statements in which the following passage exists : Giving details of methods of organisation in schools, he mentions of a High school (in Durgapore, Dt. Chittagong) Durgapur : Most of the teachers of the local High English School are religious minded. Consequently most of the boys are religious minded. The idea (the revolutionary movement) is not much in evidence. But the Head Master and Hemendra Mukhuti have it. Both are favourable to our work, particularly the later......It is necessary that Religion and Patriotism should flourish side by side...... Hemendra Babu speaks a little about these things in

his classes. But very few can catch or comprehend what he says.

Page 115.

Another approver (in the Barisal Supplementary conspracy Case) stated : "Pulin told both of us that we could do no good to the country by studying and we had better take up appointment at the Sonarang National School and could do the Samity's work from there." The witness went on to describe how he became a master of the school, how all the masters and some of the students were members of the Dacca Samiti, how a party from the (Sonarang) school in conjunction with a party from Calcutta planned a armoured robbery and brought back money, clothes and a small child's golden bangle as well as Rs. 900/- in cash. These things were brought to the school Hostel. Some of the money was kept for the expenses of the expenses of the school and the rest was sent to Dacca. Another dacoity was carried out from this school. The proceeds were many gold and silver ornaments and so on. At last the witness was convicted of assaulting a Govt. postal Peon and suffered a month's imprisonment.

Page 116.

We will not dwell further on the drearey reçord of the Sonarang National School which was rather

an association organised for robbery and murder than a place of education.

Page 222.

Barisal Conspiracy Supplementary Judgement, conclusion Note :

The Sonarang National School was one of the important centres of the organisation (Dacca Anusilan Samity). The Secretary (who was also the proprietor) and several teachers and students of the school were active members of the criminal conspiracy and dacoities and crimes were engineered and carried out from the Sonarang National School.

Page 223.

Barisal Conspiracy Supplementary Case Judgement, conclusion Note ;

Soon after passing his intermediate examination he (Ramesh Chandra Acharya) head of the Barisal Samity, an offshoot of the Dacca Anusilan Samity and an accused in the present case was ordered to join the National School at Sonarang. He obeyed. While at Sonarang he committed various crimes. The Sonarang School was closed after the Sukair Dacoity.

এই রিপোর্ট হইতেই আমরা জানিতে পারি বাংলার বৈপ্লবিক আন্দোলন এই সোনারঙ্গ গ্রাম হইতেই চালিত হইত এবং

আন্দোলনের নেতা ছিলেন মাখনলাল সেন। তিনি ১৯০৮ থেকে ১৯১১ সাল পর্য্যন্ত গ্রাম হইতেই এই আন্দোলন চালনা করিতেন।

রাউলট কমিটি সমগ্র ভারতের বিপ্লবের কথা আলোচনা করিয়াছে। এই রিপোর্টে সোনারঙ্গের মত ক্ষুদ্র গ্রামের কথা এগার বার উল্লেখ করিয়াছে। ভারতের ছয় লক্ষ গ্রামের মধ্যে এই একটি মাত্র গ্রাম যার কথা এতবার উল্লেখ করা হয়। ইহা গ্রামের বৈশিষ্ট্যেরই পরিচায়ক। বাংলার এই ক্ষুদ্র গ্রাম ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এই বিরাট আন্দোলনের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল, ইহা বস্তুতঃই গৌরবের বিষয়। আমরা এই গ্রামেরই অধিবাসী ছিলাম বলিয়া নিজেদের গৌরবান্বিত মনে করি।

ভারতের বিপ্লবের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস :—

১৯০৬ হইতে ১৯১৮ খৃঃ পর্য্যন্ত ভারতের বৈপ্লবিক আন্দোলনের কথা কিছু উল্লেখ করিলে বোধ হয় খুব অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এই আন্দোলন সারা ভারতে বাঙ্গালীদের চেষ্টায় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। অনুশীলন সমিতি ইহার কর্ণধার ছিল। পুলিন দাসের দ্বীপান্তর ও সোনারঙ্গ জাতীয় বিদ্যালয় বন্ধ হওয়ার পর এই সমিতির সভ্যরাই নানা ভাবে কাজ করেন। কোন প্রদেশে কি ভাবে এই আন্দোলন হয় তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা এই অধ্যায়ে করিব।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সী :—

বোম্বাই-এ প্লেগ মহামারী দেখা দিলে সরকার "প্লেগ আইসোলেশন ক্যাম্পের" আয়োজন করে। এবং জোর করিয়া

লোকদের এই ক্যাম্পে ধরিয়া লইয়া যায়। মিঃ ব্যাণ্ড ছিলেন এই প্লেগ কমিশনের চেয়ারম্যান। লোকে এই সব কারণে তাঁহার উপর বিরূপ ছিল। তাই চাপেকর ভ্রাতৃদ্বয় ব্যাণ্ডকে হত্যা করে। তাঁহার সহিত যাইতেছিলেন লেফটেনাণ্ট আয়ার্ষ্ট—তিনিও নিহত হন। কিন্তু এই হত্যা কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত নয়। চাপেকর ভ্রাতাদের কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল না।

কিন্তু ইহার পূর্বেই চিৎপাবন ব্রাহ্মণদের মধ্যে ইংরেজ বিদ্বেষ দেখা দেয়। ইহাতে ইন্ধন যোগায় বালগঙ্গাধর তিলকের "কেশরী" ও পুণার পুরাঞ্জপের "কাল পত্রিকা", "গণেশ উৎসব" এবং "শিবাজী উৎসব"। ব্যাণ্ড হত্যাকে সমর্থন করিয়া তিলক তাঁহার জ্বালাময়ী ভাষায় জাতিকে জাতীয়তাবাদের মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে কেশরীতে লিখিলেন, ফলে তাঁহার জেল হয়। এই কারণেই নাণ্টু ভ্রাতাদের দ্বীপান্তর হয়। ইতিমধ্যে কাথিয়াওয়াড়ের শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মা ইংরেজ বিদ্বেষ ছড়াইতে থাকেন। পরে তিনি ইংলণ্ডে আসিয়া ১৯০৫ খৃঃ বিখ্যাত "ইণ্ডিয়া হাউস" স্থাপন করেন। পরবর্ত্তী কালে ইণ্ডিয়া হাউসই ইউরোপে ভারতীয় বিপ্লবীদের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। ১৯০৫ খৃঃ বিনায়ক সাভারকার ফার্গুসন কলেজ হইতে বি-এ পাশ করেন। তিনি ও তাঁহার ভ্রাতা গণেশ সাভারকার বিপ্লবের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং "মিত্রমেলা" ও "অভিনব ভারত সোসাইটি" গঠন করেন। তাহার পর বিনায়ক ইংলণ্ডে গিয়া ইণ্ডিয়া হাউসে যোগদান করেন এবং ১৯০৯ সনে তিনি ইংলণ্ডে ভারতীয় বিপ্লবীদের নেতা হন। সেখানে ১৯০৮ সনে সিপাহী বিদ্রোহের বার্ষিকী পালন করা হয় এবং তাহার পর 'ইণ্ডিয়ান ওয়ার অব ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ইন ১৮৫৭' নামে পুস্তিকা লেখেন।

এদিকে গণেশ সাভারকার নাসিকে মিত্রমেলা ও অভিনব ভারতের মাধ্যমে আন্দোলন চালাইয়া যাইতে লাগিলেন। ফলে সরকার নাসিকে সব নেতাদের গ্রেপ্তার করিয়া "নাসিক ষড়যন্ত্র মামলা" দায়ের করে। তাহাতে গণেশ সাভারকারের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়। কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট জ্যাকসন রেহাই পাইল না, বিচারের পর তাঁহাকে হত্যা করা হয়। ইতিমধ্যে গণেশের অভিনব ভারত সোসাইটির কাজকর্ম্ম বোম্বাই-এর প্রায় সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। বোম্বাই, নাসিক, পুণা, ঔরাঙ্গবাদ, হায়দরাবাদ, গোয়ালিয়র প্রভৃতি স্থানে জোর চলে। ইহারই মধ্যে মদনলাল ধিংরা নামে এক মহারাস্ট্রীয় যুবক লণ্ডনের প্রকাশ্য রাজপথে ইণ্ডিয়া অফিসের রাজনৈতিক এ-ডি-সি-কে হত্যা করে। তাঁহার নাম কর্ণেল সার উইলিয়ম কার্জন ওয়াইলি। ইতিমধ্যে ১৯০৮ সনে মজঃফরপুরে ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী কিংসফোর্ড ভ্রমে কুমারী ও শ্রীমতী কেনেডিকে হত্যা করে। সমস্ত দেশ এই হত্যায় চমকিত হইয়া ওঠে। তিলক ও পরাঞ্জপে ইহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া প্রবন্ধ লেখেন। ফলে তিলকের আট বৎসরের জন্য বর্মায় নির্বাসন দণ্ড হয়।

১৯০৯ সনে মহারাষ্ট্রে শেষ বারের মত বহ্নিশিখা জ্বলিয়া ওঠে। ভাইসরয় লর্ড মিণ্টো এবং লেডী মিণ্টো যখন বম্বে সফর করেন তখন তাঁহাদের উপর বোমা নিক্ষেপ করা হয়। ইহার পর বোম্বে প্রেসিডেন্সীতে আর কোন বৈপ্লবিক কাজকর্ম্ম হয় নাই।

এই কয় বৎসরের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে আন্দোলন চিৎপাবন ব্রাহ্মণদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। দুই একজন কেবল বহিরাগত ছিলেন। নাসিক ষড়যন্ত্রও প্রদেশের উপর দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে নাই। শ্যামাজী কৃষ্ণবর্ম্মা পরে প্যারিসে

আসিয়া বসবাস আরম্ভ করেন এবং মাদাম কামা নামক এক পার্শী মহিলা তাঁহার সহিত যোগ দিয়া কাজ করিতে থাকেন।

মাদ্রাজ ঃ—

বিপিনচন্দ্র পাল ১৯০৭ খৃঃ মাদ্রাজ সফরে গিয়া আপন জ্বালাময়ী ভাষায় বক্তৃতা দিয়া মাদ্রাজবাসীকে অভিভূত করিয়া দেন। ফলে কয়েকজন মাদ্রাজী যুবক তাঁহার মন্ত্রশিষ্য হইয়া যায়। সুব্রাহ্মনিয়ম শিবা ও চিদাম্বরম পিল্লে মাদ্রাজে তাঁহার মন্ত্র প্রচার করিতে লাগিল। পরে পুলিসের তাড়ায় তাহারা পণ্ডিচেরীতে পলাইয়া গিয়া সেখান হইতে প্রচারকার্য্য চালাইতে লাগিল। এদিকে বিপিন পাল আলিপুর বোমার মামলায় সাক্ষী দিতে অস্বীকৃত হওয়ায় তাঁহার ছয় মাস জেল হয়। ইহার বিরুদ্ধে আরম্ভ হয় মাদ্রাজে তিনেভেলী আন্দোলন। বিদেশী বর্জ্জন প্রভৃতি তুমুল ভাবে চলে। মাদাম কামা প্যারী হইতে "বন্দেমাতরম" বাহির করিয়া মাদ্রাজে তাহার প্রচার চালাইয়া যান। ১৯১০ সনে বাংলার নীলকণ্ঠ ব্রহ্মচারীও বিপ্লবমন্ত্র নিয়া মাদ্রাজে উপস্থিত হন। ফলে নীলকণ্ঠ ব্রহ্মচারীর দ্বারা শিক্ষিত ও অনুপ্রাণিত ভাঞ্চি আয়ার, তিনেভেলীর ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার অ্যাশ আই-সি-এস-কে হত্যা করায় ১৯১১ খৃঃ সঙ্গে সঙ্গে সরকার "তিনেভেলী ষড়যন্ত্র মামলা" করে। নয় জন লোক এই মামলায় অভিযুক্ত হয়। ইহার পর ১৯১৮ খৃঃ পর্য্যন্ত মাদ্রাজে আর কোন বৈপ্লবিক কাজকর্ম্ম দেখা যায় নাই।

যুক্তপ্রদেশ ঃ—

১৯০৭ খৃঃ এলাহাবাদে "স্বরাজ্য" পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকা ধারাবাহিক ভাবে বহু বৎসর ধরিয়া বৈপ্লবিক

আন্দোলনের প্রচার করে। ফলে পর পর আটজন সম্পাদক কারাবরণ করেন। সারা প্রদেশেই বৈপ্লবিক আন্দোলন সুরু হয় কিন্তু বারাণসীতে এই আন্দোলন একটু অন্যরকম ধারা গ্রহণ করে। বারাণসীতে ভারতের পাঁচ মিশালী জাতি বাস করে। তাই কোন মহল্লায় কি হইতেছে সে খবর সংগ্রহ করিতে যুক্তপ্রদেশ পুলিসকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হয়। বাঙ্গালীরা বারাণসীতে বিপ্লব চালাইবার অনেক সুযোগ পাইয়াছিল। ফলে এখানে আন্দোলন বেশ মাথা চাড়া দিয়া ওঠে। এখানে এ্যাংলো বাঙ্গালী স্কুল সব আন্দোলনের কেন্দ্র হয়। বেনারস ষড়যন্ত্র মামলার বিখ্যাত আসামী শচীন সান্যাল এই বিদ্যালয়ের উচ্চতম শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। শচীন সান্যাল আন্দোলনের অন্যতম নেতা হইয়া ওঠেন এবং তাঁহার সহিত আসিয়া যোগ দেন রাসবিহারী বসু এবং বোম্বের পিঙ্গলে। এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল—সৈন্যদলের মধ্যে বিদ্রোহের আগুন ছড়াইয়া দেওয়া। এই অনুসারেই তাঁহারা কাজ করিতে থাকেন। ইহার ফল কিরূপ ব্যাপক হয় তাহা নীচে 'পাঞ্জাব' অধ্যায়ে দেওয়া হইয়াছে। সরকার ইহার সন্ধান পাইয়া ব্যাপক ভাবে ধরপাকড় আরম্ভ করে এবং এই সব বন্দীদের নিয়াই "বেনারস ষড়যন্ত্র মামলা"র অবতারণা হয়। ইহাতে চল্লিশ জন আসামী ছিল, বেশীর ভাগই বাঙ্গালী, উত্তর প্রদেশের কেবল মাত্র একজন ছিল। এই ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে রাউলাট সাহেবের সিডিশন কমিটী লিখিয়াছিল: "A big revolutionary plot, which came within an acc of causing a widespred bloodshed." কিন্তু কমিটী আরও বলিয়াছে যে, "The plot was engineered from outside and the revolutionary movement has not taken

hold of any action of the people of this province."
বিচারে শচীন্ সান্যালের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়, রাসবিহারী বসুর মুক্তি হয়।

পাঞ্জাব :—

১৯০৫/৬ খৃঃ পাঞ্জাবের লোকসংখ্যায় প্রতি শতে ৫৫ মুসলমান, প্রতি শতে ৩৩ হিন্দু ও প্রতি শতে ১২ অন্যান্য জাতি ছিল। ইহাদের মধ্যে শিখেরাই আবার বেশ জঙ্গী প্রকৃতির। যদিও ভারতের জনসাধারণের মধ্যে শতাংশের একাংশ অপেক্ষা ইহাদের সংখ্যা কম ছিল, তবু ভারতীয় সেনাবাহিনীর ছয় ভাগের এক ভাগ ছিল শিখ। তাহা ছাড়া শিখেরা অত্যন্ত অনুভূতিপ্রবণ। কথা ও কাজের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য তাহারা মানে না।

১৯০৫/৬ খৃঃ হইতেই পাঞ্জাবে জাতীয় আন্দোলন আরম্ভ হয়। বাংলাদেশ হইতে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী ও বিপিনচন্দ্র পাল এখানে আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপন করিয়া যান। সর্দ্দার অজিত সিংহ ও লালা লাজপত রায় ইংরেজ বিদ্বেষ প্রচার করিয়া আন্দোলন চালাইতে থাকেন। পাঞ্জাবের লেফটেনাণ্ট গবর্ণর সার ভেনজিল ইব্‌টসন সাহেব এই আন্দোলনকে কৃষি আন্দোলন আখ্যা দিয়া রিপোর্ট দাখিল করেন। কিন্তু সেক্রেটারী অব ষ্টেট এই রিপোর্ট স্বীকার না করিয়া লালা লাজপত রায় ও অজিত সিংহকে দ্বীপান্তর দণ্ড প্রদান করেন। ফলে পাঞ্জাবে এই জাতীয় আন্দোলন ১৯০৭ সনে থামিয়া যায়। ছয় মাস পরে অজিত সিং মুক্তি পাইয়া দেশে আসিয়া আবার আন্দোলন আরম্ভ করেন কিন্তু ১৯০৮ সনে আবার তাঁহাকে পারস্য দেশে পালাইয়া যাইতে হয়। সেখান হইতে তিনি

আমেরিকা গিয়া গদর পার্টিতে যোগদান করেন। পাঞ্জাবে আন্দোলন থামিয়া যায় বটে কিন্তু ১৯০৯ সনে ভাই পরমানন্দ আবার আন্দোলনকে উজ্জীবিত করার চেষ্টা করেন কিন্তু আন্দোলন কোন বিশেষ রূপ গ্রহণ করে নাই।

১৯১৪ সনের পর হইতে শিখদের নিয়া আবার গোলযোগ আরম্ভ হয়। ইতিমধ্যে দিল্লীতে আন্দোলন সুরু হইয়া গিয়াছে। ১৯১২ সনে লর্ড হার্ডিঞ্জ যখন দিল্লী প্রবেশ করেন তখন তাঁহার উপর বোমা নিক্ষেপ করা হয়। বড়লাট ইহাতে আহত হন এবং চারিদিকে ব্যাপক ধরপাকড় হয়। ফলে আরম্ভ হয় 'দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলা' এবং তাহাতে প্রমাণিত হয় যে রাসবিহারী বসু নামে এক বাঙ্গালী যুবক দিল্লীর এই কাজকর্ম্মের জন্য দায়ী। রাসবিহারী বসু দেরাদুনের বনবিভাগের দপ্তরে কেরাণী ছিলেন। এই বিচারে চার জনের প্রাণদণ্ড হয়—আমিনচাঁদ, অবধাবিহারী, বালমুকুন্দ ও বসন্তকিশোর। কিন্তু রাসবিহারী বসু কোনক্রমে পালাইয়া যান।

বাংলার বাহিরের একজন মহান বিপ্লবীর কথা এখানে কিছু বলা প্রয়োজন। তিনি দিল্লীর অধিবাসী কিন্তু পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হরদয়াল। খুব মেধাবী তাই ১৯০৫ সনে ষ্টেট স্কলারশিপ নিয়া উচ্চতর শিক্ষার জন্য বিলাত যান। কিন্তু সেখানে গিয়া তিনি ভারতের উপর অন্যায় ব্যবহারের জন্য বৃটীশ রাজত্বের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া ওঠেন এবং শিক্ষা শেষ হইবার আগেই দেশে ফিরিয়া আসিয়া ইংরেজ বিদ্বেষ প্রচারের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তাঁহার প্রধান শিষ্য ছিল জে, এন, চ্যাটার্জী ও দীননাথ। কিন্তু তাঁহার এই সব কাজের জন্য ভারতে থাকা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া ওঠে এবং ১৯১১ সনে তিনি আমেরিকা চলিয়া যান।

হরদয়াল সানফ্রানসিসকোতে গিয়া গদর পার্টি গঠন করেন এবং "গদর" নামে এক পত্রিকাও প্রকাশ সুরু করেন। তিনি যেখানে থাকিতেন তাহার নাম ছিল 'যুগান্তর আশ্রম'। তিনি সেখান হইতেই তাঁহার অগ্নিমন্ত্র প্রচার করেন। তাঁহার প্রতি বাক্যে ছিল বিদ্রোহের বীজমন্ত্র, প্রতি নিঃশ্বাসে ছিল ইংরাজ হত্যার বিষ। তিনি স্বদেশবাসীকে আহ্বান করিয়া বলেন, ভাই সব দেশে গিয়া বিপ্লব আরম্ভ কর। তিনি ধীরে ধীরে 'গদরের' অর্থাৎ বিপ্লবের আগুন জ্বালাইয়া দেন। তিনি চাহিয়াছিলেন সমস্ত দেশে এক সঙ্গে বিপ্লবের আগুন আরম্ভ হোক। সে আগুনে ইংরেজ জ্বলিয়া মরিবেই। সামুদ্রিক বন্দর নগরস্থিত ভারতীয়রা বিশেষতঃ শিখেরা (যথা মালয়, ইন্দোচায়না, চায়না, জাপান, আমেরিকা, ক্যানাডায় যাহারা বাস করিতেন) গদর পার্টির এই প্রচারে সকলে বিশেষ প্রভাবান্বিত হন। হরদয়াল চাহিয়াছিলেন এই সব বিদেশস্থিত ভারতীয়েরা তাঁহার বাণী দেশে বহন করিয়া নিয়া যাউক। তাহাদের প্রচারে বিপ্লব ঘটিবে।

এই প্রচারে আরও ইন্ধন যোগাইল জাপানী জাহাজ কোমাগাতামারুর অভিযান। ১৫ বৎসর ধরিয়া সিঙ্গাপুরবাসী শ্রীগুরুদিৎ সিং ক্যানাডাগামী ভারতীয়দের, বিশেষ শিখদের একটি বেশ বড়সর দল সংগ্রহ করেন এবং জাপানী জাহাজ কোমাগাতামারু ভাড়া নিয়া এই দলটিকে ক্যানাডা পাঠান। কিন্তু ক্যানাডা সরকার তাহাদের অবতরণ করিতে দিল না। কারণ তাহাদের আইন অনুযায়ী কেবল তাহারাই ক্যানাডায় ঢুকিতে পারে যাহারা ভারত হইতে কোথাও না থামিয়া সোজা ক্যানাডায় আসিবে এবং যাহাদের কাছে অন্যূনপক্ষে ছয় শত টাকা থাকিবে। কোমাগাতামারুর যাত্রীরা কেহই ভারত হইতে সোজা আসেন নাই। কোমাগাতামারু

ফিরিল। পথে কোন বন্দরে ইহাদের নামিতে দিল না। যাত্রীরা প্রায় সকলেই গদর পার্টির সদস্য ছিলেন। গন্তব্য স্থানে যাইতে না পারিয়া এবং এই অকারণ অর্থব্যয়ে যাত্রীরা সবাই ইংরেজ বিদ্বেষে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠেন। ১৯১৪ খৃঃ ২১শে সেপ্টেম্বর কোমাগা-তামারু কলিকাতায় বজবজ বন্দরে পৌঁছিল। সেখানে যাত্রীদের বিনা ভাড়ায় পাঞ্জাব পৌঁছাইবার জন্য বিশেষ ট্রেন প্রস্তুত ছিল। কিন্তু যাত্রীরা বেশীর ভাগই পাঞ্জাব যাইতে রাজী হইলেন না। তাহারা এতদূর ক্ষিপ্ত ও উত্তেজিত হইয়া ওঠেন যে তখনই তাহারা কলিকাতা লুণ্ঠন করিবার জন্য কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করেন। কিছু লোক মাত্র পাঞ্জাব যান। কলিকাতাগামী যাত্রীদের সরকার বাধা দেয় এবং ফলে সংঘর্ষ ও দাঙ্গার উৎপত্তি হয়। তাহাতে চৌদ্দজন শিখ নিহত হয়, অনেক আহত হয় এবং সরকার তাহাদের সবাইকে জোরপূর্ব্বক পাঞ্জাব পাঠাইয়া দেন। তাহার পরই ভারতে 'গদর আন্দোলনের' সূত্রপাত হয়। এই আহত গৌরব গদররা পাঞ্জাবে গিয়াই ভীষণ আন্দোলন আরম্ভ করেন এবং এই বিপ্লবের আগুনে ইন্ধন যোগাইবার জন্য হরদয়াল প্রতি জাহাজে দলে দলে গদরদের দেশে পাঠাইয়া দেন। আঠারো মাসের মধ্যে ৩'২৫ জন গদর দেশে আসেন। গদররা দেশে আসিয়াই নানা প্রকার রাজনৈতিক ডাকাতি, হত্যা ও লুণ্ঠন আরম্ভ করে। পাঁচ মাসের মধ্যেই এইরূপ পঁয়তাল্লিশটি ঘটনা ঘটে। পাঞ্জাবের সর্বত্র এইরূপ ঘটনা অতি অল্প দিনের ব্যবধানে ঘটিতে থাকে। ইহা ছাড়াও লাহোর, রাওলপিণ্ডি, ফিরোজপুর, দিল্লী, মিরাট, কানপুর, বেনারস, জব্বলপুর প্রভৃতি স্থানে অবস্থিত ভারতীয় সেনাবাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহের প্রচার চলিতে থাকে। স্থির হয় সমস্ত সেনাবাহিনী একটি নির্দ্দিষ্ট দিনে ও নির্দ্দিষ্ট

আপনাকে সম্পূর্ণভাবে লীন করিয়া দিয়া ভাসিয়া ভাসিয়া যাইত। আপন বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য লইয়া আমাদের জীবন কখনো সেই ভাসিয়া যাওয়াতে বাঁধা দেয় নাই। তবে আশপাশের অন্যান্য গ্রাম অপেক্ষা আমাদের গ্রামে শিক্ষা ও কৃষ্টির প্রসার একটু অধিকতর ছিল কারণ গ্রামের অধিকাংশ লোকই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এটুকুই যা বৈশিষ্ট্য। গ্রাম্য জীবনের প্রধান ধর্ম ছিল অপার শান্ত ও নিরবিচ্ছিন্ন স্থৈর্য্য। এই সব গ্রামে সময়ের নদী যেন স্রোতবন্ধ হইয়া দীঘিতে পরিণত হইয়াছিল।

গ্রামে দারিদ্র্য ছিল কিন্তু পয়সার তারতম্যের জন্য কোন উগ্র ব্যবহার প্রকাশ পাইত না। সামাজিক মেলামেশা অব্যাহত থাকিত, হৃদ্যতা, আপ্যায়নের ত্রুটী ছিল না। বিদেশ প্রত্যাগত গ্রামবাসী, গ্রামবাসীদের কাছে কি হৃদ্যতাই না পাইত!

গ্রামে আয়ের উৎস বড় একটা ছিল না। বাজার, বিদ্যালয় ও ডাকঘর হইতে আয় যৎসামান্য হইত। বেশীর ভাগ সংসারই চলিত বাহিরে যাঁহারা চাকুরী করিতেন তাঁহাদের পাঠানো টাকা হইতে। যাঁহারা সপরিবারে বিদেশে থাকিতেন তাঁহারা দুর্গাপূজা বা বিবাহাদি অনুষ্ঠানে বৎসরে অন্ততঃ একবার আসিতেন।

তখন সস্তাগণ্ডার দিন, যাতায়াতও ব্যয়সাধ্য ছিল তাই জীবনযাত্রাও বেশ অনায়াস এবং সহজ ছিল। আমি দুইটা ইলিশ মাছ তিন পয়সায়, একটা হাঁসের ডিম এক পয়সায় ও এক পোয়া দুধ এক পয়সায় কিনিয়াছি। কুড়ি পঁচিশটা ছোট মাছ—পুঁটি, ট্যাংরা, কই, খলিসা ইত্যাদি এক পয়সায় কিনিয়াছি। এক টাকায় আধ মণ ধান পাওয়া যাইত। তবু শুনিতাম আমাদের গ্রামে নাকি জিনিসপত্রের দাম খুব বেশী।

ও উত্তর প্রদেশের বিপ্লবী কার্য্যকলাপও বাঙ্গালী বিপ্লবীর দ্বারাই সংঘটিত হইয়াছিল। কেবল পাঞ্জাবের গদর আন্দোলন প্রধানতঃ শিখেরা করে কিন্তু এখানেও দেখা যায় বাঙ্গালী বিপ্লবীরাই নেতৃত্বের প্রধান অংশ গ্রহণ করে এবং যে শিখেরা ও অন্যান্যরা এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে তাহারাও পাঞ্জাবের লোক নহে। তাহারাও বহিরাগত গদর সম্প্রদায়। কিন্তু ক্রমে তাহাও থামিয়া যায়। আমেরিকান গভর্মেন্টের তাড়নায় হরদয়াল আপন কার্য্যক্ষেত্র সানফ্রানসিসকো ও আমেরিকা ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। গদরের নূতন দল আসিতে পারে নাই এবং যাহারা আসিয়াছিল তাহারাও নিস্তেজ হইয়া পড়ে। গদর আন্দোলন শেষ হয়।

কিন্তু বাংলাদেশে তাহার পরও আন্দোলন চলে। ১৯০৮ সনে মুজফর নগরে আরম্ভ ও ১৯৩০ সনে চট্টগ্রামে তাহার সমাপ্তি। ভারতে বিপ্লবের জন্ম বাংলাদেশে এবং মৃত্যুও বাংলাদেশেই। তাই ভারতের বিপ্লববাদের কথা বলিতে গেলে বংলার বিপ্লববাদই এ ইতিহাসের প্রথম ও শেষ কথা।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

গ্রামের সাধারণ জীবনযাত্রা :

আমাদের গ্রামের জীবনযাত্রাতে বলিবার মত বিশেষত্ব কিছুই ছিল না। গ্রামের প্রতিটি দিন, প্রতিটি মাস, প্রতিটি বছর সাধারণত্বের একটা ছকে-ফেলা নৈমিত্তিক আর ছন্দে লয়ে তালে

দেশের শেষ রক্তবিন্দু পর্য্যন্ত পণ করিয়া সমস্ত বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রামে অগ্নিবর্ষী রিভলবার হাতে ঝাঁপাইয়া পড়ে। ফলে ১৯০৮ খৃঃ হইতে ১৯১৭ খৃঃ পর্য্যন্ত বাংলাদেশে দুই শত দশটি রাজনৈতিক ডাকাতি, হত্যা প্রভৃতি সংঘটিত হয়। রাউলাট কমিটী হয়, রাউলাট আইন পাশ হয়। তাহার পরেই দেখি জালিওয়ানাবাগের ইংরাজ-দম্ভের ও কাপুরুষতার কালিমাময় ইতিহাস লিখিত হয়। ব্রিটিশ সিংহকে সেই দিনই সিংহচর্মাবৃত গর্দভের ন্যায় মনে হয়। দমননীতি প্রবল হইয়া ওঠে—আন্দোলন হয় প্রবলতর। কিন্তু দেশে তখন গান্ধীজী নিয়া আসিয়াছেন অসহযোগের অহিংস মন্ত্র। দেশের লোক সেই দিকেই তখন ঝুঁকিয়া যায়। গান্ধীজীর নীতি ইংরাজের দমন নীতি নহে। তাঁহার সামনে বিপ্লববাদ কোণঠাসা হইয়া যায়। ভারতে বিপ্লবের আগুন নিভিয়া যায় কিন্তু বাংলাদেশে তাহার উত্তাপ সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয় না। ১৯৩০ সনে আবার সে আগুন চট্টগ্রামে শেষ বারের মত জ্বলিয়া নিভিয়া যায়। মাষ্টারদা সূর্য্য সেনের চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ও প্রীতিলতা ওয়াদ্দারের ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ দেশজননীর চরণে বাংলার বিপ্লববাদের শেষ রক্ত চন্দন মাখা অর্ঘ্য।

ভারতে বিপ্লববাদের কথা বলিতে গেলে বাংলার কথাই বলিতে হয়। বম্বের ব্যাণ্ড ও আয়ার্ষ্ট হত্যা বৈপ্লবিক নহে। নাসিকে জ্যাকসন হত্যা ও মাদ্রাজে তিনেভিলির অ্যাশ হত্যাও সম্পূর্ণরূপে বৈপ্লবিক নহে। তিনেভিলির হত্যা খানিকটা বৈপ্লবিক হইলেও তাহা বাঙ্গালী বিপ্লবী নীলকান্ত ব্রহ্মচারীর প্রচেষ্টার ফল। কিন্তু ১৯০৬ হইতে ১৯১৮ সন পর্য্যন্ত বাংলাদেশে যে সব রাজনৈতিক হত্যা ও ডাকাতি হইয়াছে সবই বাংলার বিপ্লববাদের ফল। বিহার

বাস করা উচিত নহে। সুতরাং তাহারা ভারতের বাহিরে গিয়া বাস আরম্ভ করে। মুসলমান ধর্ম্মে এই সব লোকদের "মুজাহিরিণ" বলা হয়। হিন্দুস্থান হইতে আগত বলিয়া কাবুলে ইহাদের "হিন্দুস্থানী উগ্রধর্মী" বলা হইত। তাহারা শান্তিপূর্ণ জীবনই কাটাইত। কিন্তু ইংরাজ তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করায় পনের জন মুসলমান পাঞ্জাব হইতে "মুজাহিরিণ" হইয়া ইংরাজদের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করে। ইতিমধ্যে একজন ধর্মান্তরিত শিখ মুসলমান উত্তর প্রদেশের দেওবন্দ হইতে শিক্ষালাভ করিয়া এই আন্দোলনে যোগ দেয়। ইহার নাম ওবিদুল্লা। কাবুলস্থিত তুরস্ক ও জার্ম্মান মিশন এই আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষকতা আরম্ভ করে। ওবিদুল্লা তখন এক শাসন পরিষদ গঠন করে। তাহার প্রেসিডেণ্ট হয় উত্তর প্রদেশের বিপ্লবী জমিদার রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ। প্রধান মন্ত্রী হয় গদর পার্টির বরকাতুল্লা, মন্ত্রী হয় ওবিদুল্লা ও আরও কয়েকজন। এই পরিষদ জার্ম্মান ও তুরস্ক মিশনের সমর্থন লাভ করে। ইহা ১৯১৫ সনের ঘটনা। কিন্তু উপযুক্ত সাহায্যের অভাবে এই পরিষদ টিকিল না। ওবিদুল্লার স্বপ্ন ব্যর্থ হইল। উত্তর পশ্চিম সীমান্তে মুসলমানদের এই বিপ্লবের দুর্ব্বল প্রচেষ্টা অত্যন্ত করুণ পরিসমাপ্তি লাভ করে।

(ঘ)

১৯০৮ খৃঃ আরম্ভ। ক্ষুদিরামের বোমা বাংলায় এক মহাপ্লাবনের সূত্রপাত করে। তাহার পর একে একে আলিপুরে বোমার মামলা, বালেশ্বরে খণ্ডযুদ্ধ, রডা কোম্পানী—অগ্নিযুগের ইতিহাসের এক একটি মহান অধ্যায় রক্তাক্ষরে লেখা হইয়া যায়।

কিংসফোর্ডের বদলে মিসেস ও মিস কেনেডী নামে দুই মহিলা নিহত হয়। প্রফুল্ল ওরফে দীনেশ চাকী আত্মহত্যা করে, ক্ষুদিরাম ধরা পড়ে ও বিচারে তাহার ফাঁসী হয়।

দ্বিতীয় ঘটনা বিহারে নিমেজের মহান্ত হত্যা। জয়পুরের স্কুলের ছাত্র, বোম্বাইবাসী মতিচাঁদ ও লালচাঁদ ও তাহাদের দুই সঙ্গী ১৯১৩ খৃঃ নিমেজের মহান্তকে হত্যা করে। তাহাদের শিখাইয়া দেওয়া হয় যে এই সব মহান্তরা খুব ধনী এবং ইঁহাদের হত্যা করিলে দেশের কাজের জন্য অনেক অর্থ পাওয়া যায়। নিমেজের মহান্ত নিহত হইলেন বটে, কিন্তু হত্যাকারীরা তাঁহার কাছে কোন অর্থই পায় নাই।

মধ্যপ্রদেশ :—

এখানে কোন বৈপ্লবিক ঘটনা ঘটে নাই।

ভারতীয় মুসলমান :—

ভারতীয় মুসলমানগণ স্বক্রিয়ভাবে স্বদেশী আন্দোলনে কখনও যোগ দেয় নাই। বরং নানা ভাবে বাধা দেয় কিন্তু তুরস্কের বিরুদ্ধে ইংরাজ যুদ্ধ ঘোষণার পর মুসলমানরা ইংরাজের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করে। কিন্তু এই আন্দোলন কখনও বিপ্লবের আকার ধারণ করে নাই। প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে কয়েকটি মুসলমান পরিবার পাঞ্জাব হইতে বাহিরে গিয়া কাবুল এলাকায় বসবাস আরম্ভ করে এবং তাহারা সকলেই আরবের ওয়াহাবী সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমত গ্রহণ করে। ইহারা সুন্নীদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত সম্প্রদায় ছিল। তাহাদের মতে যে দেশে মুসলমানের শাসন নাই সেখানে মুসলমানের

বাংলার বৈপ্লবিক দলগুলি এবং গুরুজিৎ সিং ও পিংলে সাহায্য করিত। পাঞ্জাবের অধিবাসী শিখরা কেহই এই বিপ্লবে অংশ গ্রহণ করেন নাই। এই গদর আন্দোলনের অগ্নিময় ইতিহাস লেখা হয় হরদয়াল কর্তৃক উদ্বুদ্ধ সেই সব শিখদের দ্বারা যাঁহারা দেশের বাহির হইতে দেশপ্রেমের মন্ত্র বহিয়া আনেন। কিন্তু ভারতমাতার প্রতি দেশপ্রেমের এই অর্ঘ্য সফলতার দ্বারে আসিয়াও শুকাইয়া যায় কিন্তু গদররা দলে দলে রক্ততর্পণ করিয়া জানাইয়া গিয়াছে দেশের বাহিরে থাকিয়াও দেশকে কতখানি ভালবাসা যায়। হরদয়াল, রামচন্দ্র, রাসবিহারী, শচীন সান্যাল, ভাই পরমানন্দ, গুরুজিৎ সিং, পিংলে যে দাবানলের সৃষ্টি করেন, ইংরাজ নেহাত সহজে সে আগুন নিবাইতে পারে নাই।

বিহার ও উড়িষ্যা ঃ—

বিহার বৈপ্লবিক আন্দোলন হইতে মুক্ত ছিল যদিও ভারত-বিখ্যাত দুইটি ঘটনা এইখানেই ঘটে। কিন্তু ঘটনা দুইটি বাহিরের লোক দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রথম ঘটনা ১৯০৮ খৃঃ বিহারের মজঃফরপুরে শ্রীযুক্তা ও শ্রীমতী কেনেডী হত্যা। বিহারে হইলেও বাংলার বিপ্লবীরা ইহা করে। কিংসফোর্ড ছিল কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট এবং তাহার পূর্ব্বে ছিলেন মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট। এই দুই স্থানেই তিনি রাজনৈতিক বন্দীদের অত্যন্ত নির্য্যাতন করেন। বিপ্লবীরা স্থির করেন কিংসফোর্ডকে হত্যা করিতেই হইবে। কিংসফোর্ড তখন মজঃফরপুরে বদলী হইয়াছেন। ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী তাঁহাকে হত্যার উদ্দেশ্যে মজঃফরপুরে গিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু ভুলক্রমে তাহাদের বোমার আঘাতে

মামলাতেই হয়। এ সমস্তই হয় ১৯১৪ হইতে ১৯১৫, এক বৎসরের মধ্যে। ১৯১৬ খৃঃ জুলাই মাসে বিচার শেষ হইবার সাথে সাথেই পাঞ্জাবের সমস্ত আন্দোলন স্তিমিত হইয়া যায়।

ইতিমধ্যে হরদয়াল তাঁহার প্রচার থামান নাই। ইংরাজের অনুরোধে আমেরিকা ভারতীয় বিপ্লবীদের গ্রেপ্তার আরম্ভ করে এবং ধৃত ব্যক্তিদের নিয়া "সানফ্রানসিসকো বিচার" হয় এবং অনেকের জেলও হয়। কিন্তু হরদয়াল গ্রেপ্তার হইবার পূর্ব্বেই সুইজারল্যাণ্ড পলাইয়া যান। হরদয়াল চলিয়া যাইবার পরে রামচন্দ্র সানফ্রানসিসকো হইতে কিছুদিন প্রচার কার্য্য চালান। পাঞ্জাব বিচারে রাসবিহারী গ্রেপ্তার এড়াইয়া নিরুদ্দেশ হন। বেনারসে শচীন সান্যালের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়। পরে লক্ষ্ণৌতে একটি বিচারে পিংলের ফাঁসী হয়। পাঞ্জাবে বিপ্লবীগণ ইংরাজের ইতিহাসের সর্ব্বাপেক্ষা লজ্জাজনক অধ্যায় রচনা করে কিন্তু বিশ্বাসঘাতকদের আকস্মিক আঘাতে সেই ইতিহাস অলিখিতই থাকিয়া গেল।

দেখা গিয়াছে পাঞ্জাবের শিখেরা বরাবরই ইংরাজের অনুগত ছিল। ১৮৫৭ খৃঃ সিপাহী বিদ্রোহে ইংরাজের গবর্ণর লরেন্সের আদেশে শিখেরাই ইংরাজদের সিপাহীদের হাত হইতে উদ্ধার করে। এবারেও আবার শিখেরাই ইংরাজদের প্রতি প্রভুভক্তি দেখাইয়া ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধের গতিরোধ করে। গদরের পর পাঞ্জাব অকস্মাৎ যে সংহার মূর্ত্তি ধারণ করে তাহা সম্বরণ করিয়া শান্ত হইয়া যায়।

পাঞ্জাবে যে সিপাহী বিদ্রোহের অবতারণা হয় তাহার প্রধান হোতা ছিলেন পাঁচজন নেতা—সানফ্রানসিসকোর হরদয়াল, দেরাদুনের রাসবিহারী বোস, বেনারসের শচীন সান্যাল, যাঁহাকে

স্থানে বিদ্রোহ আরম্ভ করিবে। পাঞ্জাবের নেতারা ছাড়াও আমেরিকা হইতে পিংলে নামক আর একজন গদর আসিয়া নেতৃত্ব ভার গ্রহণ করেন। তাঁহার উপর ভার ছিল সম্মুখস্থ জঙ্গী এলাকায় যে সমস্ত সৈন্যদল অবস্থিত ছিল তাহাদের মধ্যে বিদ্রোহের সঞ্চার করা। বেনারসের শচীন সান্যালও এসব গুরুত্বপূর্ণ কাজের নেতা হন। কিন্তু আসল নেতৃত্ব ছিল রাসবিহারী বোসের হাতে। তাঁহার কাজ ছিল বিভিন্ন সৈন্যদলের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করিয়া সমস্ত বিদ্রোহটিকে সুশৃঙ্খল ভাবে সাফল্যের পথে লইয়া যাওয়া। এমন কি ভারতের পূর্ব সীমান্ত ঢাকাতে পর্য্যন্ত সর্ব্বপ্রকার সংবাদ সরবরাহ করা হইত। বিপ্লবীরা সকলের অগোচরে অতি গোপনে এক বিরাট স্বাধীনতা যজ্ঞের আয়োজন করেন। কিন্তু ইংরাজের ভাগ্য, এমন আয়োজনের মধ্যেও মীরজাফর আবার সাড়া দিল। ২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৯১৫ ছিল এই সৈনিক অভ্যুত্থানের তারিখ। একজন বিশ্বাসঘাতক পুলিসের কাছে এই গোপন খবর প্রকাশ করিবার চেষ্টা করে। নেতারা তাহার কথা পূর্বেই জানিতে পারিয়া সমস্ত প্রকাশ করিবার আগেই তাহাকে হত্যা করেন কিন্তু মরিবার পূর্ব্বে সে উচ্চঃস্বরে "২৪শে ফেব্রুয়ারী" তারিখটী সঙ্গের পুলিসকে জানাইয়া দেয়। কথাটি প্রচার হইবার সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দ্দিকে ধরপাকড় আরম্ভ হয়। সেনাবিভাগে কোর্টমার্শাল বসে। পাঞ্জাবে এত গ্রেপ্তার হয় যে রাজবন্দীদের নয়টি দলে বিভক্ত করিয়া তাহার পর বিশেষ বিচারালয়ে তাঁহাদের বিচার হয়। বিচারে আঠাইশ জনের ফাঁসী হয়, উনত্রিশ জন ছাড়া পায় এবং অন্যান্য সকলের বিভিন্ন প্রকারের দণ্ড হয়। পাঞ্জাবে সর্বসমেত ১৪৭ জনের বিচার হয়। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লবী নেতা ভাই পরমানন্দের বিচার প্রথম ষড়যন্ত্র

গ্রামে নানা প্রকার খেলাধুলা খুব হইত। শুনিয়াছি আগে ক্রিকেট খেলাও হইত, পরে অবশ্য ফুটবল খেলারই প্রাধান্য হয়। ক্রিকেট খেলা ছিল ব্যয়সাধ্য। তাহার পর জলজঙ্গলের স্থান বিক্রমপুরে এই খেলাটি বেশী জনপ্রিয় হয় নাই। তবু সেখানে এই খেলা হইত, শীতকালই ইহার পক্ষে প্রশস্ত সময় ছিল। আমাদের গ্রামেও ক্রিকেট খেলার কিছু প্রচলন ছিল।

ফুটবল খেলার জন্যে আমাদের গ্রামে সোনারঙ্গ সেপার্টি ইউনিয়ন নামে একটি ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়। ধীরেন সেন ও ক্ষিতিশ সেন উদ্যোগী হইয়া গ্রামবাসীদের নিকট হইতে চাঁদা আদায় করিয়া এই ক্লাবের পত্তন করেন। বিদ্যালয় সংলগ্ন মাঠেই খেলা হইত। বিকালে অনেক ফুটবলোৎসাহী যুবক আসিত, বিশেষ করিয়া গ্রীষ্মাবকাশের সময় এত বেশী আসিত যে সকলকে এক সময় খেলায় নেওয়া সম্ভব হইত না। বাইশ জন খেলোয়াড় বাদ দিয়াও পনেরো কুড়িজন আরও মাঠের বাহিরে দর্শক হিসাবে দাঁড়াইয়া থাকিত। সমস্ত বিক্রমপুরে এই খেলা অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। প্রায় প্রতি গ্রামেই ফুটবল প্রতিযোগিতা হইত। আমরা সব সময়েই নিকটবর্ত্তী গ্রামগুলিতে এই সব প্রতিযোগিতায় যোগ দিতাম। খেলার মরশুম ছিল শীতের শেষে ও বর্ষার প্রারম্ভে। বর্ষার সময় মাঠঘাট জলে প্লাবিত হইয়া গেলে আর খেলা সম্ভব হইত না।

ইহা ছাড়া স্কুলে ব্যাডমিণ্টন খেলাও হইত এবং অনিল সেন, তারক সেন, নীরেন সেন, ধীরেন সেন, সুরেশ রায় প্রমুখ যুবকেরা কিছু দিনের জন্য টেনিসও আরম্ভ করে।

কিন্তু এই সব বিদেশীয় খেলা আসিবার পূর্ব্বে আমাদের দেশী খেলাই আমাদের প্রধান আকর্ষণ ছিল। ডুগুডুগু, গোল্লাছুট, লোস্তা,

বৌবাছি, লুকপলান্তি, দাইরা-বান্দা—এইসব খেলাই আমরা খেলিতাম এবং খরচও কিছু ছিল না। ডুগুডুগু খেলাতে মুখ দিয়া ধ্বনি করিতে হইত। নানা প্রকার ধ্বনি ছিল। একটি মনে আছে—"আমার খেরু মারিয়া কিবা পাইলি সুখ, লাইথাইয়া ভাঙ্গুম তোর পাটাতনের বুক।" এই সব খেলার বিশেষত্ব ছিল এই যে গ্রীষ্মের প্রখরতা বা বর্ষার সিক্ততা—সর্ব পরিবেশই এই খেলাগুলির পক্ষে প্রশস্ত ছিল। বর্ষায় যখন ফুটবল, ক্রিকেট প্রভৃতি বন্ধ হইয়া যাইত তখন এই সব খেলাই আমাদের প্রধান অবলম্বন ছিল। বর্ষায় কতকগুলি জলক্রীড়াও খুব জনপ্রিয় ছিল। এগুলি জলের খেলা। যেমন নলডুবন্তী, পুকুর বা খালপারের গাছ হইতে জলে ঝাঁপাইয়া পড়া (আধুনিক কালের স্প্রিং বোর্ড ডাইভিং আর কি!) সাঁতরাইয়া পুকুর পার হওয়া, কলাগাছের ভেলা ধরিয়া সাঁতার কাটা ইত্যাদি। কিন্তু সর্বাপেক্ষা আনন্দদায়ক ছিল বিকালে দল বাঁধিয়া নৌকাবাইচ খেলা। দলে দুই তিনটি নৌকা থাকিত। পাট কাটা ও ধোয়া হইয়া যাইবার পর পরিস্কার অবরোধহীন জলে যাহাকে বলিতাম "ছৈল" জল, এই প্রতিযোগিতামূলক বাইচ খেলা খুবই আনন্দদায়ক ছিল। পরে যখন সমস্ত বিক্রমপুরের নদী নালা খাল বিল সমস্ত কচুরীপানায় ভরিয়া গেল, তখন হইতেই সুরু হইল এই সব প্রধান জলক্রীড়ার অপমৃত্যু। আধুনিক বালক এইসব জলক্রীড়ায় সম্পূর্ণ বঞ্চিত।

গ্রামে শীতে আর একটি খেলা ছিল ঘুড়ি উড়ানো। বিক্রমপুরে এই ঘুড়ি উড়ান অগ্রহায়ণের শেষে শুরু হইয়া মাঘে সরস্বতী পূজার দিন শেষ হইত। বাজার হইতে রায় বাহাদুর আনন্দ ডেপুটির বাড়ী পর্য্যন্ত একটু উচু গ্রাম্য পথ ছিল, তাহাকে আমরা

বলিতাম "দরজা"—এই "দরজাতেই" লোকে ঘুড়ি খেলিবার জন্য একত্রিত হইত। এতদ্ব্যতীত অনেকে নিজেদের বাড়ী হইতে বা নিকটস্থ কোন মাঠ হইতেও ঘুড়ি উড়াইত। তবে এই ঘুড়ি উড়ানও বৎসরের তুইটি দিনে বিশেষ জাকজমকের সহিত প্রায় এক উৎসবের আকার ধারণ করিত পৌষ সংক্রান্তি ও সরস্বতী পূজার দিন। এই তুই দিনই বেলা দশটা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আকাশ অজস্র ঘুড়ির বর্ণচ্ছটায় উদ্ভাসিত হইয়া থাকিত। ঘুড়ির আবার নানা নাম ছিল যথা একাইনা, আধাইনা, চাপলাম, পেটকাট, পঙ্খীরাজ, কোতইর খোপা, টিকাপোড়া, দোবাজ, তেবাজ, নাক্কা ইত্যাদি। এর জন্য সুতা লাটাইতে জড়াইয়া রাখিতে হইত। সূতায় মাঞ্জা দেওয়া একটা শিল্পবিশেষই ছিল বলা চলে। গ্রামে তারক সেন, ধীরেন সেন, সুরেশ রায় প্রভৃতি ঘুড়ি উড়াইতে দক্ষ ছিলেন। বাজারের ট্যাপা গোঁসাই ও কাঁইলা ভুঁইমালী দক্ষ ঘুড়ি-প্রস্তুতকারী বলিয়া খ্যাত ছিল। ঘুড়ি উড়ানোকে দেশের ভাষায় "ভোন" করা বলা হইত। যখন ঘুড়ি উপরে উঠিয়া আপনা হইতেই উড়িতে থাকিত তখন তাহাকে বলিত ঘুড়িটি "বানাডুলি" পাইয়াছে। ঘুড়ি কাটা গেলে, সূতা গুটাইয়া আনাকে বলিতাম "ঘেরা" দিয়া আনা। ঘুড়ি কাটাকে বলিতাম বোকা। মাঝে মাঝে তুই দলে ঘুড়ি উড়ানোর প্রতিযোগিতাও হইত। এক বার সোনারঙ্গের সহিত টঙ্গীবাড়ী গ্রামের প্রতিযোগতিা হয় কাজলার মাঠে। আর এক বার সাহাদ আলি ও দূর্গা সেনের মধ্যে প্রতিযোগিতা হয়। প্রতি দলে পাঁচ জন করিয়া খেলোয়াড় ছিল এবং তুই দলের ঘুড়ির রংও ভিন্ন ছিল।

গ্রীষ্মাবকাশে বাহির হইতে যুবকেরা গ্রামে ফিরিলে তখন গ্রামে অনেক নাটক ইত্যাদি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হইত।

বিদ্যালয়েও এই সময়ে গ্রীষ্মাবকাশের পূর্বে ঠিক ছুটি আরম্ভ হইবার দিন পুরস্কার বিতরণ এবং অভিনয়াদি হইত। বহিরাগত যুবকবৃন্দ ছাত্রদের অভিনয় শিখাইতেন, বিশেষ চারু রায় ও জিতেন দাসগুপ্ত। মার্চেণ্ট অব্ ভেনিস, কিং হেনরী দ্য এইট্থ্, সিদ্ধার্থ প্রভৃতি বিখ্যাত নাটক হইতে কিছু দৃশ্য অভিনীত হইত। তবে গ্রামের মঞ্চে বিল্বমঙ্গল, সিরাজ-উদ্দৌলা, দুর্গাদাস, চন্দ্রগুপ্ত, রিজিয়া প্রভৃতি বিশেষ আড়ম্বরের সহিত অভিনীত হইতে দেখিয়াছি।

গ্রামে সাধারণতঃ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা, বৃদ্ধেরা এবং স্ত্রীলোকেরাই থাকিত। কর্মক্ষম ব্যক্তিগণ অর্থোপার্জনের জন্য প্রবাসেই থাকিতেন। শুধু বিদ্যালয়ের শিক্ষক, ডাকঘরের কর্মচারী ও দোকানদারই বলিতে গেলে গ্রামের সক্ষম মানুষের মধ্যে ছিলেন। দোকানদার অন্য গ্রামের লোক, তাই গ্রামের সহিত তাহার কোন সংস্রব ছিল না। চাষের জমি গ্রামে না থাকায় গ্রামে কৃষক সম্প্রদায়ের নিতান্তই অভাব ছিল। আর ছিল ধোপা, নাপিত, ছুতার, কামার, কুমার, ভুঁইমালী, বাদক (ঋষি) ইত্যাদি যাহারা মধ্যবিত্ত ভদ্রশ্রেণীর জীবনযাত্রায় নিতান্তই অপরিহার্য্য। কাজেই জীবনযাত্রা এক রকম সহজই ছিল। বাঁচিবার জন্য সংগ্রাম তাই গ্রামবাসীদের উপর বিশেষ পড়িত না। তাহা বাহিরে উপার্জনরত প্রবাসীদেরই প্রাপ্য তালিকার অন্তর্গত ছিল। দিনের শুরুতে সকলে ডাক নিবার জন্য ডাকঘরে সমবেত হইতেন। তাহার পর বাজারে যাওয়া, মধ্যাহ্ন ভোজন, দিবানিদ্রা, বৈকালিক ভ্রমণ বা সন্ধ্যায় কোন ধর্মীয় বা সামাজিক অনুষ্ঠান থাকিলে তাহাতে যোগদান,

গ্রন্থপাঠ ও আলোচনা। অতঃপর রাত্রে ভোজন ও নিদ্রা। এই ছিল দৈনিক জীবনের রূপ। ছেলেরা খেলাধূলায় এবং গৃহিণীরা গৃহকার্য্যেই সারাদিন ব্যস্ত থাকিতেন। কিন্তু তবু ইহারই মধ্যে বৈচিত্র্যও ছিল। প্রকৃতপক্ষে এই ছোটখাটো বৈচিত্র্যগুলিই গ্রামের নিস্তরঙ্গ জীবনে তরঙ্গ তুলিত। সেই গভীর শ্যামল শান্তিতে ইহারাই পদ্মশাপলার রং ধরাইত। শোনা গেল, আজ টঙ্গীবাড়ীতে যাত্রা হইবে, সমস্ত গ্রাম ভাঙ্গিয়া সকলে যাইত যাত্রা শুনিতে। খবর পাওয়া গেল যে নয়নন্দ গ্রামে দুই মাথাওয়ালা একটি গরু জন্মিয়াছে—যতদিন এই গরুটি বাঁচিল, দুই এক দিনের বেশী নয়, ততদিন সকলেই গিয়া গরুটিকে দেখিয়া আসিল এবং তাহারই আলোচনায় সব চণ্ডীমণ্ডপ বারোয়ারী তলা প্রভৃতি একেবারে সরগরম রহিল। গ্রামের দেড় মাইল দূরে রঘুরামপুরে দুটি পুষ্করিণীর মধ্যে খনন করিয়া প্রচুর ঐতিহাসিক তৈজসপত্র পাওয়া গেল। এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও জানা গেল যে পঞ্চসারের পরেশ মহলানবীশ গণনা করিয়া এই আবিষ্কার করয়িাছে। সরকার প্রথমে এই গণনাতে কর্ণপাত করে নাই। কিন্তু পরে এই গণনার উপর নির্ভর করিয়া খনন করাইলে ঐ সব তৈজসপত্র বাহির হইয়া। বর্ষা আরম্ভ হইলে খনন কার্য্য স্থগিত থাকে। কিন্তু আশেপাশের গ্রামে এই আবিষ্কার প্রচুর উত্তেজনা আনিল বৈকি। বর্ষা পর্য্যন্ত দুই মাস ঐ জায়গাটিতে ভীড়ের কোন ঘাট্‌তি ছিল না।

গ্রামজীবনে বোধহয় সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ছিল জাতি-ধর্মবর্ণ - নির্বিশেষে পরস্পরের মধ্যে একটা নিবিড় আত্মীয়তা বোধ। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের ভাই, দাদা, কাকা, মামা জ্যাঠা, ঠাকুমা, দাদু,—সে মুসলমানই হউক, হিন্দুই হউক আর নমঃ শূদ্রই হউক।

একের সুখে সকলেই সুখী হইত এবং অপরের দুঃখে সকলেই আন্তরিক ভাবে সমবেদনা প্রকাশ করিত। তাহাতে আর যাহাই থাকুক এই যন্ত্র সভ্যতার ভেজাল ছিল না। চুরি ডাকাতি হইত না বলিলেই চলে। ছেলেবেলায় ডাকাতির কথা একেবারেই শুনি নাই। পরে অবশ্য কিছু কিছু হইয়াছে। কিন্তু তাহাও প্রায় সবই ছিল "স্বদেশী ডাকাতি"। তাহারা যাইবার সময় বলিয়া যাইতেন "এই অর্থ দেশের কার্য্যের জন্য নিয়া গেলাম, সম্ভব হইলে পরে শোধ দিব"। অন্য কোন অত্যাচার ইহারা করিতেন না। চুরির খবর মাঝে মাঝে শুনা যাইত, তবে তাহার সংখ্যাও খুব কম।

কিন্তু সামাজিক অনুশাসন ছিল বড় কুসংস্কারগ্রস্থ ও ভিত্তিহীন বিচারহীনতায় ক্লীষ্ট। এই শাসনের বহু দৃষ্টান্ত আমরা দেখিয়াছি। তাহার মধ্যে দুইটি উদ্বৃত করিলে হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। একজন গ্রামবাসী ১৯০৫ সালে বিলাতে শিক্ষালাভ করিয়া গ্রামে আসিলেন। সমাজ অনুশাসন দিল শাস্ত্রসম্মতভাবে প্রায়শ্চিত্ত না করিলে তাঁহার গ্রামস্থ আত্মীয়বর্গ তাঁহার সহিত এক হাঁড়িতে খাইতে পারিবেন না, যদি আহারাদি করেন, তাহা হইলে এই ব্যক্তির সহিত তাহাদের "একঘরে" হইতে হইবে। এই ভদ্র লোকটি কিছুদিন গ্রামের বাহিরে বিদ্যালয় বাটিতে থাকিয়া সোজা আপন গৃহে আসিয়া উঠিলেন এবং ফলতঃ তাহারা বাড়ীশুদ্ধ সকলেই একঘরে হইয়া গেলেন। কয়েক বছর পর আবার তিনি বিলাতে গেলেন। কিন্তু এইবার ফিরিয়াই তিনি বিধিমতে প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। এবং অতঃপর বিবাহাদি করিয়া সমাজে বাস করিতে লাগিলেন। এ প্রায় ষাট পঁয়ষট্টি বৎসর আগেকার কথা। পরবর্ত্তী কালে এই পরিবারেরই আট দশ জন যুবক বিলাত গিয়াছিলেন কিন্তু

তখন প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থায় অনেক শিথিলতা আসিয়া পড়িয়াছে। বিলাত যাওয়া আর প্রায়শ্চিত্ত করিবার মতো অপরাধ গন্য করা হইত না।

আর একটি ঘটনা — বোধ হয় ১৯২০-২৫ সালের মধ্যে। আমাদের গ্রামের একটি যুবকের বিবাহ হইল ময়মনসিংহ সের পুরের জমিদার গৃহে। বরপক্ষ মহাকুলীন আর সাধারণতঃ সোনারং এর বৈদ্যদের সহিত সেরপুরের বৈদ্যদের বিবাহ সমাজে নিষিদ্ধ ছিল। তবু বহু টাকার বিনিময়ে এই বিবাহ সম্ভব হইয়া ছিল। সমাজ ক্ষতিপূরণ বাবদ বেশ কিছু টাকা দাবি করিল। কিন্তু বরপক্ষ এই টাকা দিতে রাজী না হওয়াতে "একঘরে" হইয়া গেল। কিন্তু সমাজ আর পচিশ বৎসর পূর্ব্বেকার সমাজ নাই। তাই সমাজের এই শাসন আর কার্য্যকারী হইল না।

এই ছিল আমাদের গ্রামের স্বাভাবিক জীবন যাত্রা। আমরা আমাদের ছেলেবয়েস পর্য্যন্ত এইরূপ দেখিয়াছি। কখনো অসম্ভব মনে হয় কিন্তু এই সবই আমি নিজে ঘটিতে দেখিয়াছি। আজ কালকার জীবনে স্বতঃই প্রশ্ন জাগে এইসব utopion কাহিনী-বাস্তব জীবনে সম্ভব হয় কি? ইহার একমাত্র উত্তর আমি যে গ্রামের কথা বলিলাম, সেখানে, বর্ত্তমান জীবনের যে প্রধান সমস্যা, বাঁচিয়া থাকিবার যুদ্ধ সেটি ছিল না। এই যুদ্ধ হইতেই তো জীবনের সমস্ত সমস্যার উদ্ভব। তাই আমাদের শান্ত নিরুদ্বেগ, অভিযোগহীন গ্রাম্য জীবনে আজ যাহা utopia মনে হয়, তাহা বাস্তব ছিল।

তাহার পর ধীরে ধীরে পরিস্থিতি বদলাইতে লাগিল। আমি যে গ্রামের পরিচয় দিলাম, তাহা ১৯১৪ খৃঃ যে গ্রামকে দেখিয়া কলেজে পড়িতে গিয়াছিলাম। ১৯২৫ খৃঃ ফিরিয়া আসিয়া

সেই রূপ আর দেখা যায় নাই। ১৯৩৩ খৃঃ দেখা যায় গ্রামের অবস্থা আরো খারাপ। ১৯৩৪ খৃঃ আবার গিয়া দেখি গ্রাম অতীত-সর্ব্বস্ব হইয়া গিয়াছে। ধূলিমলিন, জীর্ণদশাগ্রস্থ গ্রামকে তখন একেবারে শ্মশান মনে হয়। গ্রামপথে আর লোকজন নাই। গ্রাম তখন প্রায় জনশূন্যই হইয়া গিয়াছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকই গ্রামের পরিপূর্ণ সময়, তবে তাহা বোধ হয় নির্ব্বানোম্মুখ প্রদীপের শেষ তীব্রতা। তাহার পর হইতেই গ্রাম ক্রমশঃ এক শান্ত অথচ সুনিশ্চিত ও অপ্রতিরোধ্য গতিতে ক্ষয় ও ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। ১৯৩৪ সনে আমি সেই মৃত্যুপথিক গ্রামের সুজীর্ণ বার্দ্ধক্যই প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছি মাত্র শেষ বারের মত। তাহার পর আর গ্রামে যাই নাই।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মহিলাদের ব্রতকথা ও গৃহপূজার কথা :—

গ্রামের মহিলাদের কথা কিছুই না বলিলে আমার প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ থাকিবে। আমি দেখিয়াছি আগেকার দিনে ধনী-দরিদ্র সকল ঘরেই মহিলারা সপ্তাহের কোন না দিনে ব্যক্তিগত ভাবে বা সংঘবদ্ধ ভাবে একটা না একটা ব্রত পালন করিতেন। এই সব ব্রতাদিতে কোন পুরোহিতের প্রয়োজন হইত না, নিজেদের ঝুলি হইতেই অফুরন্ত গল্প, গাঁথা বাহির হইত। কয়েকটির নাম আমার মনে আছে, যথা—মঙ্গলচণ্ডী, নাটাইচণ্ডী, ললিতা সপ্তমী, অনন্ত চতুর্দ্দশী—এগুলি সাধারণতঃ বড়দের। ছোটদেরও ছিল, যেমন

এক বৎসর বা দুই বৎসর বয়স হইতেই মাঘ মাসে মাঘমণ্ডলের ব্রত করিত। মাঘ মাসে প্রতিদিন প্রাতে মা মেয়েকে নিয়া পুকুরঘাটে গিয়া ফুল বেলপাতা দিয়া সূর্য্যপ্রণাম করাইতেন, তাহার পর বাড়ীতে আসিয়া গৃহপ্রাঙ্গণে চন্দ্র সূর্য্যের মূর্ত্তি আঁকিয়া তাহাতে নানা রং ও চাউলের গুড়িতে বিচিত্রিত করিয়া "মাঘমণ্ডল সোনার কুণ্ডল" শ্লোক আবৃত্তি করিয়া পূজা করাইতেন। পাঁচ বৎসর পূর্ণ হইলে এই ব্রত শেষ হইয়া আরম্ভ হইত তারার ব্রত। বিকালবেলা উঠানে পিটুলীগোলা দিয়া তারামণ্ডল আঁকিয়া সন্ধ্যাবেলা তারা উঠিলে ব্রত করিত। এই ব্রতও পাঁচ বছর ধরিয়া করিত। বড়দের প্রথম ব্রত আরম্ভ হইত সুবচনীর ব্রত দিয়া, অর্থাৎ সুবচনীর তেল সিঁদুর দেওয়া। সধবা মহিলারা পুকুর পাড়ে একত্রিত হইয়া সুবচনী দেবীর কথা বলিতেন ও পরে তেল মাখিয়া স্নান করিয়া পরস্পর পরস্পরের সিঁথিতে সিঁদুর পরাইয়া গৃহে ফিরিতেন। কোনদিন আবার ছোট ছেলেমেয়েদের পাড়ায় পাঠাইয়া চাউল সংগ্রহ করিতেন। এই চাউল গুড়া করিয়া খই, চিড়া, দই ইত্যাদি নিয়া কোন কুলগাছের নীচে সকলে একত্রিত হইয়া ব্রতকথা বলিতেন এবং খাওয়াদাওয়ার পর বাড়ী ফিরিতেন। ইহার নাম ছিল ঘেত্তরের ব্রত। আরও একটি ব্রত ছিল, তাহার নাম এখন মনে নাই, তবে ঘেত্তরের ব্রতেরই বৃহত্তর সংস্করণ ছিল। মহিলার সংখ্যা হইত আরও বেশী এবং স্থানও হইত আরও বড় জায়গায়, কোনও দিঘীর পাড়ে।

আরও এক রকম খুব কৌতূহলোদ্দীপক ব্রত দেখিয়াছি, তাহারও নাম মনে নাই। সব মহিলারা একত্র হইয়া ধানদূর্ব্বা ঘট বসানো একখানা কুলা নিয়া বাড়ী বাড়ী ঘুরিতেন। দলটি

বাড়ীতে আসিলেই গৃহস্থ প্রাঙ্গনে জল ঢালিয়া দিতেন। কুলাধারিণী ঐ ধৌত স্থানে কুলা রাখিলে সবাই উহার চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিয়া নাচিয়া গান করিতেন।

দিবানিদ্রার পর প্রায় সব মহিলারাই কড়ি খেলিতেন। দশ-পঁচিশ, টোক্কাটাক্কি, কাটাকুটি, কড়ি খেলার এই সব নাম ছিল। কিছুক্ষণ খেলার পরে বিকালে তাহারা সবাই পরস্পরের চুল বাঁধিয়া দিতেন এবং গৃহ হইতে কলসী নিয়া স্নান করিতে যাইতেন, এই ছিল তাহাদের দৈনন্দিন কাজ। এইবার মহিলাদের শীতলা পূজায় আমার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়া এই অধ্যায় শেষ করিব। পোস্ট-অফিসের বড় পুকুরের ধারে একটা নামানো গাছ ছিল এবং তাহার একটি ডাল পুকুরের মধ্যে অনেকখানি আসিয়া পড়িয়াছিল। একদিন দ্বিপ্রহরে—স্কুল ছুটি ছিল, না স্কুল হইতে পালাইয়া তাহা মনে নাই—ঐ ডালটার উপরে বসিয়া মহানন্দে ঝুলিতেছি, এমন সময়ে বন্ধুপ্রবর টোনা নৌকা বাহিয়া ডালটার নীচে আসিল। আমাকে দেখিয়াই লগি বাগাইয়া টোনা বলিয়া উঠিল, "নাম্ তো নাম্, নয় এই চৈর দিয়া বাইরাইয়াই তোরে নামামু।" কি আর করি, গাছে ঝুলিতেছি পলাইবার পথ নাই, ঘুর ঘুর করিয়া নৌকায় গিয়া উঠিলাম। তখন বর্ষাকাল, খালবিল, নদীনালা সব জলে টইটুম্বুর হইয়া আছে। পুকুরপাড়ে দেখি মেয়েরা ফুল বেলপাতা ও অন্যান্য পূজার সামগ্রী নিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহাদের নৌকাতে নিয়া পূজাস্থান পশ্চিম ভুঞাবাড়ীর পলাশ তলায় গিয়া উপস্থিত হই। সেখানে দেখি আরও অনেক মহিলা উপস্থিত আছেন। পুরোহিত আসিয়াছেন, মহেশ মণ্ডলীও আসিয়াছে। অনেকক্ষণ ধরিয়া পূজা হইল। আমরা একটা গাছের উপর বসিয়া পূজা দেখিলাম।

তাহার পর প্রসাদ নিয়া বাড়ী চলিয়া আসিলাম। এই পূজার বিশেষত্ব হইল, ইহা হইল মহিলাদের পূজা। অন্য বড় বড় পূজার সবটাতে পুরুষেরা অংশ গ্রহণ করে কিন্তু এই পূজাটি বড় হইলেও পুরুষের কোন স্থান ইহার মধ্যে নাই। ইহা ব্যতীত গ্রামের বয়স্থারা প্রভাতে শিবপূজা এবং সন্ধ্যায় সায়ং সন্ধ্যা করিতেন। গৃহস্থ বধুরা প্রতি সন্ধ্যায় শঙ্খধ্বনি করিয়া তুলসী তলায় সন্ধ্যাপ্রদীপ দিতেন।

আধুনিকতা আসার সাথে সাথেই এই সব প্রাচীন প্রথা ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়া যায়।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

গ্রামের মুসলমানদের কথা ঃ—

আমার প্রবন্ধে শুধু হিন্দুদের কথাই উল্লেখ করিয়াছি, মুসলমানদের কথা কিছু উল্লেখ করি নাই। তাহারা গ্রামের বাহিরের দিকের অনেকটা অংশ জুড়িয়া বাস করিত। উহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই ছিল সমাজের নিম্ন শ্রেণীর। তাহারা দিন মজুরের কাজ ও কৃষিকার্য্য করিয়া জীবিকা অর্জন করিত। কিছু লোক ব্যবসা করিত। তাহাদের বলা হইত ব্যাপারী। ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল মিঠ ব্যাপারী ও বেনু ব্যাপারী। পাঁচু ও আহমদ একটু লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন, বোধ হয় চতুর্থ শ্রেণী পর্য্যন্ত। পাঁচু ব্যাপারী বিদ্যালয় কমিটি ও ইউনিয়ন বোর্ডের

একজন সদস্য ছিলেন, কারণ নূতন নিয়মানুযায়ী একজন মুসলমান সদস্য নিতে হইত। বিদ্যালয়ে মুসলমান ছাত্র কম ছিল। ৩০০।৪০০ শত ছাত্রের মধ্যে হয়ত বা দশজনের বেশী নহে। তাহারাও দুই তিন বৎসর পড়িয়া আবার বিদ্যালয় ছাড়িয়া যাইত। আমাদের সময়ে দুইটি ছেলেকে ম্যাট্রিক পাশ কবিতে দেখিয়াছি। শেখ কুটি মিঞা ও শেখ সাহাদ আলি। মুসলমানদের সমাজের বিশেষ কোন খবর রাখিতাম না। ইহার একটা কারণ এই যে আমাদের বসতি ও মুসলমানদের বসতির মধ্যে বেশ কিছুটা দূরত্ব ছিল এবং মাঝখানে ছিল চাষবাসের জমি। তাই যাতায়াত খুবই কম ছিল। তাহাদের মধ্যে অনেকেই মনে হয়, খুব সাম্প্রতিক মুসলমান ধর্মাবলম্বী হইয়াছিলেন। অন্ততঃ পক্ষে তাহাদের নাম হইতে ইহাই বোঝা যায়। যেমন ভীম মজুমদার, কেদার মজুমদার, শরৎ মিঞা ইত্যাদি। মুসলমান পাড়ার কয়েকটি বাড়ীর নাম ছিল, সরকার বাড়ী, বিশ্বাসবাড়ী, মজুমদার বাড়ী প্রভৃতি। একসময় আমাদের হিন্দু সমাজ কত নীচে নামিয়া গিয়াছিল, ইহা তাহারই প্রমাণ। এই সব ধর্মান্তর গ্রহণের একমাত্র কারণ ছিল উচ্চবর্ণের হিন্দুগণের নিম্নবর্ণের উপর অত্যাচার এবং তাহাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার অভাব।

নয়াবাজার নামক স্থানে মিঠু ব্যাপারী একটি ইষ্টক নির্মিত মসজিদ প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছিলেন। নয়াবাজার মুন্সীগঞ্জ সোনারং রাস্তার সোনারঙ্গে প্রবেশের মুখে ইহা অবস্থিত ছিল। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি ও সদভাব যথেষ্ট ছিল। অন্ততঃ ধর্মীয় বিষয়ে কোনরূপ মন মালিন্য কখনো হয় নাই।

নবম পরিচ্ছেদ

গ্রামে চিকিৎসা ব্যবস্থা :

গ্রামীন চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক মনে করি। গ্রামে তখন কোন দাতব্য চিকিৎসালয় ছিল না। কিন্তু কয়েকজন বিশিষ্ট চিকিৎসক দীনবন্ধু রায় কবিরাজ, ললিত কবিরাজ, হোমিওপ্যাথ ডাক্তার দুর্গামোহন সেন, অস্ত্র চিকিৎসক চন্দ্র কুমার শীল ও চন্দ্র কুমার দে এবং পাশ করা পেন্‌সন্ প্রাপ্ত ডাক্তার প্যারী মোহন দাস, ইহারা গ্রামের সাধারণ চিকিৎসাদি বেশ সুষ্ঠুভাবে করিতে পারিতেন। কিন্তু মুস্‌কিল হইত গ্রামে যখন কলেরা লাগিত। ইহার ব্যাপ্তি-রোধ করিবার জন্য কেহই কোন ব্যবস্থা করিতে পারিতেন না। আমার মনে আছে নিরুপায় হইয়া গ্রামবাসীরা সকলে মিলিয়া গ্রামের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত হরিনাম সংকীর্ত্তন করিয়া বেড়াইতেন।

এই অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতে বহুদিন লাগিয়াছিল। যখনকার কথা বলিতেছি সেই সময় হইতে প্রায় পনেরো ষোল বছর পরে একবার কলেরা লাগিবার পরই জিলা সহর ঢাকা হইতে ডাক্তার আসিয়া রোগীর চিকিৎসা করিয়াছে এবং কলেরার প্রতিষেধক ব্যবস্থাও করিয়া গিয়াছে।

ইহারও বৎসর খানেক পরে এক গ্রীষ্মাবকাশে গ্রামে আসিয়া শ্রীসুরেশ চন্দ্র দাস গুপ্ত মহাশয়ের পরামর্শ অনুযায়ী আমরা কয়েকজন মিলিয়া কিছু টাকা চাঁদা তুলিয়া একটি দাতব্য হোমিও প্যাথিক চিকিৎসালয় বা ঔষধালয় স্থাপন করিয়া ছিলাম। ইহা

স্থাপিত হয় শ্রীতারক সেনের বাড়ীতে। এই সময়ে পূর্বোল্লিখিত চিকিৎসকগণ প্রায়-কেহই জীবিত ছিলেন না। শ্রীতারক সেনই ঔষধালয় পরিচালনার ভার লইলেন। পরবর্ত্তী যুগে ইনি ডাক্তার হিসাবে খুব খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। ইহার কিছুদিনের মধ্যেই সরকার হইতে গ্রামে একটি এ্যালোপাথী চিকিৎসালয় স্থাপন করা হয়। রায় বাহাদুর ললিত সেন এই দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠায় যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

গ্রামের কাহিনী ঃ

এই অধ্যায়ে গ্রামের কয়েকটি প্রচলিত কাহিনী লিখিব। গল্পে সাহিত্যরস সৃষ্টি করিতে হয়তো পারিব না কিন্তু তবু উল্লেখ করিব এই জন্য যে, এ সবই সত্য ঘটনা। গল্পগুলি হয়তো পাঠকের মনোরঞ্জন করিতে সক্ষম হইবে।

ইতিহাসে পড়িয়াছি, এক সময় বাংলাদেশে খুবই বাঘের অত্যাচার ছিল। আমাদের ছোটবেলাতেও শুনিতাম প্রতি শীতেই নাকি গ্রামে বাঘ আসে। অবশ্য রয়েল বেঙ্গল টাইগার নহে, ক্ষুদ্র হায়না জাতীয় বাঘ। আমরা বলিতাম "কুকুর বাঘা"। একবার বোধ হয় ১৯০০ সনের কিছু পূর্বে একটি ঘটনা ঘটে। পাঠশালার গুরুমহাশয় জগদীশচন্দ্র সেন ও তাঁহার একজন ছাত্র হরিপ্রসন্ন দাস (সাত আট বৎসর বয়স) ও একটি বাঘ এই ঘটনার প্রধান চরিত্র।

হরিপ্রসন্নের একটা অভ্যাস ছিল—কাপড়টি পরিয়া কাছাটি পিছনে একটি বেশ বড় গোছের পোটলার আকারে গুঁজিয়া রাখিত। একদিন পাঠশালা বসিয়াছে, বিকালের দিকে হঠাৎ রব উঠিল গ্রামে বাঘ আসিয়াছে এবং সে নাকি পাঠশালার দিকেই অগ্রসর হইতেছে। তৎক্ষণাৎ পাঠশালা ছুটি হইয়া যায় এবং সবাই সন্ত্রস্তচিত্তে গৃহাভিমুখে রওনা হয়। এদিকে বাঘটিও তাড়া খাইয়া সোজা পাঠশালার দিকে আসিয়া দেখিতে পায়, সম্মুখে বিরাট পোটলাসহ হরিপ্রসন্ন ব্যস্ত হইয়া পলায়ন করিতেছে। প্রলুব্ধ বাঘ তৎক্ষণাৎ হরিপ্রসন্নকে আক্রমণ করে এবং বাঘের দুর্ভাগ্যক্রমে তাহার মোক্ষম থাবার আঘাত গিয়া পড়ে সেই পোটলাবৃত কাছার উপর। সঙ্গে সঙ্গে কাছার কাপড় ফর্ ফর্ করিয়া ছিঁড়িয়া যায়। কথিত আছে, বাঘ নাকি সেই কাপড় ছেঁড়ার শব্দেই ভীষণ ভয় পাইয়া স্থান পরিত্যাগ করাই অধিক নিরাপদ ভাবিয়া উর্দ্ধলাঙ্গুল করিয়া পলাইয়া যায়। কিন্তু পথে জগদীশ গুরুমহাশয়কে সামনে পাইয়া এমন গুরুতর ভাবে ক্ষতবিক্ষত করে যে তিনি কিছু দিনের মধ্যেই মারা যান।

দ্বিতীয় গল্পও বাঘের ভয় পাওয়ার কাহিনী। আমাদের বাড়ীতে বেশ বড় প্রমাণ মাপের একটি বাবু কার্ত্তিকের অর্থাৎ বসানো বা দাঁড়ানো কার্ত্তিক ঠাকুরের মূর্ত্তি ছিল। ধবধবে সাদা এই বড় বড় মূর্ত্তিগুলিকে হঠাৎ রাত্রির অন্ধকারে দেখিলে মানুষ বলিয়া ভ্রম হইত। ৺পূজার পর এইরূপ বড় একটি মূর্ত্তিকে ঘরের বাহিরে রাখা হয়। এক জ্যোৎস্না রাত্রিতে মানুষ ভ্রমে এই মূর্ত্তিটিকে এক বাঘ আসিয়া আক্রমণ করে। ভীষণ শব্দ সহকারে মৃন্ময়মূর্ত্তি বাঘের ঘাড়ের উপর ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং আহত বাঘ ভয়ানক ভয় পাইয়া পলায়ন করে।

তৃতীয় গল্প এক দূর্গা পূজার সময়কার। পূজামণ্ডপে বসিয়া সন্ধ্যাকালে ছয় সাত ভাই মিলিয়া বেশ একটু কারণবারি পান করে। হঠাৎ তাহাদের মাথায় আসিল, পূজা পূজা খেলা হইলে মন্দ হয় না। বাড়ীতে পূজা হইতেছে "বলি" তাহার এক প্রধান অঙ্গ। কিন্তু "বলি"ই বা কোথায়, পুরোহিতই বা কোথায়! সবাই মিলিয়া স্থির করিলেন ইহাতে ভয় পাইবার কিছুই নাই। এক ভাই পুরোহিত হইয়া দাঁড়াইলেন, অপর জন হইলেন "মণ্ডপি" অর্থাৎ যে মণ্ডপের দেখাশোনা করে এবং "বলি" দেয়। কিন্তু বলি কোথায়? ইহাতেও ঘাবড়াইবার কিছুই নাই। আর এক ভাই পাঁঠা সাজিয়া তাড়াতাড়ি হাঁড়িকাঠে মাথা দিলেন। সমস্তই প্রস্তুত এবার বলি হইলেই হয়। হঠাৎ পাঁঠার মনে হইল এমতাবস্থায় পাঁঠাটা ব্যা ব্যা করিয়া চিৎকার করিয়া থাকে বটে। আমাদের পাঁঠাও খুব চিৎকার সুরু করিয়া দিল। এই অভূত পূর্ব পাঁঠার চিৎকার শুনিয়া তাহাদের মাতাঠাকুরাণী গৃহ হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিলেন। তিনি তাহার পুত্রদের বিলক্ষণ জানিতেন। যাহাই হোক সময়মতো বাধা দেওয়ায় পূজার খেলা আর বিয়োগান্ত, ভাবে শেষ হইতে পারে নাই।

চতুর্থ গল্প। ছোট উত্তর পাড়ার প্রফুল্ল সেনদের বাড়ীর দেবী মূর্ত্তির রং ছিল লাল। সাধারণতঃ দূর্গা প্রতিমার রং হয় সাদা। এই ব্যতিক্রমের পিছনে একটি গল্প আছে। অনেকদিন আগে এক পূজার সময় যখন মণ্ডপে কেহ ছিল না তখন বাড়ীর কর্ত্তা মণ্ডপে আসিয়া দেখিতে পাইলেন যে দেবী মূর্ত্তির মুখে একটি-পাঁঠা ঝুলিতেছে। এবং তাহা হইতে অঝোরে রক্ত ঝরিয়া দেবী মূর্ত্তির রং রক্তবর্ণ কয়িরা তুলিয়াছে। সেই হইতে দেবীর রং লাল এবং

এই কারণে পাড়ার নূতন নাম হয় "বকরীপাড়া" বা "বরকীপাড়া"। তবে এই গল্পে সত্যের অংশ কতখানি সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে।

পঞ্চম গল্প একটি ময়াল সাপের। বোধ হয় ১৯০৭/৮ সনে একবার বর্ষার সময় গ্রামের জ্ঞানা দাস সন্ধ্যা বেলা হাট হইতে মাছ কিনিয়া আনে। মাছ রান্না করিতে কলার পাতা প্রয়োজন। মা কেরোসিনের কুপিবাতি হাতে নিয়া খালের ধারে কলাবাগান হইতে কলাপাতা আনিতে যান। কিন্তু নীচ হইতে কলাপাতার নাগাল প্যান না। এই সময় কেরোসিনের বাতির স্বল্প আলোতে দেখিতে পান একটা লম্বা "থাম" বা কাষ্ঠখণ্ড পড়িয়া আছে। তাহার উপর উঠিয়া পাতা পাড়িতে গিয়াই টের পান থামটি নড়িতেছে। ভালো ভাবে দেখিতে গিয়াই বুঝিলেন থামটি একটি সাপ। এমন অদৃষ্টপূর্ব বৃহৎ সর্প দেখিয়া তিনি তারস্বরে চীৎকার আরম্ভ করেন এবং দেখিতে দেখিতে পাড়ার সবাই আসিয়া পড়ে। সাপটি চৌদ্দ পনেরো হাত লম্বা ও সেই অনুপাতে মোটাও। তাই সাপটিকে মারিতে যথেষ্ট বেগ পাইতে হয়। পরের দিন আমরা মৃত সাপটিকে দেখিতে যাই। এইরূপ ময়াল সাপ আমাদের গ্রামাঞ্চলে কখনও দেখা যায় নাই। বোধ হয় পাহাড়ী সাপ বর্ষার বানের জলে কোন স্থান হইতে ভাসিয়া আসিয়া গ্রামে প্রবেশ করে।

একাদশ পরিচ্ছেদ

গ্রামকে যাঁহারা ভালবাসিয়াছেন :

বিদ্যায় ধনে মানে আমাদের সোনারঙ্গ বিক্রমপুরের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ছিল। বিক্রমপুরের কোন গ্রামেই বোধ হয় এত অধিক

শিক্ষিত লোক ছিল না ('বিক্রমপুর' ৩য় খণ্ড ১৯৪৮, হিমাংশু চ্যাটার্জ্জি)। মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে কেহ অশিক্ষিত ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আমার সময়ে শতাধিক স্নাতক এবং বার তেরজন স্নাতোকোত্তর ডিগ্রীধারী ব্যক্তি ছিলেন। পূর্ব বাংলা ও আসামের প্রতি মহকুমা ও জেলা সহরে, সমাজের শীর্ষস্থানে অন্ততঃ একজন করিয়াও সোনারঙ্গের সন্তান অধিষ্ঠিত ছিলেন। ডাক্তার, উকিল, শিক্ষাবিদ্ অথবা রাজকর্মচারী হিসাবে কোন কোন স্থানে তাহাদের সংখ্যা খুব অধিক হওয়াতে তাহারা সেই সেই স্থানে এক একটি বিশেষ নামে পরিচিত উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। যেমন কুমিল্লায় সোনারং কম্পাউণ্ড। চট্টগ্রামে সোনারঙ্গ উপনিবেশ। আমি অনেকদিন আগে ঢাকা জগন্নাথ কলেজের প্রফেসার উপেন গুপ্তের লিখিত একখানা বইয়ে পড়িয়াছি যে শ্রীহট্টেও এইরূপ একটি সোনারংবাসীদের উপনিবেশ হইয়াছিল। পরিশেষে আমি জানি কলিকাতায় পটলডাঙ্গাতে একটি মেসবাড়ী প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী কাল সোনারং মেষ নামে অভিহিত ছিল। গ্রামের বেশীর ভাগ লোকই সরকারী কর্মচারী ছিলেন। কিন্তু কিছু লোক আবার বেসরকারী প্রতিষ্ঠানেও চাকুরী করিতেন। শুনিয়াছি উনবিংশ শতকের শেষ ভাগে অথবা তাহারও কিছু আগে, প্রায় এগার জন সোনারংবাসী উচ্চ রাজকর্মচারী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহারা শাসন বিভাগে এবং আইন বিভাগে চাকুরী করিতেন। যে যুগে সমস্ত অঞ্চলের মধ্যে একজন উচ্চ রাজকর্মচারী থাকাই অতীব গৌরবের বিষয় ছিল, সে যুগে একই গ্রামে একই সময়ে এগার ব্যক্তি ঐরূপ পদে থাকা, সন্দেহ নাই অত্যন্ত গৌরবজনক কথা। আমি অনুসন্ধান করিয়া সেই তথাকথিত "পৌরাণিক" যুগের সেই এগার

জন এরূপ রাজ কর্মচারীর সন্ধান পাইয়াছি। অবশ্য তাঁহারা সকলে একই সময়ে ছিলেন কিনা তাহা বলিতে পারিব না। তবে একজনের কথা ঠিক ভাবে জানি, তিনি হইলেন রায় বাহাদুর আনন্দ চন্দ্র সেন বিশারদ। তাঁহার জীবনকাল হইল ১৮২১—১৯১১। তিনি ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। লস্কর বাড়ীর মহেশ সেন সাবজজ। মুন্সেফ বাড়ীর দুই ভাই রাম দুর্লভ মুন্সেফ ও পদ্ম মুন্সেফ—আনন্দ বিশারদ বাড়ীর কে, পি সেন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ডাক্তার জ্যোতিপ্রসাদ সেনের দাদামহাশয় সেনের বাড়ীর দুই ভাই রামকানাই সেন মুন্সী ও রামতনু সেন মুন্সী। ইহারা যে সব পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তখনকার দিনে ঐ গুলিই ছিল উচ্চ পদ। আমাদের কালে কিন্তু আরো উচ্চ পদে আরো অনেক গ্রামবাসী ছিলেন, তাহাদের কয়েক জনের নাম—সুকুমার সেন, আই-সি-এস, ইলেকশন কমিশনার, বিনয় সেন, আই-সি-এস ও প্রেসিডেণ্ট এফ, এ, ও (World Food and Agriculture Organisation.), অতুল-চন্দ্র সেন, ডি, পি, আই, নাগপুর ; বামাচরণ ব্যনার্জি একাউণ্টটেণ্ট জেনারেল ; ধীরেন্দ্রমোহন সেন পশ্চিম বাংলার শিক্ষা দপ্তরের প্রধান সচিব ও পরে উপ-প্রধানাচার্য্য ; ডি, এম সেন ভারত সরকারের জাজ্ এ্যাডভোকেট-জেনারেল ও পরে আসাম হাইকোর্টের জজ ; অশোক সেন কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রী, চারু রায় কলিকাতার কালেক্টার ; রায় বাহাদুর অতুলচন্দ্র দাস গুপ্ত কেন্দ্রীয় সরকারের উপসচিব, নগেন্দ্রনাথ সেন অধস্তন সচিব ; নীললোহিত দাস গুপ্ত রেলওয়ে-বোর্ডের সহকারী-সচিব ইত্যাদি। তাহা ছাড়া বেসরকারী কাজে লিপ্ত চিকিৎসক আইনজীবি শিক্ষাবিদ্ ও ব্যবসায়ী অনেক আছেন। গ্রামের আরো কয়েকজন সুসন্তান হইলেন বিখ্যাত মহাপণ্ডিত

ক্ষিতিমোহন সেন, রবীন্দ্রনাথের সহচর। বিপ্লবী মাখন সেন পরবর্ত্তী যুগে মহান সাংবাদিক রূপে যিনি আনন্দ বাজার পত্রিকার উন্নতি ও গৌরবের মূলনায়ক ছিলেন। উমাচরণ ব্যানার্জী বর্দ্ধমান রাজ কলেজের প্রিন্সিপ্যাল; কালীপদ সেন লাক্ষ্ণৌ-এ কোন কলেজের অধ্যক্ষ, হেমচন্দ্র সেন বাংলাদেশের বিদ্যালয় সমূহের প্রধান নিরীক্ষক ছিলেন। গ্রামে ধনী বড় কেহ একটা ছিল না কারণ অধিকাংশ লোকই ছিল চাকুরীজীবি। খুব কম লোকই ব্যবসা বাণিজ্য করিতেন। কিন্তু ধনী না হইলে ও স্বচ্ছলতা সকলেরই ছিল।

কৃতী সন্তান গ্রামে অনেক হইয়াছে, কিন্তু নিঃস্বার্থভাবে গ্রামকে সেবা করিয়া গিয়াছেন এমন লোক কমই দেখিয়াছি। তাঁহাদেরও সকলের কথা বলিতে আমি অক্ষম। তবে বিশেষ কয়েক জনের কথা আমি এখানে বলিব।

রায় বাহাদুর আনন্দচন্দ্র সেন বিশারদ (১৮২১—১৯১১):

প্রথম জীবনে শিক্ষকতা করিতেন, পরে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছিলেন এবং খুব সুনামের সহিত চাকুরী করিয়াছিলেন। অতি সদাশয় ব্যক্তি, লোকের বিপদে আপদে সাহায্য করিতে সদাপ্রস্তুত। এইরূপ সদাশয় ও পরোপকারী ব্যক্তি সমগ্র বিক্রমপুরেই কম জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। (হিমাংশু চ্যাটার্জি "বিক্রমপুর ৩য় খণ্ড ১৯৪৮)। গ্রামবাসীদের সুবিধার জন্য তিনি নিজ বাটি হইতে বাজার পর্য্যন্ত একটি রাস্তা তৈয়ারী করাইয়া দিয়াছিলেন। অতুল দাসগুপ্ত তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে কোন বাড়ীতে কেহ অসুস্থ হইয়া পড়িলে তিনি নিজেই গিয়া তাহার সেবা শুশ্রূষা, ঔষধ পথ্যাদির তদারক করিতেন। বিক্রমপুরে তিনিই বোধ হয় সর্বপ্রথম ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট এবং রায় বাহাদুর।

বৈকুণ্ঠ রায় :

গ্রামকে যাঁহারা ভালবাসিতেন তাঁহাদের মধ্যে বৈকুণ্ঠ রায়ের নামই বোধ হয় সর্বাগ্রগণ্য। সমগ্র ঢাকা জেলায় তিনি সুপরিচিত ছিলেন। তাঁহার কর্মজীবন ছিল উনবিংশ শতকের শেষ দুই দশক। কর্মক্ষেত্রে জীবিকার দিক দিয়া তিনি ছিলেন বিদ্যালয় সমূহের একজন উপনিরীক্ষক। ঢাকা জেলা ছিল তাঁহার কর্ম্মস্থল। পদটি খুব উচ্চ না হইলেও তাঁহার প্রতিপত্তি ছিল অসীম। আমাদের শৈশবে নয়াবাজার মসজিদের বৃদ্ধ কাজিসাহেবের কাছে শুনিয়াছি, বৈকুণ্ঠ রায়ের বাড়ীর দরজায় নাকি প্রায়ই দুই তিনটা হাতী বাঁধা থাকিত। অর্থাৎ তখনকার দিনে হস্তীবাহনে জিলার উচ্চ রাজকর্মচারীরা তাঁহার সহিত প্রায়ই দেখা করিতে আসিতেন। তিনি জিলা বোর্ডের সহায়তায় মুন্সীগঞ্জ হইতে গ্রাম পর্য্যন্ত রাস্তাটি নির্ম্মাণ করাইয়া দেন এবং মীরকাদিম হইতে মোকামখোলা পর্য্যন্ত গ্রামটিরও সংস্কার করাইয়া দেন। গ্রামের ডাকঘরটিও তাঁহারই উদ্যোগে স্থাপিত হয়। গ্রামের মিড্‌ল ইংলিশ স্কুলটির প্রতিষ্ঠার মূলেও ছিলেন তিনিই। শ্বশুরবাড়ী ফুরমাইল গ্রাম হইতে ঘোড়ায় চড়িয়া ফিরিবার সময় হীরার আংটি চুষিয়া তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইহা অসাবধানতা, না ইচ্ছাকৃত সে সম্বন্ধে কাহারও কোন পরিস্কার ধারণা নাই।

অপূর্ব্বচন্দ্র সেন :

বড় সরকার বাড়ীর সেরেস্তাদার কাশীচন্দ্র সেনের চতুর্থ পুত্র অপূর্ব্ব সেন অশেষ গুণসম্পন্ন হইয়াও বৃদ্ধ পিতামাতার সেবার জন্য গ্রামেই থাকিয়া যান। কিন্তু তাঁহার পরিবারের এই ক্ষতি গ্রামের

পক্ষে মহা আশীর্ব্বাদ হয়। তাঁহাকে আমি দেখিয়াছি এবং তাঁহার কাজকর্ম্মের সহিতও বিশেষ ভাবে পরিচিত। গ্রামের জন্য তাঁহার সেই অক্লান্ত অনন্যসাধারণ পরিশ্রমের কথা ভাষায় প্রকাশ করা দুষ্কর। তিনি প্রথম জীবনে স্বদেশী যুগে গ্রামে তাঁতশিল্প উন্নয়নের চেষ্টা করেন। তবে গ্রামে তাঁহার প্রধান দান ডুবন্ত বিদ্যালয়টিকে পুনর্জীবন দান করিয়া একটি আদর্শ বিদ্যালয়ে পরিণত করা। তিনি একাধারে ইহার হেডমাষ্টার, সম্পাদক ও কর্মী সবই ছিলেন এবং নিজের অসীম কর্ম্মতৎপরতায় এই অসাধ্য সাধন করেন। ১৯১৭ খৃঃ বিদ্যালয়টি আগুনে পুড়িয়া যায় এবং ফলতঃ ইহার পুনঃনির্ম্মাণের জন্য প্রচুর টাকার আবশ্যক হয়। অপূর্ব্ব সেনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে এই টাকা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। শুনিয়াছি রায় বাহাদুর ললিতমোহন সেন, হারাণচন্দ্র দাশ ও কালীমোহন দাশ এই অর্থ সংগ্রহ ব্যাপারে তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করেন।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্ত্তনের আবর্ত্তে পড়িয়া গ্রামের তখন অত্যন্ত দুরবস্থা। সেই পড়ন্ত অবস্থা হইতে তিনি আবার গ্রামকে তুলিয়া ধরেন। গ্রামের উন্নতি সাধন এবং গ্রামবাসী সকলকে সর্ব্ব বিষয়ে সাহায্য করা যেন এই মহানুভব ব্যক্তির জীবনের ব্রতস্বরূপ ছিল। তাঁহার কথা যখন আমি ভাবি তখনই মনে প্রশ্ন জাগে, কোন্ আলোতে প্রাণের প্রদীপ জ্বালাইয়া তিনি ধরায় আসিয়াছিলেন! সেই আলোকের উজ্জ্বল দীপ্তিতে তাঁহার নাম প্রতি গ্রামবাসীর হৃদয়ে চিরভাস্বর হইয়া আছে। তিনি মৃত্যু-কাল পর্য্যন্ত সোনারঙ্গ-টঙ্গীবাড়ী ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি ছিলেন। কিন্তু তিনি অকালে ৩৯ বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

সুরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত ঃ

চারু আবাসের বিশ্বেশ্বর দাসগুপ্তের জ্যেষ্ঠপুত্র। এই শতকের প্রারম্ভেই শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া গ্রামের স্কুলে শিক্ষকরূপে যোগদান করেন। ১৯০৩ হইতে ১৯০৫ পর্য্যন্ত শিক্ষকতা করিয়া স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে গ্রামবাসীদের আহ্বানে সাড়া দিয়া বয়ন শিল্প শিখিতে কলিকাতায় চলিয়া যান। কলিকাতা হইতে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি গ্রামে ফিরিয়া গ্রামে বয়ন শিল্প শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু নানা কারণে এই শিক্ষা কার্য্যকরী হয় নাই। তিনি পুনরায় স্কুলে যোগ দেন এবং অপূর্ব সেনের সহযোগীরূপে গ্রামের সর্বপ্রকার উন্নতি কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। অপূর্ব সেনের অকাল মৃত্যুর পর তিনিই গ্রামে প্রধান হইয়া উঠেন এবং গ্রামের সর্ব প্রকার উন্নতির ভার নিজ স্কন্ধে তুলিয়া নেন। এই সময় বিক্রমপুরে তিনি একজন বিখ্যাত ব্যক্তি হইয়া উঠিয়াছিলেন। মহেন্দ্র লাল সেন ও ডাক্তার নিবারণ সেন তাঁহাকে সর্বপ্রকার সাহায্য করিতেন। কালক্রমে সুরেশবাবুও সোনারং টঙ্গীবাড়ী ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি হইয়াছিলেন। দেশ বিভাগ পর্য্যন্ত তিনি গ্রামেই ছিলেন। আমাদের সৌভাগ্য এখনও তিনি জীবিত আছেন এবং তাঁহার বর্ত্তমান বয়স সাতাশী বৎসর।

বামাচরণ ব্যানার্জ্জী ঃ

অধ্যক্ষ উমাচরণ ব্যানার্জ্জীর জ্যেষ্ঠপুত্র। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন এবং সুখ্যাতির সহিত তিনি এম, এ, পাশ করিয়া ঢাকা কলেজের অধ্যাপক হন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সোনারং উচ্চ বিদ্যালয়ের সম্পাদকের কার্য্যও করিতেন। প্রায় প্রতি শনিবারই ঢাকা হইতে আসিয়া বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়

কার্য্যাদি করিয়া দিয়া যাইতেন। বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য তিনি যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী যুগে তিনি অ্যাকাউন্টেন্ট-জেনারেল হইয়া কর্মক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

চিন্ময়ী দেবী :

গ্রামের সামাজিক জীবনে ইনি ছিলেন প্রধানা মহিলা। তিনি গ্রামের কালীমোহন দাশের স্ত্রী এবং গ্রামেরই দুহিতা ছিলেন। চিন্ময়ী দেবী ধাত্রীবিদ্যায় পারদর্শিণী ছিলেন এবং গ্রামের বিদ্যাশিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁহার অবদান অসামান্য। গ্রামের বালিকা বিদ্যালয়টি পূর্বে গোবিন্দ সেনের বাড়ীতে ছিল। চিন্ময়ী দেবী ইহাকে স্থায়িত্ব দিবার জন্য জমি দিয়া উহার উপর বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ করাইয়া দেন। তাঁহারই নামে ইহার নামকরণ হইয়াছিল "চিন্ময়ী বালিকা বিদ্যালয়"। স্বামীর স্মৃতি রক্ষার্থে গ্রামের উচ্চ বিদ্যালয়ে তিনি "কালীমোহন হল" নামে একটি হলঘরও নির্ম্মাণ করাইয়া দেন।

হেমচন্দ্র সেন :

উকিল গিরীশচন্দ্র সেনের জ্যেষ্ঠ পুত্র তিনি প্রথম জীবনে প্রেসিডেন্সী কলেজ ও হুগলী মহসীন কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। পরে বিদ্যালয় সমুহের নিরীক্ষক হইয়াছিলেন। তিনি নিজের কর্ম্মজীবনের সময়টুকু 'ছাড়া অবশিষ্ট সময় গ্রাম ও বৈদ্যজাতির উন্নতি কল্পেই অতিবাহিত করিয়াছিলেন। গ্রামের প্রতি উন্নয়ন কার্য্যে হেম সেন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে যোগ দিতেন। তাঁহারই উদ্যোগে একবার পূজায় সোনারং স্কুল ভবনে অষ্টম সম্মিলনীর ধবেশন হইয়াছল।

বড় লস্কর বাড়ীর অবদান গ্রামের সর্বাধিক বিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দুই ভাই রত্নেশ্বর ও শশীকুমার মাইনর বিদ্যালয়টিকে

উচ্চ বিদ্যালয়ে উন্নীত করেন ও ইহা নির্ম্মাণে ও পরিচালনায় বহু শ্রম এবং অর্থব্যয় করেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, এই তিন ভাই— রত্নেশ্বর, শ্রীনাথ ও শশী ছিলেন গ্রামের প্রথম গ্রাজুয়েট। ১৮৮৫—১৯০০ খৃঃ পর্য্যন্ত রত্নেশ্বরের ভ্রাতুষ্পুত্র নির্ম্মলচন্দ্র ও শীতল-চন্দ্র গ্রামে থাকিয়া গ্রামের সকল প্রকার উন্নতিতে, বিশেষতঃ গ্রামবাসীদের বিপদে-আপদে প্রভূত সাহায্য করেন।

ললিতমোহন সেন ঃ

সেনের বাড়ীর কালীপ্রসন্ন সেনের জ্যেষ্ঠ পুত্র ললিতমোহন সেন এক্সাইজের সাব-ইনস্পেক্টর হইয়া কর্ম্মজীবনে প্রবেশ করেন। পরবর্ত্তী জীবনে নিজের কর্ম্মদক্ষতায় সেকালের একটি দুষ্প্রাপ্যপদে (সুপারিণ্টেডেণ্ট অব এক্সাইজ) অধিষ্ঠিত হইয়া অবসর গ্রহণ করেন। তিনি "রায় বাহাদুর" উপাধিও পাইয়াছিলেন। তিনি আপন কর্মজীবনে জাতিধর্ম নির্বিশেষে কত লোকের যে উপকার করিয়াছেন তাহার সীমা সংখ্যা নাই। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য এরূপ পরোপকারী কর্ম্মযোগী দুটি পুরুষের কার্য্যকলাপ বাংলাদেশে আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। দুজনেই মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান, অতি সামান্য ভাবে জীবন আরম্ভ করিয়া আপন দক্ষতায় আপন আপন ক্ষেত্রে উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে উঠেন কিন্তু মানুষকে কখনও ভোলেন নাই। তাঁহারা হইলেন কালীপ্রসন্ন সেন ডি, পি, এম, জি এবং রাজেশ্বর দাশগুপ্ত ডেপুটি ডাইরেকটর, কৃষিবিভাগ। ললিতমোহন সেন অবসর গ্রহণের পর বহুদিন গ্রামে বাস করেন। তিনি গ্রামের বিদ্যালয়ের জন্য প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিয়া দেন। একটি দাতব্য চিকিৎসালয় গড়িতেও অনেক সাহায্য করেন। শুনিয়াছি গ্রামের শ্মশানটির সংস্কারেও তাঁহার যথেষ্ট দান আছে।

শ্রীমতী ভবানী সেন, ডাঃ অবলাকান্ত সেন ও
ডাঃ সতীন্দ্র কুমার সেন ঃ

১৯২৫ সনে আমরা গ্রাম ছাড়িয়া তথা বাংলাদেশ ছাড়িয়া চলিয়া আসার পরও আরো অনেক গ্রামবাসী গ্রামের উন্নতির জন্য নিঃস্বার্থ ভাবে কাজ করিয়াছেন। কিন্তু গ্রাম হইতে এতদূরে চলিয়া আসার জন্য আমার দুর্ভাগ্য যে আমি তাঁহাদের সকলকে জানি না। কিন্তু তিন জনের নাম আমি বিশেষ ভাবে জানি। একজন শ্রীমতী ভবানী সেন, গ্রামেরই দুহিতা এবং গ্রামেরই বধূ। লস্কর বাড়ীর নৃপেন সেনের কন্যা এবং আমাদের প্রতিবেশী ছোট উত্তর পাড়ার ডাঃ অবলাকান্ত সেনের স্ত্রী। অবলা আমার বাল্যবন্ধু ও সখা। ডাঃ সতীন্দ্র সেনও আমার সমবয়সী। এই তিন জনের অক্লান্ত পরিশ্রম ও কর্ম্মকুশলতায় কলিকাতায় সোনারঙ্গ সম্মিলনী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং সগৌরবে মাথা উঁচু করিয়া আছে। সোনারঙ্গ সম্মিলনী সোনারঙ্গেরই স্মৃতি বহন করিয়া বিদেশবাসী সোনারঙ্গের লোকদের একসূত্রে বাঁধিবার সুচেষ্টা করিতেছে। প্রার্থনা করি, তাহাদের এই মহতী প্রচেষ্টা সার্থক হউক। আজ তাই সোনারঙ্গ বলিতে এক সাথে ভবানী আর অবলার নামই মনে হয়। সতীন্দ্র সেন অসুস্থ হইয়া শয্যাগত হওয়াতে সকল কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

গ্রামবাসীদের কথা ঃ

এই পরিচ্ছেদে আমি আমার গ্রামবাসীদের কথা বলিব। যাহাদের সুখে-দুঃখে হাসি-কান্নার স্মৃতিতে আমার প্রথম জীবন

(১৯০০—১৯১৪) বিজড়িত, তাহাদের কিছু কথা আমি এখানে লিখিব। হয়তো তাঁহারা আমার এই কাহিনী পড়িবেন না, হয়তো তাঁহাদের অধিকাংশই এই পৃথিবী হইতে চলিয়া গিয়াছেন, তবু যাহাদের তাঁহারা রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের জন্যই না হয় লিখিলাম। তঁাহাদের স্বর্গগত আত্মীয়দের প্রতি আমার এই সামান্য তর্পণ হয়তো তঁাহারা সশ্রদ্ধ চিত্তে গ্রহণ করিবেন।

কিন্তু সে সব কথা বলিবার আগে আমি আমার নিজের কথা কিছু বলিব। ১৮৯৮ সনে আসামের নওগাঁওতে আমি জন্মগ্রহণ করি। পিতা স্বর্গীয় রজনীকান্ত সেন আসাম সরকারে চাকুরী করিতেন। পিতার মৃত্যুর পর ১৯০০ সনে আমরা গ্রামে চলিয়া আসি। আমার পৈতৃক ভিটা গ্রামের দক্ষিণ পাড়ার পুনাই ভূঞার বাড়ী। সূর্য্য সেন হইতে আমি অধঃস্তন ত্রয়োদশ পুরুষ। দ্বিতীয় ভাই নরেন বিবাহ করিয়া ছাব্বিশ বৎসর বয়সেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। দুই ভাই সুরেন ও মণীন্দ্র বাল্যেই মৃত। লোকেন, শৈলেন, নগেন ও আমি সকলেই গ্রামের উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় হইতে শিক্ষা গ্রহণ করি। বিদ্যালয়ে পাঠকালীন সময়টুকু ১৯১৪ সন পর্য্যন্ত আমি গ্রামেই কাটাইয়াছি। কলেজ জীবন ১৯১৪—১৯২৪ সন পর্য্যন্ত শহরে থাকিলেও গ্রামের সহিত সম্পর্ক ভালোরকমই ছিল। প্রায় প্রতি ছুটিতেই গ্রামে যাইতাম। ১৯২৪ সনে কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হইতে ডাক্তারী পাশ করি। ১৯২৫ সনে বাংলা-দেশ ছাড়িয়া দিল্লীতে স্থায়ী ভাবে বসবাস আরম্ভ করি। মাঝে প্রায় আট মাস, ১৯২১ ফেব্রুয়ারী হইতে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত গ্রামের স্কুলে শিক্ষকতা করি। পরে দিল্লী আসিবার পূর্ব্বে এক বৎসর কাল আমি গ্রামেই কাটাইয়াছি। দিল্লী আসিবার সময়েও আমি প্রফেসর

হেমচন্দ্র সেন ও সুরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়ের মাধ্যমে বরাবর গ্রামের সহিত সংযোগ রাখিয়াছি এবং সময় ও সুযোগ সুবিধামত মাঝে মাঝে গ্রামে গিয়াছি। শেষ বার যাই ১৯৪৪ সনে।

গ্রামের সেবা করার খুবই ইচ্ছা ছিল কিন্তু এতদূরে থাকার জন্য তাহা হইয়া উঠে নাই। তবু ক্ষমতা যেটুকু ছিল, তাহা আমি আমার প্রবাস-জীবনের আবাসস্থল দিল্লীর কাজেই নিয়োগ করিয়াছি। নিউদিল্লী কালীবাড়ী, রামকৃষ্ণ মিশন, রাইসিনা স্পোর্টিং ইউনিয়ন, রাইসিনা বাঙ্গালী হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল, বেঙ্গলী গার্লস স্কুল (অধুনা এম, বি, গার্লস হাই স্কুল) প্রভৃতি গড়িয়া তুলিবার দায়িত্ব আমি কিছুটা বহন করিয়াছি। দিল্লী ষ্টেট অলিম্পিক এ্যাসোসিয়েশন আমিই গড়িয়া তুলি। ইহার পেট্রন ইন চীফ ছিলেন তৎকালীন বড়লাট লর্ড লিন্‌লিথগো ও প্রেসিডেণ্ট ছিলেন দিল্লীর মুখ্য নাগরিক স্যার শোভা সিং। আমি ছিলাম সেক্রেটারী। আমি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যোগদান করিয়া নানা দেশ ও নানা জাতির সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ পাইয়াছি। এতদ্ব্যতীত আমি রাইসিনা বেঙ্গলী হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের সহিত প্রায় পনের বৎসর কাল সংযুক্ত ছিলাম। স্কুলের জন্য নানা স্থান হইতে যেমন ভারত সরকার, বাংলা সরকার, কলিকাতার অশোক সোসাইটি প্রভৃতি হইতে প্রায় তিন লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হই। এখন শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ এই স্কুল কমিটির সভাপতি হিসেবে স্কুলের কাজ হইতে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছি। এখন দিল্লীতেই আমার অবসর জীবন যাপন করিতেছি। উপস্থিত কিছুটা সোনারঙ্গ সম্মিলনীর সভাপতি ডাঃ অবলাকান্ত সেনের অনুরোধে, মুখ্যতঃ নিজেরই প্রেরণায় সোনারঙ্গ সম্বন্ধে আমার স্মৃতি লিপিবদ্ধ করিতেছি।

দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর কাল সোনারঙ্গের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলাম। এই সময়ে গ্রামের সব ঘটনাই জানি। লিখিবার প্রারম্ভে একটু ভয় হইয়াছিল, পরে লিখিতে বসিয়া দেখি প্রায় সব কথাই আমার মনে আছে। এমন কি মনে হয়, যাহা লিখিয়াছি তাহারও বেশী মনে আছে। তখন যাঁহারা জীবিত ছিলেন গ্রামে, তাঁহাদের সকলের সহিতই আমার ঘনিষ্ঠতা ছিল। কিন্তু আমি যাহা লিখিলাম তাহা বিগত যুগের সোনারঙ্গের কথা। বর্ত্তমান সোনারঙ্গ অর্থাৎ দেশ বিভাগের পরের সোনারঙ্গ সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না। তবে এই বিষয়ে প্রফেসর সুরেশচন্দ্র সেনের লিখিত বিবরণ প্রবন্ধের শেষে লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

আমি গ্রামে থাকাকালীন সময়ে গ্রামবাসীদের মধ্যে যাঁহারা বিভিন্ন পরিবারের কর্ত্তারূপে জীবিত ছিলেন, তাঁহাদের কথাই কিছু এখানে লিখিলাম। তাঁহাদের কেহ গ্রামেই থাকিতেন, কেহ আবার গ্রামের বাহিরেও থাকিতেন। তাঁহাদের কথা লিখিতে লিখিতে প্রসঙ্গক্রমে পরিবারের অন্যান্যদের কথাও কিছু আসিয়া পড়িয়াছে।

আমাদের গ্রাম হিন্দু প্রধান ছিল। পাঁচ ভাগ হিন্দু ও এক ভাগ মুসলমান ছিল। মুসলমানেরা গ্রামের উত্তর, উত্তর পূর্ব ও উত্তর পশ্চিম অংশে বাস করিতেন। হিন্দুগণের মধ্যে বৈদ্যরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন, তারপর মৎস্যজীবি ও কৈবর্ত্ত সম্প্রদায়। বেশ কয়েক ঘর কায়স্থও ছিলেন আর ছিলেন কয়েক ঘর ব্রাহ্মণ। ইঁহারা ছিলেন প্রধানতঃ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত গোস্বামী (বারড়ী)। তবে গ্রামে সর্ব্ব শ্রেণীর লোকই বাস করিত। ধোপা, নাপিত, কামার, কুমার, ছুতার, ভুঁইমালী, নমঃশূদ্র, ঋষি (বাদ্যকর), বারুজীবি সবই ছিল,। ইহা ভিন্ন গ্রামের সমৃদ্ধির জন্য বাহির

হইতেও নানা শ্রেণীর লোক আসিয়া এখানে বাস করিত। এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহাদের বলা হইত দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ। তাঁহারা ভিক্ষা করিয়া ভিক্ষালব্ধ চাউল বিক্রয় করিয়া জীবিকার্জ্জন করিতেন। তাঁহারা থাকিতেন সপ্তর বাড়ী। কিন্তু ইঁহাদের নাম আমি ভুলিয়া গিয়াছি। তাহার পর গোঁসাই পূজার পুরোহিত ঠাকুর। কি কারণে জানি না, গ্রামের সাধারণ পুরোহিতগণ নারায়ণ পূজা করিতেন না। অথচ প্রায় প্রতি বাড়ীতেই নারায়ণ শিলা ছিল এবং প্রতি বাড়ীতেই নিত্যপূজার ব্যবস্থাও ছিল। চট্টগ্রামের একটি ব্রাহ্মণ পরিবার এই গ্রামে থাকিয়া পুরুষানুক্রমে এই নারায়ণ পূজা করিতেন। ইহা হইতেই এই পরিবারের ভরণপোষণ বেশ ভাল ভাবেই চলিত। আমাদের সময় যিনি ছিলেন তাঁহার নাম ছিল গিরীশ চক্রবর্ত্তী। তাঁহার পুত্র সুরেন চক্রবর্ত্তী গ্রামের স্কুলেই শিক্ষা লাভ করিয়া সাবডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া সরকারী চাকুরীতে প্রবেশ করে। নারায়ণ পূজা ভিন্ন এই পুরোহিত মহাশয়ের আর একটি কর্ত্তব্য কর্ম ছিল বিবাহ শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষ্যে গ্রামের লোকদিগকে নিমন্ত্রণ করা।

খরার দিনে (কার্ত্তিকের শেষ হইতে বৈশাখের শেষ পর্য্যন্ত) যখন রাস্তাঘাট শুষ্ক থাকিত তখন বিহার হইতে কিছু লোক গ্রামে জীবিকা অর্জনের জন্য আসিত। ইহারা সাধারণতঃ ডুলি ও পাল্কী-বাহক ছিল। গ্রামান্তরে যাতায়াতের জন্য এই ডুলি ও পাল্কীই একমাত্র যান ছিল। ইহারা মাটির ঘর প্রস্তুত করিয়া দলবদ্ধ ভাবে একত্র বাস করিত। একেক দলে সাধারণত দশ বারো জন লোক থাকিত। আমাদের গ্রামে এরূপ চারটি দল ছিল। ইহারা "মাহারা" (বেহারার অপভ্রংশ) নামে পরিচিত ছিল। বর্ষার

প্রারম্ভে রাস্তাঘাট জলে প্লাবিত হইয়া গেলে, ইহারা দেশে ফিরিয়া যাইত। ইহাদের একজনের নাম মনে আছে "বৃহস্পতি"।

আর একরকম সাধারণ মজুর শ্রেণীর লোক আসিত। তাহারা যে কোন শ্রমসাধ্য কাজ করিতে পারিত। যথা, ঘরামীর কাজ, জঙ্গল পরিস্কার করা, গাছ কাটা, নৌকা বাওয়া ইত্যাদি। ইহারা সারা বছর গ্রামেই থাকিত। কয়েক জনের নাম মনে আছে, রাজমোহন, অখিল, গিরীশ, গঙ্গারাম, দীনবন্ধু, জগবন্ধু প্রভৃতি।

ইহা ভিন্ন উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে অধ্যয়নের জন্য ছাত্ররা ভিন্ন গ্রাম ভিন্ন জেলা হইতে আসিত। তাহারা গ্রামের অবস্থাপন্ন লোকদের বাড়ীতে গৃহশিক্ষক রূপে থাকিয়া পড়াশুনা শেষ করিয়া যাইত। আমাদের সময়ের কয়েকজন এইরূপ ছাত্রের নাম আমার এখনও মনে আছে। দুই ভ্রাতা অম্বিকা ও সারদা মজুমদার, রমণী দত্তগুপ্ত, নকুলেশ্বর সেন প্রভৃতি। বিদ্যালংকার মহাশয়ের টোলে পড়িবার জন্য কিছু সংস্কৃত শিক্ষার্থী তাঁহার বাড়ীতে বাস করিত। ইহা ছাড়া কবিরাজীর কিছু ছাত্র দীনবন্ধু রায় কবিরাজ ও ললিত কবিরাজের বাড়ীতে থাকিয়া কবিরাজী শিক্ষা করিত। পোষ্ট অফিসের পোষ্ট মাষ্টার ও টেলীগ্রাফ মাষ্টার, বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে যাঁহারা ভিন্ন গ্রামবাসী হইতেন, তাঁহারা সকলেই পরিবারবর্গ লইয়া গ্রামেই বাস করিতেন।

গ্রামবাসীদের কথা লিখিত গেলে গরিষ্ঠ সম্প্রদায় বৈদ্যদের কথাই সর্বাগ্রে আসে। বৈদ্য পরিবারের সংখ্যা ছিল প্রায় ৯৬০, ব্রাহ্মণ পরিবার ৪০, কায়স্থ পরিবার ৫০, কৈবর্ত্ত পরিবার ৬০, অন্যান্য ১০০ এবং মুসলমান পরিবার প্রায় পঞ্চাশ ঘর। চৌকিদারের তালিকায় আমাদের বাড়ীর নম্বর ছিল ৩০৭। বৈদ্যদের

মধ্যেও আবার সেন বংশীয় সেনেরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। তাহার পরই বিশারদ বংশীয় সেনরা এবং তাহার পর অন্যান্যরা। যথা, হিঙ্গু বংশীয় সেন, দাসগুপ্ত, রায় ও গুপ্ত। ব্রাহ্মনদের ভিতরে বন্দ্যোপাধ্যায়, বারড়ী সরখেল, বিশ্বাস, মুখুটি ও গাঙ্গুলীরা ছিলেন। কায়স্থদের মধ্যে নাগ ও বিশ্বাসেরা বেশ প্রতিষ্ঠাপন্ন ছিলেন' কায়স্থদের বেশীর ভাগ নামই আমার মনে নাই। এই সব পরিবারের কথাই আমি এই পরিচ্ছেদ বিবৃত করিব।

রোষ বংশীয় সূর্য্য সেন প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে গ্রামে প্রথম আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। কথিত আছে গ্রাম তখন ঘন জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। কিন্তু কোন লোক বাস করিত কিনা তাহার নিশ্চয়তা নাই। সূর্য্য সেনের পুত্র হৃদয়ানন্দ সেন কবিরাজ ছিলেন। তিনি বসত বাটিতেই থাকিতেন। পরে তাহার জেষ্ঠ্য পুত্র গঙ্গাধরের বংশধরেরাই পরে সমস্ত গ্রাম পরিব্যপ্ত করিয়া ফেলে এবং তাহারা সরকার, লস্কর, মজুমদার, রমাকান্ত ইত্যাদি নামে পরিচিত হয়। মুন্সীপাড়া, ছোট উত্তরপাড়া ও নৈর বাড়ীর রোষ বংশীয় লোকেরা এই গঙ্গাধরের সন্তান। রঘুনাথের উত্তরাধিকারীরা ভূঁঞা উপাধি ধারণ করিয়া পৈত্রিক বাড়ীতেই থাকিয়া যায়। পরবর্ত্তীকালে এই ভূঁঞা বংশেরই আর একটি ধারা সূর্য্য সেনের এই বসতবাটি ত্যাগ করিয়া গ্রামের অন্যত্র বসতি স্থাপন করে। তাহারা পশ্চিম পাড়ার ভূঁঞা নামে পরিচিত। রঘুনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্বেশ্বর এই পশ্চিমপাড়ার ভূঁঞাগণের আদি পুরুষ। কনিষ্ঠ পুত্র শিবপ্রসাদ পুরাতন বসতবাটিতেই থাকিয়া যান। ক্রমে ক্রমে স্বাভাবিক নিয়মে অন্য বংশীয় বৈদ্যরা এবং অন্যান্য বংশীয় ও বর্ণের লোকেরা আসিয়া গ্রামে বসতি স্থাপন করে।

আমাদের সময়ে সূর্য্য সেনের বসতবাটীতে রঘুনাথের বংশধরদের মাত্র ৩টি পরিবার বাস করিত। বৈকুণ্ঠনাথ সেন, লোকেন্দ্রনাথ সেন ও নিবারণচন্দ্র সেন—এই পরিবার তিনটির কর্ত্তা ছিলেন। বৈকুণ্ঠনাথ স্কুলের সাব ইনস্পেক্টর ছিলেন। তিনি তখন কর্ম্মজীবন হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া গ্রামেই বাস করিতেন এবং গ্রাম পঞ্চায়েত বোর্ডের সভাপতি ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ভুবন-মোহন সেন সিমলাতে ভারত সরকারের চাকুরী করিতেন। অন্য তিন পুত্র অমরেন্দ্র, সমরেন্দ্র ও ভূপতি গ্রামের স্কুলের ছাত্র ছিলেন। লোকেন্দ্রনাথ ও তাঁহার দুই অনুজ শৈলেন্দ্র ও নগেন্দ্র দিল্লীতে ভারত সরকারে চাকুরী করিতেন। পরবর্ত্তী জীবনে শৈলেন্দ্র দিল্লীর বাঙ্গালীদের সামাজিক জীবনে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেন এবং নগেন্দ্র দিল্লীতে ভারত সরকারের আণ্ডার সেক্রেটারী হইয়া অবসর গ্রহণ করেন। সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রফুল্লনাথ তখন সবেমাত্র কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হইতে ডাক্তারী পাশ করিয়া দিল্লীতেই প্র্যাক্‌টিস আরম্ভ করিয়াছেন। পরবর্ত্তী জীবনে তিনি ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিসে যোগদান করিয়া পৃথিবীর বহু স্থান ভ্রমণ করেন এবং 'মেজর' হইয়া সেনাবাহিনী হইতে অবসর গ্রহণ করেন। এখন তিনি দিল্লীতেই অবসর জীবন যাপন করিতেছেন। নিবারণচন্দ্র কুচবিহার মেখলীগঞ্জে কবিরাজী করিতেন, তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা চিন্তাহরণ বেকার ছিলেন। পশ্চিম পাড়ার ভূঁঞা বাড়ীতে তখন ছয়টি পরিবার বাস করিতেন। অক্ষয়কুমার সেন, প্রকাশচন্দ্র সেন, নারায়ণ সেন, রজনীকান্ত সেন, ললিত সেন ও ঈশানচন্দ্র সেন। অক্ষয়কুমারের তিন পুত্র সতীশ, শ্রীশ ও যতীশ কুচবিহারে থাকিতেন। সতীশ সেনের জ্যেষ্ঠ পুত্র পরেশ প্রায় আমার সমবয়সী

ছিল। যতীশ কুচবিহার রাজদপ্তরে চাকুরী করিতেন। শ্রীশ ও যতীশ দুজনেই রাজ-কবিরাজ ছিলেন। প্রকাশ সেন স্কুলের সাব-ইনস্পেক্টর ছিলেন। অবসর গ্রহণের পর অনেক দিন পর্য্যন্ত গ্রামের স্কুলে শিক্ষকতা করেন। তাঁহার আট পুত্র—জ্ঞান, যতীন, দ্বিজেন, নগেন, মণি, হীরেন, শৈলেন ও জিতেন। সকলেই কৃতবিদ্য এবং জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হন। জ্ঞান ও দ্বিজেন সরকারী হাই স্কুলে হেডমাষ্টার ছিলেন, যতীন কুচবিহার ষ্টেটের নায়েব-আহিলকর (ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট) ছিলেন। নগেন, মণি রেলে চাকুরী করিতেন। শৈলেন ও জিতেন ডাক্তার ছিলেন। জিতেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য দপ্তরে ডেপুটি ডাইরেক্টর জেনারেল হইয়া অবসর গ্রহণ করেন। হীরেন প্রফেসার ছিলেন। তিনি গ্রামের বিদ্যালয় হইতে পনের টাকা ডিভিশনাল বৃত্তি পাইয়া ম্যাট্রিক পাশ করেন। গ্রামের বিদ্যালয় হইতে তিনিই সর্বপ্রথম এই বৃত্তি লাভ করেন। দ্বিজেন সেনের কন্যা ডাক্তার বিভা মজুমদার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ও একমাত্র মহিলা প্রেমচাঁদ ও রায়চাঁদ স্কলার। তিনি বর্ত্তমানে দিল্লী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রো-ভাইসচ্যান্সেলার ডাক্তার রমেশচন্দ্র মজুমদারের স্ত্রী। নারায়ণের একমাত্র পুত্র মানু আমার সমবয়সী ছিল। রজনী সেনের তিন পুত্র—জ্যেষ্ঠ উপেন্দ্র কুমিল্লায় থাকিত। দ্বিতীয় ক্ষিতীন্দ্র ডাক্তার ছিল। কনিষ্ঠটি পরবর্ত্তী জীবনে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ললিত সেন ময়মনসিংহ শহরে কবিরাজী করিতেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ধীরেন বিখ্যাত পালোয়ান ছিলেন। ঈশানের একমাত্র পুত্র যজ্ঞেশ্বর ওরফে অমৃতলাল কুমিল্লায় সরকারী চাকুরী করিতেন। তাঁহার পুত্র প্রমথকে আমি কলিকাতায় ব্যবসা করিতে দেখিয়াছি।

সূর্য্য সেনের অপর পৌত্র গঙ্গাধরের বংশধরেরা সমস্ত গ্রাম

ব্যাপ্ত করিয়াছিল। পূর্বেই বলিয়াছি লস্কর বাড়ী সরকার পাড়া, রমাকান্ত পাড়া, মজুমদার পাড়া, মুন্সীপাড়া, ছোট উত্তর পাড়া, বৈদ্য-বাড়ী প্রভৃতি গ্রামের অর্ধাংশ লইয়া তাহাদের বসতি ছিল।

লস্কর পাড়াতে চৌদ্দটি পরিবার ছিল—রত্নেশ্বর সেন, শশীকুমার সেন, নির্মল সেন, শীতল সেন, সত্য সেন, হরকিশোর সেন, তারক সেন, রাজেন সেন, বিশ্বেশ্বর সেন, বরদেশ্বর সেন, শিবেশ্বর সেন, আশু সেন, কালিবিনোদ সেন, দেবেন সেন ও সুহৃদ সেন। রত্নেশ্বরের বাড়ী বড় লস্কর বাড়ী বলিয়া পরিচিত। রত্নেশ্বর শ্রীনাথ ও শশী এই তিন ভাই মহেশ সেন লস্করের পুত্র। মহেশ সেন সাবজজ ছিলেন (১৮৭০—৯০)। তখনকার দিনে সাবজজগিরি বিচার বিভাগে ভারতীয়দের পক্ষে উচ্চতম চাকুরী রূপে পরিগণিত হইত। ছেলেরাও সকলেই কীর্তিমান, সকলেই গ্র্যাজুয়েট। গ্রামে তাঁহারাই প্রথম গ্র্যাজুয়েট। শুনিয়াছি রত্নেশ্বর কলিকাতা হাইকোর্টে প্র্যাকটিশও আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং সেখানে ওকালতিতে বেশ নামও হইতেছিল। কিন্তু তাঁহার মাতার ইচ্ছায় তাঁহাকে মুন্সীগঞ্জে—সাব-ডিভিশনাল আদালতে যোগ দিতে হইয়াছিল। পরবর্ত্তী যুগে তিনি এই আদালতের শ্রেষ্ঠ উকিল বলিয়া গণ্য হন এবং সমগ্র বিক্রমপুরে একজন শ্রেষ্ঠ নেতা রূপে সম্মান ও স্বীকৃতি লাভ করেন। দ্বিতীয় শ্রীনাথ মুন্সেফ হইয়াছিলেন, কিন্তু প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার আগেই এক ষ্টীমার দুর্ঘটনায় মারা যান। তাঁহার মাতা তখনও জীবিত ছিলেন। এই মৃত্যুতে তিনি অত্যন্ত শোক পান এবং প্রতিজ্ঞা করেন আর কোন পুত্রকেই তিনি নদী পার হইতে দিবেন না। তাই রত্নেশ্বরকে হাইকোর্ট ত্যাগ করিয়া মুন্সীগঞ্জে আসিতে হয়। এবং তিনি কনিষ্ঠ শশীকে গ্রামের

বাহিরেই যাইতে দেন নাই এই প্রতিশ্রুতি দিয়া যে তিনি চিরকাল তাহার ও তাহার পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণ চালাইবেন। ফলে শশীকুমার বিদ্বান হইয়াও (ইংরাজীতে তাঁহার খুব দক্ষতা ছিল) জীবনে কিছুই করেন নাই। কিন্তু এই ব্যর্থতা তিনি প্রচুর পরিমাণে পূরণ করিয়া লইয়াছিলেন। প্রথম জীবনে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত মিলিত হইয়া গ্রামে উচ্চ শিক্ষা বিস্তারে সাহায্য করেন। গ্রামের এম-ই স্কুলটিকে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে উন্নীত করিয়া ইঁহারা নিজ গ্রামে ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমুহের ছাত্রদের উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্তির সুযোগ করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহারা দুই ভাই ও ভ্রাতা শ্রীনাথের পুত্র নির্মল ও শীতল গ্রামের নানারূপ উপকার করিতেন। মাতার মৃত্যুর পর শশী গ্রাম ছাড়িয়া যান কিন্তু মাঝে মাঝে গ্রামে আসিতেন। শ্রীনাথের কনিষ্ঠ পুত্র অতুল সেন আই, ই, এস-এ যোগদান করিয়া মধ্য প্রদেশের ডি, পি, আই রূপে অবসর গ্রহণ করেন। তাহার বর্ত্তমান বয়স ৮৩ বৎসর। রত্নেশ্বরের চার পুত্র কার্ত্তিক গণেশ, সুবোধ ও ধনেশ। শ্রীনাথের তিন পুত্র নির্মল, শীতল ও অতুল। শশীর পাঁচ পুত্র, পরেশ, দীনেশ সুরেশ বা মুন্নু, সদাশিব ও বুড়শিব। মুন্নু-অল্প বয়সেই মারা যায়। সকলেই কৃতী ছিলেন।

ধনে, মানে, বিদ্যায় কৃষ্টিতে এই বড় লস্কর বাড়ী গ্রামের শ্রেষ্ঠ বাড়ীগুলির মধ্যে অন্যতম। এই বাড়ীর পুত্র ও কন্যা নির্বিশেষে সন্তানেরা কৃতী। এই পরিবারের দৌহিত্রদের মধ্যে সর্ব্বাগ্রগণ্য ভারত বিখ্যাত বিদ্বান ও পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী। এর পর উল্লেখযোগ্য সুকুমার সেন আই-সি-এস, অশোক সেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, ডাঃ অমিয় সেন ভারত বিখ্যাত শল্য চিকিৎসক ; জে, আর, সেন

আই-ই-এস প্রিন্সিপাল প্রেসিডেন্সী কলেজ এবং ভারত সরকারের চীফ বোটানিষ্ট। তাহার পর দিব্যেন্দু সেন জজ, আসাম হাইকোর্ট। ধীরেন সেন বাংলা সরকারের সেক্রেটারী ও বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চান্সেলার; আর, এন, সেন কলিকাতার শেরিফ; ডাঃ কে, এন, সেন ভাইস-প্রিন্সিপাল কলিকাতা মেডিকেল কলেজ এবং আরও অনেক।

সত্য সেন লস্কর হেডমাষ্টার ছিলেন তাঁহার দুই পুত্র কিরণ সেন ও মণীন্দ্র সেনকে আমরা জানিতাম। তৃতীয় পরিমলকে আমি দেখি নাই। হরকিশোর সেন সিলেটের সরকারী স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। তাঁহার চারি পুত্র—কামাখ্যা, বিমলা, মাখন ও অক্ষয়। তিনি পরবর্ত্তী কালে লস্কর পাড়ার বসতবাড়ী ভাঙ্গিয়া দক্ষিণ পাড়ায় আনিয়া বসতবাড়ী স্থাপন করেন। কালীবিনোদ সেনের দুই পুত্র সন্তোষ ও অকিঞ্চন। তাঁহার ভাই দেবেন সেন আসামে চাকুরী করিতেন কিন্তু দেশে বড় একটা আসিতেন না। শুনিয়াছি তাঁহার চারি পুত্র ছিল। সুহৃদ সেন কালীবিনোদ সেনের ভ্রাতুষ্পুত্র, বিবাহ করেন নাই। তারকেশ্বর ঠিক কি করিতেন মনে নাই। তাঁহার চার পুত্র জ্যেষ্ঠ অপূর্ব, রেঙ্গুনে লব্ধ প্রতিষ্ঠ ডাক্তার ছিলেন। দ্বিতীয়, তৃতীয় পাটনাতে ব্যবসা করিতেন (রোহিনী ও রেবতী), কনিষ্ঠ রমণী রেঙ্গুনে উকিল ছিলেন। তারক সেন শুনিয়াছি চারি পুত্র সহ স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া নিরুদ্দেশ হইয়া যান। পরে প্রায় দশ বৎসর পরে সংসারে ফিরিয়া আসেন। তারক সেনের কনিষ্ঠ রাজেন সেন আমাদের বাল্যকালে গ্রামেই থাকিতেন। পরে তিনি নারায়ণগঞ্জে স্থায়ী ভাবে বসবাস আরম্ভ করেন। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র হিমাংশু বর্ত্তমানে সোনারঙ্গ সম্মিলনীর সম্পাদক।

বিশ্বেশ্বর সেনের কোন পুত্র সন্তান ছিল না। বরদেশ্বরের তিন পুত্র নরেন, প্রফুল্ল ও শশধর। তাঁহারা নারায়ণগঞ্জে থাকিতেন। শিবেশ্বর নারায়ণগঞ্জ মিউনিসিপালিটীর সেক্রেটারী ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র শান্তি প্রসাদ ও শক্তি প্রসাদ। শান্তি প্রসাদ বেঙ্গল এগ্রিকালচারাল বিভাগের বড় অফিসার ছিলেন। আশু সেন পরবর্ত্তী জীবনে সিঙ্গাপুরে পুত্র সুকুমারের নিকট থাকিতেন। যতদূর মনে পড়ে সুকুমার সিঙ্গাপুরের কোনও রবার এষ্টেটে চাকুরী করিতেন। লস্কর পাড়াতে রত্নেশ্বর সেনের বাড়ীর উত্তরে আরো একটি পরিবার ছিল। ইঁহার বড় ভাই প্রসন্ন কুমার সেন আলিপুরের মোক্তার ছিলেন। ছোট ভাই কালিকুমার তেজপুরে (আসাম) চা বাগানে ডাক্তার ছিলেন। ইহারা রোষবংশীয় ছিলেন না।

সরকারেরা তিনটি বাড়ীতে বাস করিতেন। বড়, মধ্যম ও ছোট সরকার বাড়ী। বড় সরকার বাড়ীতে দুই পরিবার বাস করিত। কাশীচন্দ্র সেন ও দুর্গামোহন সেন। কাশীচন্দ্র কুমিল্লাতে সেরেস্তাদার ছিলেন। তাঁহার পাঁচ পুত্র অবিনাশ, অতুল, অনুকুল, অপূর্ব, অনিল। অবিনাশ অল্প বয়সে মারা যান। অতুল চট্টগ্রামে রেলে কাজ করিতেন। অনুকুল কুমিল্লায় ডাক্তার ছিলেন। অনিল বাংলা সচিবালয়ে চাকুরী করিতেন। চতুর্থ অপূর্ব মাতা পিতার সেবার জন্য ও গ্রামের সেবার জন্য উপযুক্ত শিক্ষালাভ করিয়াও গ্রামেই থাকিয়া যান। কিন্তু ইহাতে পরিবারের পক্ষে যাহা ক্ষতি স্বরূপ হইল, গ্রামের পক্ষে তাহাই হইল অপরিসীম কল্যাণকর। এই অক্লান্তকর্মা মাতৃভক্ত দেশসেবক অতি অল্প বয়সে তাঁহার মাতার মৃত্যুর সাথে সাথেই দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার

বয়স হইয়াছিল মাত্র উনচল্লিশ। ডাঃ দুর্গামোহন হোমিওপ্যাথ ডাক্তার হিসাবে গ্রামে খুব নাম করিয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বিরাজ ডিব্রুগড়ে (আসামে) ব্যবসা করিতেন। প্রথম জীবনে বিপ্লবী ছিলেন। ফরিদপুর ফতেজংপুরে রাজনৈতিক হত্যার দরুণ সন্দেহ ক্রমে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয় কিন্তু পরে প্রমাণাভাবে তিনি মুক্তি পান। তিনি গ্রামকে খুব ভালবাসিতেন। গ্রামের কেহ বিপদ আপদে তাঁহার নিকট গেলে তিনি সর্বদাই মুক্ত হস্তে অর্থ সাহায্য করিতেন। মধ্যম সরকার বাড়ী পাঁচটী পরিবার থাকিত। তারিণী সেন, মহিম সেন, বিশ্বেশ্বর সেন। শ্রীনাথ সেন ও চন্দ্র কুমার সেন। তারিণীর কোন পুত্র সন্তান ছিল না। তাঁহার কন্যার পুত্র নিশি সেন আসামে ডাক্তার ছিলেন। তাঁহার ভাগিনী অন্নদা-ঠাকুরাণী গ্রামে বিশেষ নামকরা মহিলা ছিলেন। তাঁহার দৌহিত্র ধীরেন্দ্র নাথ সেন ন্যাশনাল স্কুলের কৃতী ছাত্র ছিলেন। মহিম সেন মুন্সীগঞ্জে উকিল ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র মহেন্দ্র লাল ও অমৃত লাল। অমৃত লাল আসামে বনবিভাগে চাকুরী করিতেন। প্রথমে তিনি আসামে টুরাতে থাকিতেন। পরে ধুবড়ী আসিয়া স্থায়ী ভাবে বসবাস আরম্ভ করেন। দ্বিতীয় মহেন্দ্র লাল চিরকাল দেশে থাকিয়া দেশের সেবা করিয়া গিয়াছেন। বিশ্বেশ্বর রংপুর কুড়িগ্রামে থাকিতেন। তাঁহার তিন পুত্র ব্রহ্মানন্দ, রাজেশ্বর ও সত্যানন্দ। ব্রহ্মানন্দ কুড়িগ্রামে উকিল ছিলেন। রাজেশ্বর ছিলেন ডাক্তার, সত্যানন্দ আসাম গভর্ণমেণ্ট স্কুলে শিক্ষকতা করিতেন। শ্রীনাথ সেনের একপুত্র সন্তোষ যশোর কোর্টে চাকুরী করিতেন। চন্দ্রকুমার সেন কুমিল্লা আদালতে সেরেস্তদার ছিলেন। তাঁহার ছয় পুত্র নবীন, ভুবন, প্রতাপ, রাধিকা অবিনাশ ও বরদা।

ছোট সরকার বাড়ীতে তিনটি পরিবার ছিল—শ্রীনাথ সেন ও তাঁহার পুত্রগণ ললিত, জ্ঞান, যতু, যতীন ও সুরেন্দ্র। শ্রীনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র অবনী ও রমণী এবং রায় সাহেব কালীমোহন সেন। কালীমোহন আসামে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাক্তার ছিলেন। তাঁহার পুত্র স্বনামধন্য বিনয়রঞ্জন সেন আই-সি-এস. এতদিন পর্য্যন্ত আন্তর্জাতিক খাদ্য সংস্থার সভাপতি রূপে চাকুরী করিয়া সম্প্রতি অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। অন্য এক পুত্র ডাক্তার জে, আর, সেন।

মজুমদার বংশীয় একজনের কথাই আমরা জানি, কিন্তু তাঁহাকে আমরা দেখি নাই। তাঁহার নাম উমানাথ মজুমদার। তিনি পরিণত বয়সে অপুত্রক অবস্থায় মারা যান। তাঁহার স্ত্রী ও কন্যাদিগকে আমরা দেখিয়াছি। এক দৌহিত্র পরেশ আমাদের বন্ধু ছিল। মজুমদার বংশ লুপ্ত হইয়া যায়।

রমাকান্ত বংশীয়গণ যে পাড়াতে থাকিত তাহা রমাকান্ত পাড়া নামে পরিচিত। আটটি পরিবার এখানে বাস করিত—জগবন্ধু সেন ও তাঁহার তিনপুত্র কামাক্ষা, প্রফুল্ল ও নৃপেন্দ্র। কামাক্ষার পুত্র অধ্যাপক প্রমোদচন্দ্র সেন বঙ্গবাসী কলেজের ভাইস-প্রিন্সিপাল ছিলেন। তিনি সোনারঙ্গ সম্মিলনীর প্রাক্তন সভাপতি। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রতিভাবান্ ছাত্র। তিনি ছেলেবেলায় খেলাধুলাতে বিশেষতঃ লাঠিখেলায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। তাঁহার পুত্র বর্ত্তমানে দক্ষিণ কলিকাতার লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক ডাঃ হিমাংশু সেন। তাঁহার ছোট ভাই রবীন্দ্র ডাক্তার। দীনবন্ধু সেনের পুত্র যোগেন্দ্র সেন। দীনবন্ধু আসামে চাকুরী করিয়া অবসর জীবন গ্রামেই কাটাইয়া যান। বিপিন সেনের চার পুত্র বিনোদ, পুলিন, অটলবিহারী ও নীরদ। বিনোদ ডাক্তারী পাশ

করিয়া বহুকাল গ্রামেই ডাক্তারী করেন। পুলিন রাসায়নিক ও অটল কৃষি বিভাগের অফিসার ছিলেন। ভগবানচন্দ্র সেন ময়মনসিংহের কোন জমিদারের কাছারীতে কাজ করিতেন। তাঁহার চার ছেলে অখিল, অতুল, প্রতুল ও সমতুল। প্রতুলের ছেলে বিমলেন্দু সোনারঙ্গ সম্মিলনীর একজন অক্লান্ত কর্মী। নন্দলাল সেন অপুত্রক অবস্থায় মারা যান। আর এক পরিবার হইল মনোমোহন, অবনীমোহন ও তাঁহাদের ভ্রাতুষ্পুত্র যোগেশ। মনো-মোহনের জ্যেষ্ঠ পুত্র সুধীর আমাদের সমবয়সী। সে এখন কলিকাতায় বাড়ী করিয়া আছে। নন্দলাল সেনের বাড়ীতে রঘুনাথ সেনের তৃতীয় ছেলে গোবিন্দের বংশধর যোগেশ ও সুরেশ থাকিত। পরে তাহারা বেড়া চলিয়া যায়।

গঙ্গাধরের নিম্নলিখিত বংশধরগণ ছোট উত্তর পাড়াতে থাকিতেন। রজনীকান্ত সেন সেরেস্তাদার ছিলেন। তাঁহার ছেলে প্রিয়কান্ত, শশধর, নলিনী ও যামিনী। প্রিয়কান্ত সেনের ছেলে ডাক্তার অবলাকান্ত। শশধরের ছেলে হরিসাধন, লক্ষ্মীসাধন ও বাণীসাধন। নলিনীকান্তের পাঁচ ছেলে এবং যামিনীকান্তের একমাত্র ছেলে অরুণ। প্রিয়কান্ত আবগারী বিভাগের ইনস্পেক্টর ছিলেন। তাঁহার একমাত্র ছেলে অবলাকান্ত ডাক্তারী পাশ করিয়া কলিকাতাতেই ডাক্তারী করেন। তিনি চিরকালই গ্রামের হিতাকাঙ্ক্ষী এবং এখনও গ্রামবাসীদের নানা সুখ-সুবিধার জন্য তাঁহার আগ্রহ অসামান্য। বর্ত্তমানে ইনি সোনারঙ্গ সম্মিলনীর সভাপতি। তাঁহার স্ত্রী ভবানী সেন গ্রামেরই কন্যা এবং সোনারঙ্গ সম্মিলনীর প্রাণস্বরূপা। সোনারঙ্গ সম্মিলনী তাঁহারই একান্ত চেষ্টায় সগৌরবে আছে। নলিনীকান্ত সওদাগরী অফিসে

চাকুরী করিতেন এবং যামিনীকান্ত ছিলেন সিভিল-সার্জন। শশধর সেন অল্প বয়সেই জরাগ্রস্থ হইয়া পড়েন। রজনীকান্তর ভ্রাতা তারাকান্তর পুত্র সুধীর মাদারীপুরে হোমিওপ্যাথ ডাক্তারী করিতেন। তিনি নাটক অভিনয়েও বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। এই বংরেশই অপর ধারায় পূর্ণচন্দ্র সেনের পুত্রগণ সতীশ, ক্ষিতীশ ও নীতিশ গ্রাম ছাড়িয়া বহরমপুরে বসবাস আরম্ভ করেন। ভগবানচন্দ্র সেন অপুত্রক অবস্থায় মারা যান। আর এক পরিবার ছিলেন আনন্দচন্দ্র সেন ও গোবিন্দচন্দ্র সেন। আনন্দ সেনের তিন পুত্র—প্রফুল্ল, অনিল ও বিপুল। প্রফুল্ল গ্রামের হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন এবং সর্বদাই গ্রামকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করিতেন। অনিল ছিলেন পশু চিকিৎসক এবং বিপুল ছিলেন ডাক্তার। গোবিন্দ চন্দ্র গ্রামেই থাকিতেন। তিনি গ্রামের মেয়েদের শিক্ষার জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন। আর ছিলেন মুন্সীগঞ্জের উকিল বিশ্বম্ভর সেন। তিনি অপুত্রক অবস্থাতে মারা যান। গ্রামের হাইস্কুল ভবন নির্মাণের জন্য খুবই অল্প মূল্যে জমি দান করেন। তাঁহার ভ্রাতা প্রসন্ন সেন ঢাকায় লব্ধ-প্রতিষ্ঠ উকিল ছিলেন। অতিথিবৎসল রূপে ঢাকা শহরে তাঁহার বেশ নাম ছিল। তাঁহার পুত্র ডাঃ তারক সেন হোমিওপ্যাথী ডাক্তার রূপে খুব সুনামের অধিকারী হন।

এই বংশেরই আর এক ধারা গ্রামের আর এক অংশে নৈরবাড়ীতে বাস করিতেন। মোট ছয়টি পরিবার সেখানে থাকিত। নবকিশোর সেনের ছয় পুত্র ছিল। হরিপ্রসন্ন, তারাপ্রসন্ন, নিবারণ, শরৎ, মনোরঞ্জন ও নগেন। নগেন আমার সমবয়সী ও বন্ধু ছিল। নবকিশোরের ভ্রাতা ভারতচন্দ্রের দুই পুত্র নিত্যানন্দ ও আশুতোষ।

নিত্যানন্দের এক ছেলে বর্ত্তমান। গৃহে থাকিয়াও ইনি সাধকের জীবন যাপন করেন। তাই গ্রামে তাঁহার পরিচয় ছিল "নিতাই সাধু" নামে। আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র ছিলেন। ইনি বি, এ, পরীক্ষায় সংস্কৃতে প্রথম হইয়া "ঈশান" বৃত্তি লাভ করেন। প্রথম জীবনে অবশ্য গ্রামের স্কুলে বিশেষ সুনামের সঙ্গে শিক্ষিকতা করিয়াছেন। পরে কোন কলেজে অধ্যাপক হইয়া পাটনা চলিয়া যান। সেখানেই অল্প বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন। চন্দ্রমোহনের পুত্রগণ কেদারেশ্বর, যজ্ঞেশ্বর, ভুবনেশ্বর ও বিনোদেশ্বর এবং ভ্রাতা নবীনচন্দ্রের পুত্রগণ রত্নেশ্বর, তারকেশ্বর এবং ক্ষীরোদেশ্বর গ্রামে খুব কম আসিতেন। তাঁহারা প্রবাসেই থাকিতেন, কুমিল্লা ও রংপুরে আমরা কেবল ক্ষীরোদেশ্বরকেই দেখিয়াছি। সে আমাদের সমবয়সী ছিল। পরবর্ত্তী কালে রত্নেশ্বর একবার দিল্লীতে আমার বাড়ীতে আসিয়াছিল।

মুন্সীপাড়াতেও গঙ্গাধরের বেশ কয়েক ঘর বংশধর বাস করিতেন। রামদাস সেনের সাত পুত্র ছিল। তন্মধ্যে রূপচন্দ্র ও জগচ্চন্দ্র বেশ কীর্ত্তিমান ছিলেন। তাঁহারা রূপমুন্সী ও জগৎমুন্সী নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁহাদের নামেই পরে উত্তর পাড়ার নাম মুন্সীপাড়া হয়। মুন্সীপাড়ার দিঘীর দক্ষিণ পারে তাঁহাদের বসত-বাড়ী ছিল। রূপমুন্সী এই বাড়ী ছাড়িয়া দিঘীর পশ্চিম পাড়ে আপন বাসভবন নির্মাণ করেন। অন্য ভাইরা পুরাতন বাড়ীতেই রহিয়া যান। এই ভাইদের পাঁচ জন নিঃসন্তান ছিলেন। মধ্যম ভ্রাতা রামরাজার পৌত্র উমাচরণ, কালীপদ ও হরিপদ আমাদের সময়ে জীবিত ছিলেন। উমাচরণ নিঃসন্তান, হরিপদর সন্তানরা কলিকাতায়

থাকে। কালীপদ গ্রামে দ্বিতীয় এম-এ (১৮৯৫), তিনি খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া লক্ষ্নৌ-এর এক খৃষ্টীয়ান কলেজে অধ্যাপক হন। তাঁহার তুই ছেলে সিসিল ও এরিক সেনকে আমি দিল্লীতে দেখিয়াছি। খৃষ্টান হইয়া দেশ ও সমাজ ছাড়িয়া গেলেও তিনি বরাবর আপনার দুঃস্থা ভগ্নী বামাঠাকুরাণীকে অর্থ সাহায্য করিতেন। এমন কি তাঁহার মৃত্যুর পরও তাঁহার বিধবা স্ত্রী তাঁহার ইচ্ছানুসারে বামা-ঠাকুরাণীকে অর্থ সাহায্য করেন। রূপমুন্সী দীঘির উত্তরে মাতার শ্মশানের উপর মঠবাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া সেখানে কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। পরে তাঁহার ছেলে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ভগবান সেন ঐ মঠের পাশেই পিতার শ্মশানের উপর আর একটি মঠ নির্ম্মাণ করিয়া শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। এই মঠ তুইটিই সোনারঙ্গে জোড়ামঠ নামে প্রসিদ্ধ। রূপমুন্সীর তিন ছেলে গোবিন্দ, আনন্দ ও ভগবান। গোবিন্দের ছয় ছেলে প্রতাপ, রসিক, সতীশ, হেম, সুরেশ ও যোগেশ। আনন্দের চার ছেলে কালীশ, কাশী, অখিল ও শীতল। ভগবান ভ্রাতুষ্পুত্র অখিলকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। রূপমুন্সীর বাড়ীই গ্রামে মুন্সীবাড়ী নামে পরিচিত ছিল। পরে ভগবান বরিশালে দাঁতপুর পরগণায় বিশাল জমিদারী কিনিলে এই বাড়ীকেই লোকে সোনারঙ্গের জমিদার বাড়ী বলিত। পুত্র অখিল ছিলেন খোশমেজাজের লোক। গান বাজনা থিয়েটারের খুব ভক্ত এবং ইহার জন্য অকাতরে অর্থব্যয়ে কার্পণ্য করেন নাই। কোন এক নাটকে মহারাজের ভূমিকায় অভিনয় করেন। সেইদিন হইতে লোকে তাঁহাকে "মহারাজ" বলিত এবং তাঁহার ছেলে ধীরেন সেনকে "কুমার বাহাদুর" বলিত। কাশীচন্দ্র শবদাহ করিতে এবং অনেক মজার মজার গল্প বলিতে ওস্তাদ ছিলেন।

শিব সেনের বাড়ীতে আমরা দুইটি পরিবারই দেখিয়াছি। খুল্লতাত রায় বাহাদুর বিপিন সেন ও ভ্রাতুষ্পুত্র অনুকূল সেন। ছেলে জ্যোতিষকে নিয়া বিপিন শিলং-এ থাকিতেন। অনুকূল চট্টগ্রামে রেলে চাকুরী করিতেন। দুই ভাই কালীকুমার ও হরকুমার সেন বরিশালের ভোলাতে থাকিতেন। কালীকুমারের তিন ছেলে চুনীলাল, অমূল্যরতন ও অনিলকুমার। চুনীলাল উকীল ছিলেন। হরকুমারের তিন ছেলে সরোজ, শচীন ও শিশির। শচীন বাল্যে মৃত। কালীপ্রসন্ন সেন গ্রামেই থাকিতেন। তাঁহার ছেলে উপেন্দ্র পোষ্টমাষ্টার ছিলেন। উপেন্দ্রের তিন ছেলে সঞ্জীব, উৎফুল্ল ও নীহার। উৎফুল্ল সোনারঙ্গ সম্মিলনীর বিশিষ্ট কর্মী ছিলেন।

গোলোক সেন ডাক্তারের দুই ছেলে যতীন্দ্র ও সত্যেন্দ্র গ্রামে তামা ও লোহা নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁহারা বাকীপুরে থাকিতেন। গোলক ডাক্তারের দৌহিত্র জীতেন মজুমদার ও মণি মজুমদার সোনারঙ্গে থাকিতেন। এই জীতেনের একক চেষ্টায় সোনারঙ্গ বিদ্যালয় একবার অবলুপ্তির হাত হইতে রক্ষা পায়। যতীনের চার ছেলের মধ্যে বিনয় ও সুশীলকে আমি দেখিয়াছি। সত্যেনের ছেলেদের আমি দেখি নাই। কালীদাস সেন কলিকাতায় জ্যোতিষী ও কবিরাজী করিতেন। তাঁহার পাঁচ ছেলে শৈলেন, জ্যোতি, খগেন, সমর ও বিনয়। অন্নদা কুমারেরা দুই ভাই ছিলেন, অন্নদা ও বরদা। অন্নদা ঢাকার বিখ্যাত জমিদার রূপবাবু ও রঘুবাবুর গৃহশিক্ষক ছিলেন। তাই তাঁহাকে সকলে অন্নদা পণ্ডিত বলিয়া ডাকিত। তাঁহার তিন ছেলে কুঞ্জ, লালবিহারী ও বিপিন। বিপিন বিহারে সিভিল-সার্জেন ছিলেন। বরদার ছেলে বিনোদ মুন্সীগঞ্জে থাকিতেন। তাঁহার কন্যা রেণু সেন (রায়) বাংলার

বৈপ্লবিক ইতিহাসে একটি উজ্জ্বল নাম। অন্নদা পণ্ডিতের জ্যেষ্ঠতাত ভ্রাতা করুণা সেন কলিকাতায় ডাক্তার ছিলেন। রজনীকান্ত সেনের তিন পুত্র হর্ষ, দেবেন ও হরেন—তিন জনেই ডাক্তার। হর্ষ বাংলাতে ডাক্তারী শিক্ষা করিয়াছিলেন। ইনি সোনারঙ্গ বিদ্যালয়ে বৃত্তি লইয়া সোজা ঢাকা মেডিকেল স্কুলে ভর্ত্তি হন। তখনকার দিনে এম-ই স্কুল হইতে গেলে সেখানে বাংলাতেই ডাক্তারী পড়িতে পারিত। এই সব ছাত্রদের ভি-এল-এম উপাধি বা ডিপ্লোমা দেওয়া হইত। তিনি চকিৎসা বিদ্যায় প্রভূত যশোপার্জ্জন করেন। হরেন্দ্র প্রথম জীবনে একজন বিশিষ্ট বিপ্লবী নেতা ছিলেন এবং বহু বৎসর অন্তরীণ হইয়া থাকেন। হর্ষনাথ সেনের ভাগ্নেয় আউটসাহী গ্রামের অমূল্য সেন ও মাখন সেনের বৈপ্লবিক ও সাংবাদিক জীবনের প্রধান সহকারী ছিলেন।

রোষ বংশের পর সংখ্যার দিক দিয়া সেন উপাধিধারী বিশারদগণ। ধনে, মানে, বিদ্যায়, কৃষ্টিতে এই বিশারদরাও উচ্চ আসন পাইতেন। বিশারদরা ছয়টি এলাকায় বাস করিতেন, পুরাণ বিশাবদ বাড়ী, ঈশ্বর কেরাণীর বাড়ী, পুরাতন বিশাবদ বাড়ী বা জানকী বিশারদের বাড়ী, নয়া বাড়ী বা অম্বিকা বিশারদদের বাড়ী, প্যারী কবিরাজের বাড়ী ও মুন্সীপাড়া বিশারদ বাড়ী। ঈশ্বরচন্দ্র সেন গ্রামে ঈশ্বর কেরাণী নামে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু আমি অনেক খোঁজ করিয়াও এই “কেরাণী” নামের অর্থ বাহির করিতে পারি নাই। তিনি গ্রামে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহাকে বা তাঁহার পুত্র নলিনী সেনকে আমি দেখি নাই। তাঁহার পৌত্র পরেশকে দেখিয়াছি। সে সদাহাস্যময় ও খুব আমোদপ্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। অতি অল্প বয়সেই তাঁহার মৃত্যু হয়। ঐ বাড়ীর

ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট জগবন্ধু সেনের পুত্র অখিলবন্ধু, তারকবন্ধু ও প্রিয়বন্ধুকে আমি দেখিয়াছি। তাহাদের বাড়ীতে মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং তাঁহার নিত্য পূজা হইত। ভুবন বিশারদ ও বরদা বিশারদ নামে দুই ভাই ছিলেন। ভুবনের দুই পুত্র চিন্তাহরণ ও বিনয়। চিন্তাহরণ ডাক্তার ছিলেন। বিনয়ের একটি পুত্র আছে। বরদা বিশারদের প্রথম পুত্র সুশীলের একটি ছেলে আছে ও দ্বিতীয় পুত্র অনিল ম্যাট্রিক পরীক্ষায় দশ টাকা বৃত্তি পায়।

জানকী বিশারদ বাড়ীর জানকী বিশারদেরা দুই ভাই ছিলেন। জানকীনাথ ও গুরুনাথ। জানকী বিশারদ চট্টগ্রামে থাকিতেন। তাঁহার এগারটি কৃতবিদ্য পুত্র ছিল। দেবেন্দ্র, জ্ঞানেন্দ্র, ব্রজেন্দ্র, সুরেন্দ্র, নগেন্দ্র, উপেন্দ্র, যোগেন্দ্র, ধীরেন্দ্র, ক্ষিতীন্দ্র ও আরো দুই জন। ব্রজেন্দ্র সিঙ্গাপুরে ডাক্তার ছিলেন। তাঁহার কন্যা ইলা সেন বাংলার রাজনৈতিক জীবনে বেশ নাম করিয়াছিলেন। সুরেন্দ্র ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। ক্ষিতীন্দ্র ভারত সরকারের উচ্চ রাজকর্মচারী ছিলেন। বর্ত্তমানে অবসর গ্রহণের পর ইনি সোনারঙ্গ সম্মিলনীর একজন বিশিষ্ট কর্মী। জ্যেষ্ঠ দেবেন্দ্র ও দ্বিতীয় জ্ঞানেন্দ্র সচিবালয়ে চাকুরী করিতেন। দেবেন্দ্রর দ্বিতীয় পুত্র শচীন আলিপুর বোমার মামলায় অভিযুক্তদের মধ্যে ছিলেন। জেল হইতে মুক্তি পাইয়া তিনি রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। জানকীর ভাই গুরুনাথ ডাক্তার ছিলেন। তাঁহার সাত পুত্র মাখনলাল, হীরালাল, মতিলাল, ননীলাল, রঙ্গলাল, জহরলাল ও পান্নালাল। মাখনলাল বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের প্রধান নেতা ছিলেন। ইঁহাকে বৃটীশ সরকার বহুদিন অন্তরীণ রাখেন। মুক্তি পাওয়ার পর গ্রামে আসিয়া তিনি জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন

করেন। পরবর্ত্তী জীবনে আনন্দবাজার পত্রিকাকে আপন অসাধারণ কর্ম্মদক্ষতায় ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পত্রিকারূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। মাখনলালের অনুজ রঙ্গলাল কলিকাতায় ডাক্তারী করেন। নীলকমল অপুত্রক ছিলেন। ভ্রাতা করুণা কমলের পুত্র শৈলেশ মালদহে ডাক্তারী করে। অপর ভ্রাতা নবীন কমলের ছেলে নরেন্দ্র, নিবারণ, রবি, শচীন, মণীন্দ্র চট্টগ্রামে থাকিতেন। নরেন ও নিবারণ চট্টগ্রামে উকীল ছিলেন। শ্রীকান্ত বিশারদের ছেলে প্রিয়কান্ত বিশারদ প্রথম জীবনে গ্রামেই ডাক্তারী করেন, পরে অন্যত্র যান। ঐ বাড়ীরই জ্ঞান সেন চট্টগ্রামে থাকিতেন। তাঁহার পুত্র বিনয়ভূষণ সেন দেশ বিভাগের পর দিল্লী আসেন। তাঁহার পুত্রেরা দিল্লীতেই থাকে। নীলকমলের অপর ভ্রাতুষ্পুত্ররা হেম, ইন্দ্র, হারাণ ও কৃতার্থ সবাই এক্ষণে মৃত। হারাণের পুত্র হরিপদ দিল্লীতেই থাকে। নরেন সেনের পুত্র আদিনাথ ভারত সরকারের ডেপুটী সেক্রেটারী হইয়াছে।

নয়া বিশারদ বাড়ীর অম্বিকা সেন ও তাঁহার ভ্রাতা করুণা নিঃসন্তান ছিলেন। তাঁহাদের ভ্রাতুষ্পুত্র সাবজজ দেবেন সেনের পুত্র ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট দ্বিজেন সেন। দ্বিজেন সেনের জ্যেষ্ঠপুত্র দিব্যেন্দু আসাম হাইকোর্টের জজ। শরৎ সেন ও ষোড়শী অপুত্রক অবস্থায় মারা যান। চার ভাই রাজকুমার, চন্দ্রকুমার, ব্রজেন ও মহেন্দ্র এক্ষণে সবাই মৃত। রাজকুমারের তিন ছেলে বহরমপুরে থাকেন। চন্দ্রকুমারের জ্যেষ্ঠপুত্র মণীন্দ্র ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও দ্বিতীয় পুত্র শৈলেন ঢাকার লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাক্তার ও পাকিস্থান সরকারের প্রতিনিধি হইয়া পৃথিবীর বহু স্থান ভ্রমণ করেন। ব্রজেন্দ্র সেন ডাক্তার ছিলেন। মহেন্দ্র ছিলেন হেড মাষ্টার। তাঁহার

একমাত্র পুত্র স্বনামধন্য ডাক্তার সতীন্দ্র সেন। ইনি সোনারঙ্গ সম্মিলনীর প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম। বর্ত্তমানে খুব অসুস্থ হইয়া শয্যাগত আছেন। প্রাণকুমার ও সন্তোষ সেন এই বাড়ীরই লোক। প্রাণকুমার ছিলেন কাননগু, কিন্তু সন্তোষ সেন কি করিতেন তাহা জানা নাই।

আনন্দ বিশারদ বাড়ীর রায় বাহাদুর আনন্দচন্দ্র সেন প্রথম জীবনে স্কুল মাষ্টার ছিলেন। পরে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া বহুকাল চাকুরী করেন। সমস্ত বিক্রমপুরে সবাই "রায়বাহাদুরের" বাড়ী চিনিত। তিনি ১৯১১ সনে গ্রামেই মারা যান। তাঁহার ছয় ছেলে কৈলাস ডাক্তার, দ্বিতীয় যোগেশ সাবডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, উমেশ ম্যাজিষ্ট্রেট, রমেশ আয়কর কমিশনার, সুরেশ ডিষ্ট্রিক সেসন্ জজ এবং ধনেশ সাব ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট। কৈলাসচন্দ্রের অল্প বয়সে মৃত্যু হয় এবং যোগেশ রোগগ্রস্থ হইয়া পড়েন। উমেশের ছেলে হারাণচন্দ্রও ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। আনন্দ সেনের পাঁচ ভ্রাতুষ্পুত্র নারায়ণ, ভগবান, হেমচন্দ্র, বীরেন্দ্র ও মহেন্দ্র। মহেন্দ্র বিবাহের পর গৃহত্যাগ করিয়া যান। এই বাড়ীর অপর গৃহস্থ তারাপ্রসাদ ফরিদপুর মাদারীপুরে উকীল ছিলেন। তাঁহার একমাত্র ছেলে জ্যোতিষ প্রসাদ রেলে মেডিকেল অফিসার ছিলেন। তাঁহার ছেলে কালীপ্রসাদ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন।

প্যারীমোহন সেন কবিরাজের বাড়ী গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে ছিল। তাঁহার বাড়ীকে সাধারণতঃ লোকে লখার বাড়ী বলিত। তিনি ময়মনসিংহে সুবিখ্যাত কবিরাজ ছিলেন। তাঁহার দুই ছেলে মনমোহন ও বিরাজ। মনমোহন সাহিত্যিকও ছিলেন। শিশুপাঠ্য হাসিখুসী ও খোকার দপ্তর নামে বিখ্যাত বই দুখানি তাঁহার লেখা।

পিতার জীবদ্দশাতেই তিনি মারা যান। বিরাজ কবিরাজ ছিলেন। প্যারীমোহনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাজমোহন প্রথম জীবনে স্কুল মাষ্টার ছিলেন। পরে বহুকাল ব্যাধিগ্রস্থ হইয়া কাটান। তাঁহার চার পুত্র প্রফুল্ল, নরেন, ভুপেন ও গোপেন। প্যারীমোহনের অপর ভ্রাতা ভুবনমোহন হোমিওপ্যাথ ডাক্তার ছিলেন এবং কাশীতে থাকিতেন। তাঁহার ছিল তিন পুত্র, অবনীমোহন, ধরণীমোহন, ক্ষিতিমোহন। অবনীমোহন গ্রামের স্কুলের হেড মাষ্টার ছিলেন। অল্প বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ বীরেন কলিকাতার বিখ্যাত কনট্রাক্টার ছিলেন। কনিষ্ঠ ধীরেন ছিলেন বাংলার শিক্ষাসচিব। পরে তিনি বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হন। ধরণীমোহন গ্রামেই থাকিতেন। তাঁহার শংকর ও লংকর নামে দুই পুত্র ছিল। ক্ষিতিমোহন কাশী হইতে এম, এ পাশ করিয়া শান্তিনিকেতনে শিক্ষকতা করিতেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গী হইয়া ভক্ত পণ্ডিত বলিয়া তিনি জগৎব্যাপী খ্যাতির অধিকারী হন। ক্ষিতিমোহনের একপুত্র ক্ষেমেন আনন্দবাজার পত্রিকার সহিত সংযুক্ত। মুন্সীপাড়ার বিশারদদের এক ধারার পাঁচ ভাই, মন্মথ, প্রমথ, নরেন, যতীন ও জিতেন সেন। ঐ বাড়ীরই অন্য ধারায় ছিলেন ডাক্তার হরেন, ভুপেন, ধীরেন ও বীরেন সেন। মন্মথ আসানসোলে রেলে চাকুরী করিতেন। নরেন ঢাকাতে থাকিতেন। প্রমথ আসামের চা বাগানে চাকুরী করিতেন, যতীন ওভারসিয়ার ছিলেন ও জিতেন (যাদু) কয়লাখনিতে চাকুরী করিতেন, ডাক্তার হরেন রেলে মেডিকেল অফিসার ছিলেন।

দাশগুপ্তগণ :

বিশারদদের পরেই আসে দাশগুপ্তদের কথা। সর্বসমেত

তাঁহারা ছিলেন বারটি পরিবার। কিন্তু সকলেই এক পরিবার ভুক্ত ছিলেন না। এক পরিবার ভুক্ত ছিলেন চারু আবাস ও মুন্সেফ বাড়ীর লোকেরা। চারু আবাসের বিশ্বেশ্বর দাশের তিন পুত্র সুরেশ, জিতেন ও তড়িৎ। সুরেশ দাশ সারা জীবন দেশে থাকিয়া গ্রামের পরম সেবা করিয়াছেন। দেশ বিভাগের পরই তিনি দেশত্যাগ করেন। আমাদের সৌভাগ্য তিনি এখনও জীবিত এবং তাঁহার বয়স এখন সাতাশী। জিতেন প্রথমে গ্রামের স্কুলে এবং পরে রংপুর গাইবান্ধা স্কুলে শিক্ষকতা করিয়া বাকী জীবন কলিকাতায় অতিবাহিত করেন। আধুনিক জ্ঞান তাঁহার খুব ছিল এবং খুব ভাল থিয়েটার করিতে পারিতেন। কনিষ্ঠ তড়িৎ দাশগুপ্ত সরকারী মেডিকেল অফিসার ছিলেন। বিশ্বেশ্বরের ভ্রাতুস্পুত্র রমণী দাশ গাইবান্ধাতে উকিল ছিলেন। তাঁহার তিন পুত্র হিরণ, চারু ও ঊষা। চারু প্রায় আমার সমবয়সী ছিলেন। এই বাড়ীরই দুই ভাই রামদুর্লভ ও পদ্মমুন্সী মুন্সেফ ছিলেন। রাম-দুর্লভের দুই পুত্র অম্বিকা ও হারাণ। অম্বিকা চিরকাল গ্রামেই থাকিয়াছেন এবং হারাণ সহকারী ইনেসপেক্টার অব্ স্কুল রূপে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁহার পুত্র প্রমথ অল্প বয়সে মারা যায়। প্রমথর ছেলে দেবশরণ কলিকাতায় থাকে। অম্বিকার চারপুত্র হেম বিমলা, ও নৃপেন (বাঘা) ও সুবোধ। হেম কলিকাতায় ও বিমলা ও নৃপেন আসামে থাকিত। নৃপেন খুব ভাল ফুটবল খেলিত। গ্রামে যুবকদের মধ্যে সে বেশ একজন উৎসাহী কর্মী ছিল। সুবোধের অল্প বয়সেই মৃত্যু হয়। পদ্মলোচন দাশের তিনপুত্র। বসন্ত, তারাপ্রসন্ন ও চন্দ্রপ্রকাশ। বসন্ত দেশেই থাকিত। তাহার ছয় পুত্র। নকুলেশ্বর, বিনয়, অতুল, নরেশ,

যত্ন ও নীললোহিত। নকুলেশ্বর কলিকাতায় 'ষ্টেটস্ম্যান" অফিসে চাকুরী করিতেন; বিনয় নাগপুরে থাকিতেন; অতুল, নরেশ ও নীললোহিত ভারত সরকারে চাকুরী করিতেন। অতুল ও নীল-লোহিত নিজের কর্মকুশলতায় কর্মক্ষেত্রে খুব উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। অতুল দাশ রায় বাহাদুর উপাধি পাইয়া ছিলেন এবং দিল্লীর বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালী সমাজে বেশ উচ্চ স্থানে আসীন ছিলেন। তিনি খুব ভালো ইংরাজী জানিতেন। তিনি ডেপুটি সেক্রেটারী হইয়া অবসর গ্রহণ করেন। নীললোহিত রায় সাহেব খেতাব পান ও রেল সচিবালয়ে অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী হইয়া অবসর গ্রহণ করেন। যত্নাথ কলিকাতায় থাকিতেন। বসন্ত দাশের দ্বিতীয় ভ্রাতা তারাপ্রসন্ন মুন্সেফ ছিলেন। তিনি অল্প বয়সেই মারা যান। কনিষ্ঠ ভ্রাতা চন্দ্রপ্রকাশ ঢাকা কোর্টে চাকুরী করিতেন। তাঁহার তিন পুত্র ব্যোমকেশ, সীতেশ, ও অংশুপ্রকাশ। ব্যোমকেশ ডাক্তার, সীতেশ পার্লামেণ্টে চাকুরী করিতেন। অংশুপ্রকাশ মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়া সিরাজ-উল-ইসলাম নাম গ্রহণ করিয়া ঢাকায় বাস করিতেন। বিশ্বেশ্বরের জ্যেষ্ঠতাত কাশীদাস ও খুল্লতাত রামদুর্লভ ও পদ্মলোচন বসতবাড়ী-ত্যাগ করিয়া গ্রামেরই অন্যত্র নিজেদের বাস স্থাপন করেন। পরবর্ত্তীকালে এই বাড়ীই মুন্সেফ বাড়ী নামে পরিচিত হয়। রামদুর্লভ ও পদ্ম-লোচনের কথা পূর্বেই বিবৃত হইয়াছে। কাশী দাশের পুত্র মহিমদাশকে আমরা দেখিয়াছি। মহিম দাশের কনিষ্ঠ পুত্র ডাঃ নারায়ণ-চন্দ্রের পুত্র প্রদীপ দিল্লীতেই থাকে। জ্যেষ্ঠপুত্র মনোরঞ্জনের পুত্র ও কালীপদ ও আর একটি পুত্র যৌবনেই মৃত।

অন্যান্য দাশেদের মধ্যে ছিলেন রমাকান্ত পাড়ার কৈলাস

দাশগুপ্ত। তিনি চট্টগ্রামে বিশিষ্ট উকিল ছিলেন। তাঁহার একমাত্র ছেলে গোপালও চট্টগ্রামে ওকালতি করিতেন। ললিত মোহন দাশ স্বনামধন্য কবিরাজ ছিলেন। তিনি প্রথম জীবনে গ্রামে থাকিয়া গ্রামের সেবা করেন, পরে কলিকাতায় যান। তাঁহার তিন ছেলে আশুতোষ, সন্তোষ ও পরিতোষ। মুন্সীপাড়ায় প্রতাপ ও ললিত দাশ দুই ভাই ও তদীয় জ্ঞাতি হরিপ্রসন্ন দাশ ছিলেন। প্রতাপের মৃত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার তিন ছেলে সত্য, মাখন ও নলিনী। প্রতাপ বরিশালে পটুয়াখালিতে থাকিতেন। তাঁহার তিন ছেলে, বড় ছেলের নাম হেম। ললিত দাশের ছেলেদের নাম আমার মনে নাই। হরিপ্রসন্ন পার্শ্ববর্ত্তী কোন গ্রামের জমিদারের নায়েব ছিলেন। তিনি সুসাহিত্যিকও ছিলেন, শিশুপাঠ্য কয়েকটি কবিতা পুস্তক লেখেন। তাঁহার তিন ছেলে জ্যোতির্ম্ময়, সুখময় ও রসময়। তাঁহার ভাগ্নেয় প্রমথও তাঁহার সহিত থাকিত। মুন্সীপাড়ার কালীপদ সেনের ভগ্নী মধ্যপাড়ার ব্রহ্মময়ী ঠাকুরাণী তাঁহার ছেলে কালীপ্রসন্ন দাশকে নিয়া কালীপদ সেনের বাড়ীতেই থাকিতেন। কালীপ্রসন্নের চার ছেলে সুরেন্দ্র, নগেন্দ্র, মনসা ও মণীন্দ্র। অম্বিকা বিশারদের বাড়ীর বৈকুণ্ঠ দাশ সিলেটে থাকিতেন। তাঁহার চার ছেলে সুরেন্দ্র, নরেন্দ্র, শ্রীধর ও আর একটির নাম আমার মনে নাই। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র যতীন (ডাকনাম লোহা) ও রাজেন। যতীন খুব সজ্জন বলিয়া পরিচিত ছিল। পাটপাতা সেনের বাড়ীতে বিশ্বেশ্বর দাশ ও ভাই তারকনাথ থাকিতেন। তারকনাথের ছেলে পরিমল আমার সমবয়সী ছিল। বোধ হয় সে গ্রামের স্কুলে কিছু দিন শিক্ষকতা করে। ন'কড়ি কবিরাজের বাড়ীর কৃষ্ণকুমার দাশ ও তাঁহার ছেলে ব্রজেন্দ্র কলিকাতায় কাপড়ের ব্যবসা করিতেন। নৈর বাড়ীর ব্রজমোহন

দাশ ব্যবসায়ে ঘটক এবং গ্রামে তিনিই একমাত্র ঘটক ছিলেন, যদিও তখন এই ব্যবসা সমাজ হইতে প্রায় অবলুপ্ত হইয়াছিল। ছোট উত্তর পাড়ার বিশ্বম্ভর সেনের ভাগ্নেয় তারাপ্রসন্ন দাশ বহুদিন গ্রামে মামার বাড়ীতে বাস করেন। তাঁহার জামাতা মনোমোহন গ্রামের ডাকঘরে টেলিগ্রাফ মাষ্টার ছিলেন। তিনি গ্রামে খুবই জনপ্রিয় ছিলেন। বিদগাঁও-এর মহিম দাশের ছেলে যোগেশ দাশ জয়ব্রহ্মসারে গিয়া বাড়ী করেন। নিঃসন্তান অবস্থায় তাঁহার মৃত্যু হয়, তাঁহার স্ত্রী প্রমদা দেবী কাশী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম হাসপাতালে মুখ্য সেবিকা রূপে যোগদান করিয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত সেই কাজ করেন। সেবাশ্রমে তিনি বড়মা নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি ছিলেন গ্রামেরই দুহিতা, ললিত সেনের ভগ্নী। মজুমদারের বাড়ীতে দুই ভাই প্যারীমোহন দাশ ও কালীমোহন দাশ থাকিতেন। দুই ভাই-ই নিঃসন্তান। প্যারীমোহন সরকারী কাজ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া শেষ জীবন গ্রামেই ডাক্তারী করেন। কালীমোহন স্কুলের এ্যাসিসটেণ্ট ইনস্পেক্টর ছিলেন। সোনারঙ্গ স্কুল পুড়িয়া যাইবার পর স্কুলকে আবার গড়িবার জন্যে অপূর্ব সেনকে ইনি প্রভূত সাহায্য করেন। স্বনামধন্য চিন্ময়ী দেবী তাঁহারই সহধর্মিণী। তাঁহারই নামে চিন্ময়ী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

রায় উপাধিধারী বৈদ্যগণ ঃ

রায় উপাধিধারী তিনটি বৈদ্য পরিবার গ্রামে ছিলেন। বৈকুণ্ঠ রায়ের বাড়ী, কালীচরণ রায়ের বাড়ী ও দীনবন্ধু রায়ের বাড়ী। স্বনামধন্য বৈকুণ্ঠ রায় অপুত্রক অবস্থায় মারা যান। দৌহিত্র সত্য মজুমদার তাঁহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। বৈমাত্রেয় ভ্রাতা

শীতল রায় ও জ্ঞাতি হরিপ্রসন্ন ও মনোমোহন রায় চট্টগ্রামে থাকিতেন। শীতল রায়ের চার ছেলে ছিল। বড়টির নাম বোধ হয় কেশব। হরিপ্রসন্নের ভোলা নামে এক ছেলে ছিল। মনমোহন খুব নাটক করিতে পারিতেন। তাঁহার পুত্র অতুলানন্দ ও পরমানন্দ। অতুলানন্দ নাট্যশিল্পে বেশ নাম করিয়াছিলেন। কিন্তু অল্প বয়সেই মারা যান। মুন্সীপাড়ার কালীচরণ রায় রূপমুন্সীর কন্যাকে বিবাহ করিয়া সোনারঙ্গে আসিয়া বাস আরম্ভ করেন। তাঁহার ছয় পুত্র অম্বিকা, অন্নদা, চণ্ডীচরণ, রাধিকা, সারদা ও ক্ষীরোদ। অম্বিকার পুত্র ছিল যতীন এবং অন্নদার পুত্র উপেন। চণ্ডীচরণ, রাধিকা ও ক্ষীরোদ নিঃসন্তান ছিলেন। তিনি কিছুকাল গ্রামে বাস করিয়া গ্রামের সেবা করিয়া গিয়াছেন। যতীন রায় ভাল স্কলার ছিলেন। তিনি কিছুকাল গ্রামের বিদ্যালয়ে হেড মাষ্টার ছিলেন।

রায়ের বাড়ীর কবিরাজ দীনবন্ধু রায় স্বনামধন্য পুরুষ ছিলেন। তিনি গ্রামেই চিকিৎসার দ্বারা প্রভূত ধন ও মানের অধিকারী হন। তাঁহার অপর তিন ভ্রাতা রজনী, অনাথ ও বসন্ত বিদেশে থাকিতেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত ভ্রাতা গোবিন্দ প্রসাদের পুত্র জ্ঞান রায় ডাক বিভাগে চাকুরী করিতেন। তাঁহার চার পুত্র ছিল চারু, সুবোধ, সুশীল ও প্রবোধ। জ্যেষ্ঠ চারু ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া পরে আই-এ-এস শ্রেণীতে উন্নীত হইয়াছিলেন। তিনি নাট্যশিল্পে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার অভিনীত চরিত্রের সংলাপ আজও আমাদের কানে বাজে। বাংলা ও ইংরাজী দুই ভাষার নাটকের অভিনয়েই তিনি সমান দক্ষ ছিলেন। সুশীল ছিলেন ডাক্তার ও সুবোধ ছিলেন সাব ইনস্পেক্টর অব স্কুলস। তিনি অল্প বয়সেই মারা যান। প্রবোধ কলিকাতায় থাকেন। রজনী রায়ের

ছেলে বড় মনা কলিকাতায় থাকিতেন। গঙ্গাপ্রসাদ রায় ও তাঁহার ছেলে ডাক্তার যতীন রায় ঢাকায় থাকিতেন। অনাথ রায় ও তাঁহার ছেলে ধীরেন, বীরেন ও শৈলেন রংপুর জেলায় কোন স্থানে থাকিতেন। ধীরেন উকীল, বীরেন কবিরাজ ও শৈলেন ডাক্তার ছিলেন। বসন্ত রায়ের ছেলে ছোট মনা ও তাহার দুই ভাই কলিকাতায় থাকিত। দীনবন্ধু রায়ের তিন ছেলে অবিনাশ, রমেশ ও সুরেশ। তিন জনই কবিরাজ। ঐ বাড়ীতেই আরো দুই ভাই থাকিতেন প্রভাত রায় ও তরণী রায়। প্রভাত গ্রামেই কবিরাজী ও তরণী ঢাকায় ওকালতী করিতেন। প্রথম জীবনে তরণী গ্রামের স্কুলে হেম মাষ্টার ছিলেন। এই বংশ বৈকুণ্ঠ রায়ের বংশেরই এক শাখা।

গুপ্ত উপাধিধারী বৈদ্যগণ:

ইঁহারা পাঁচটি পরিবার ছিলেন। দক্ষিণ পাড়ায় জগৎ নারায়ণ গুপ্ত ও তাঁহার ছেলে অমৃত নারায়ণ থাকিতেন। জগৎ নারায়ণ কুচবিহার রাজদপ্তরে কাজ করিতেন ও অমৃত নারায়ণ এম-এ পাশ করিয়া কুচবিহারে গবর্ণমেণ্ট স্কুলে শিক্ষকতা করিতেন। জগৎ নারায়ণের ভাগ্নেয় মুলচরবাসী বিমলাচরণ সেনও মামার কাছে থাকিতেন। ইনি কুচবিহার কলেজের গ্রন্থাগারিক ছিলেন। গোবিন্দ গুপ্ত ও তাঁহার অপত্য কলিকাতায় থাকিতেন। গুপ্তের বাড়ীর রসিক গুপ্ত কাঁকিনা রাজ সরকারে কাজ করিতেন। ফণী গুপ্ত কাজ করিতেন ষ্টীমার কোম্পানীতে। ইনি প্রথমে গ্রামেই থাকিতেন পরে খুলনায় সেনহাটীতে যান। তাঁহার একমাত্র ছেলে ইন্দু গুপ্ত। ফণী গুপ্তের অনুজ শশী গুপ্ত দ্বারভাঙ্গার রাজসরকারে

মেডিকেল অফিসার ছিলেন। মুন্সীপাড়ার হেম গুপ্ত ঢাকা থাকিতেন। তাঁহার পুত্র ইঞ্জিনীয়ার অমূল্য গুপ্ত জামসেদপুর থাকিতেন। ইঞ্জিনীয়ার কালাচাঁদ ওরফে যোগেন গুপ্ত বোধ হয় হেম গুপ্তের ভ্রাতুষ্পুত্র, ইনি আসামের শিলং-এ থাকিতেন। পরবর্ত্তী জীবনে নিজের কর্মদক্ষতায় সমগ্র আসামে ইনি একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি হন।

হিঙ্গু-বংশীয় সেন :

এই বংশের তিনটি পরিবার গ্রামের বিভিন্ন অংশে বাস করিতেন। কবিরাজ বাড়ী, সেনের বাড়ী ও নৈর বাড়ী। কবিরাজ বাড়ীতে দীনবন্ধু সেন ও গিরীশ সেনের দুইটি পরিবার থাকিতেন। দীনবন্ধু সেন স্কুলের সাব-ইনস্পেক্টর ছিলেন। তাঁহার তিন পুত্র শ্যামলাল, কুঞ্জলাল ও মতিলাল। মতি বাল্যে মৃত। গিরীশ সেন চাঁদপুরে বিখ্যাত উকীল ছিলেন। গ্রামবাসীদের মধ্যে ইনি সর্ব-প্রথম বৃত্তিধারী ছাত্র। ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল হইতে দশ টাকা বৃত্তি পান। তাঁহার দুই পুত্র প্রফেসার সুরেশচন্দ্র সেন ও হেম সেন। দুই জনেই এম-এ, দুই জনেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। হেম সেনের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সুরেশ নোয়াখালি ফেণী কলেজে সংস্কৃতের প্রফেসার ছিলেন। দেশ বিভাগের পরেও ১৯৬৩ পর্য্যন্ত পূর্ব পাকিস্থানে থাকেন। সেনের বাড়ীতে পাঁচটি পরিবার ছিল। আনন্দবিহারীর পুত্র ক্ষীরোদ ও কুঞ্জলাল রংপুরে বসবাস করিতেন। কালীপ্রসন্ন থাকিতেন ভোলাতে। ইনি বিখ্যাত কালীমোহন দাশের ভগ্নী চিত্তরঞ্জন দাশের পিসীমাকে বিবাহ করেন। তাঁহার চার পুত্র রায় বাহাদুর ললিতমোহন, যতীন, নলিনী ও নীরেন। ললিত-

মোহনের কথা পূর্বেই বলিয়াছি। যতীন ও নলিনী (টুকু) আবগারী বিভাগে কাজ করিতেন। নীরেন স্কুলের হেড মাষ্টার রূপে বেশ নাম করেন। কালীপ্রসন্নর ভ্রাতা মনমোহন অপুত্রক অবস্থায় মারা যান। তারাচরণ সেন ও তৎপুত্র প্রফুল্ল ঢাকাতে থাকিতেন। প্রফুল্ল উকীল ছিলেন। শ্রীশ সেন ঢাকায় পেস্কার ছিলেন। তাঁহার তিন ছেলে হর্ষ, হেম ও প্রাণকুমার। শ্রীশের ভ্রাতা রামচন্দ্রের পাঁচ ছেলে অতুল, প্রতুল, অনুকূল (কানাই), গোকুল ও আর একজন। শ্রীশের কাকা চন্দ্রকান্ত বিদেশেই থাকিতেন। ইনি নিঃসন্তান। নৈর বাড়ীতে এই বংশের আটটি পরিবার ছিল। শ্রীশচন্দ্র, অক্ষয় ও তাঁহাদের মৃত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ছেলে ক্ষিতীশ। ক্ষিতীশ আমার সহিত স্কুলে পড়িত। কিন্তু ঐ বয়সেই তাহার খুব সংগঠনী শক্তি ছিল। দুঃখের বিষয় একটি ছেলে রাখিয়া সে অল্প বয়সেই মারা যায়। শ্রীশের চার ছেলে লেবা, দুর্গা, সন্তোষ ও আকাইনা। দুর্গা ভাল ফুটবল খেলিতে পারিত। অক্ষয় কাকিনা রাজ সরকারে কাজ করিতেন। তাঁহার সাত ছেলে নরেন, মণীন্দ্র, গুণেন্দ্র, উপেন, ভুপেন ও আরও দুইটি। ইহারা সবাই খুব ভাল ফুটবল খেলিতেন। নরেন রেঙ্গুনে ওভারসিয়ার ছিলেন, গুণেন ট্রপিকাল স্কুল অব মেডিসিনে ডাক্তার ছিলেন। রাজেশ্বর, নিবারণ ও সুরেন তিন ভাই। রাজেশ্বর হোমিওপ্যাথি ডাক্তারী করিতেন। প্রথম জীবনে গ্রামেই ছিলেন, পরে তিনি পুত্র কামাক্ষ্যা ও মনোরঞ্জনকে নিয়া ময়মনসিংহের জামালপুর যান এবং সেখানে প্রভূত অর্থ ও সম্মানের অধিকারী হন। সেখানেও ইনি হোমিওপ্যাথি ডাক্তারী করেন। নিবারণ চট্টগ্রাম রেলে কাজ করিতেন। সুরেন গ্রামেই থাকিতেন, তাঁহার পুত্র প্রমোদ পরে কলিকাতায় সোনারঙ্গ সম্মিলনীর বিশেষ

কর্মী হন। ষোড়শী সেন ও পুত্র দেবেনও জামালপুরে থাকিতেন। ষোড়শীর পাঁচজন ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন, বীরেন, ধীরেন, মাখন। বীরেন পশু চিকিৎসক ছিলেন। ধীরেন পাবলিক ওয়ার্কস বিভাগে চাকুরী করিতেন। রমাকান্ত পাড়ার এক প্রান্তে উলুবাড়ী বলিয়া একটি বাড়ী ছিল। ঐ বাড়ীতে কুমুদ সেন ও তাঁহার ভ্রাতা ছকু থাকিতেন। ছকু বাল্যে মৃত। ঐ বাড়ীরই অন্য গৃহস্থ অমৃতলাল সেন তাঁহার পুত্র মাখন ও রবিকে নিয়া কলিকাতায় থাকিতেন। ইহারাও রমাকান্তের সন্তান।

অন্যান্য সেন বংশীয়গণঃ

দক্ষিণ পাড়ার আনন্দ সেন মুলগাঁওবাসী ছিলেন। পদ্মার স্রোতে মুলগাঁও ভাসিয়া গেলে তিনি মামাবাড়ী সোনারঙ্গে আসিয়া বাস আরম্ভ করেন। তিনি কবিরাজ ছিলেন ও তাঁহার চার পুত্র ছিল। গোবিন্দ্র, দেবেন্দ্র, উপেন্দ্র ও জ্ঞানেন্দ্র। জ্ঞানেন্দ্র বা টোনা সব রকম খেলাতেই পারদর্শী ছিলেন। লস্কর পাড়ায় থাকিত আনন্দ সেন ও তাঁহার ভ্রাতা গিরীশ সেন। উহাদের আদি-নিবাস যশোলং গ্রামে ছিল। আনন্দ সেনের চার পুত্র নকুলেশ্বর, নৃপেন্দ্র, গোপাল ও ছোটকা। ছোটকার অল্প বয়সেই মৃত্যু হয়। নকুলের পুত্রেরা, হরিপ্রসাদ ও কালীপ্রসাদ কলিকাতাতেই থাকে। নৃপেন্দ্রের তিন পুত্র কামাক্ষ্যা, চৈতন্য ও গুরুপ্রসাদ। তাহার একমাত্র কন্যা ভবানী গ্রামেরই ডাঃ অবলাকান্ত সেনকে বিবাহ করিয়াছেন। গিরীশ সেনের তিন পুত্র উপেন সুরেন ও জীবন। গিরীশ সেন সিলেটের শ্রীমঙ্গলে থাকিতেন। উপেন রেঙ্গুনে উকিল ছিলেন। ডেপুটি-ম্যাজিষ্ট্রেট অক্ষয় কুমার সেন বনারী হইতে

আসিয়া সোনারং টঙ্গীবাড়ীতে বাড়ী করেন। তাহার সাত পুত্র, সকলেই কৃতবিদ্য। সুকুমার সেন আই, সি, এস ইলেকসন কমিশনার ছিলেন। অপর পুত্র ব্যারিষ্টার অশোক সেন। কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী ছিলেন। অমিয় সেন কলিকাতায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাক্তার ও শল্যবিদ্ এবং অন্যান্য পুত্রেরাও সবাই বিশিষ্ট পদে নিযুক্ত আছেন। অক্ষয় সেন বড় লস্কর বাড়ীর শ্রীনাথ সেনের কন্যাকে বিবাহ করেন। গুপ্তের বাড়ীর রাজকুমার সেন ও তাঁহার ভ্রাতারা বসন্ত ও হেম সকলেই ডাক বিভাগে চাকুরী করিতেন। রাজকুমার চট্টগ্রামে থাকিতেন। তাঁহার পুত্রদের মধ্যে অতুল ও প্রতুলকে আমরা জানিতাম। অতুল কোন স্কুলের হেড মাষ্টার ছিলেন। কিন্তু তাহার রাজনৈতিক মতবাদের জন্য বৃটিশ সরকার তাঁহাকে বহুদিন অন্তরীণ করিয়া রাখে। তিনি খুব ভাল ক্যারিকেচার করিতে পারিতেন। তাই তিনি "ভেচকী অতুল" নামে পরিচিত ছিলেন। ডাঃ নিবারণচন্দ্র সেন বালিগাঁও হইতে আসিয়া শ্বশুর বাড়ীতে সোনারঙ্গেই স্থায়ী ভাবে বসবাস আরম্ভ করেন। তিনি বাকী জীবন গ্রামে থাকিয়া অক্লান্তভাবে গ্রামের সেবা করিয়া গিয়াছেন। নৈর বাড়ীর জ্ঞান ও হারাণ সেন গ্রামে জ্ঞানা ও হারাইনা নামে পরিচিত ছিলেন। ইঁহাদের এক ভ্রাতা, বোধ হয় জ্ঞান, ডাক বিভাগে চাকুরী করিতেন। পাট পাতা সেনের বাড়ীর ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শশী সেন, পুত্র বগলা ও পৌত্র শৈলেন দেশে বড় একটা আসিতেন না।। এবং তাঁহার ভ্রাতা অম্বিকা তিন পুত্র নিয়া চট্টগ্রামে থাকিতেন। বগলা ন্যাশনাল স্কুল স্থাপন করিতে মাখন সেনকে প্রচুর অর্থ সাহায্য করেন।

গ্রামের ব্রাহ্মণ বংশ ঃ

গ্রামে প্রায় চল্লিশ ঘর ব্রাহ্মণ পরিবার বাস করিতেন। জয়ব্রহ্মসারে চক্রবর্ত্তী ও বন্দোপাধ্যায়রা ছিলেন। দুই ভ্রাতা নীলকান্ত চক্রবর্ত্তী ও কমলাকান্ত শিরোমণি ঐ বাড়ীতেই বাস করিতেন। নীলকান্তর পুত্র সন্তান ছিল না। আমাদের সময়ে তাহার দৌহিত্ররা চার ভাই বর্ত্তমান ছিলেন—দীনবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় (বিদ্যালংকার), মহিম, আনন্দ ও আদিত্য। দীনবন্ধু সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপন করেন। কমলাকান্ত শিরোমণির পুত্র প্রসন্ন শিরোমণিও বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিতেন। তাঁহার পুত্র যজ্ঞেশ্বর ও পৌত্র নগেন, হরেন্দ্র ও নৃপেন্দ্র। এই পৌত্ররা আমাদের সমবয়সী ছিলেন। বিদ্যালংকার মহাশয়ের ভ্রাতারা, আনন্দ ও আদিত্য টোল চালানর কার্য্যে সাহায্য করিতেন। আনন্দর দুই পুত্র প্রফুল্ল ও প্রবোধ। প্রফুল্ল গ্রামের এম-ই স্কুল হইতে বৃত্তি নিয়া পাশ করেন এবং পরে বোধ হয় ১৯০৩ খৃঃ খুব সুনামের সঙ্গে এনট্রান্স পাশ করেন। সংস্কৃতে প্রথম হইয়া চার বৎসরের জন্য বিদ্যাসাগর বৃত্তি পান। উত্তর কালে ইনি সাব-ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া অবসর গ্রহণ করেন। বর্ত্তমানে তাঁহার বয়স পঁচাশী। প্রবোধ ওভারসিয়ার ছিলেন। আদিত্যের ছেলেদের নাম মনে নাই। রাজেন্দ্র ও যোগেন্দ্র নামে বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের দুই ছেলে ছিল।

মুখুটিদের পাঁচটি পরিবার ছিল কিন্তু একত্রে থাকিতেন না। দক্ষিণ পাড়াতে থাকিতেন মোহনলাল, কুমুদিনী ও ললিত মুখুটি। মোহনলালের তিন ছেলে যোগেন, হারাণ ও অতীন। যোগেন ও হারাণ রেঙ্গুনে থাকিতেন, অতীন গ্রামে থাকিয়া যজমানী করিতেন। ললিত গ্রামেই থাকিতেন, কুমুদিনী চাঁদপুরে ওকালতি করিতেন।

পশ্চিম পাড়াতে রজনী মুখুটি বাস করিতেন। তাঁহার বাড়ীতে একটি দেউলবাড়ী আবিষ্কৃত হয়। তাঁহার তিন ছেলে গিরীণ, সুরেন্দ্র ও হেমেন্দ্র। হেমেন্দ্র বিখ্যাত বিপ্লবী ছিলেন, তাই তাঁহাকে রাজরোষে পড়িতে হয়। ইনি হেড মাষ্টার হিসাবেও প্রচুর নাম করেন। রাউলাট কমিটির রিপোর্টেও তাঁহার নাম উঠে। স্কুল পাড়াতে রাজেন্দ্র মুখুটি ও তাঁহার ভাই সুরেন্দ্র বাস করিতেন। ঐ পাড়াতেই হরিপ্রসন্ন বিশ্বাস ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয় তারাপ্রসন্ন ও উমাপ্রসন্ন বাস করিতেন। হরিপ্রসন্ন গ্রামেই থাকিতেন, তারা-প্রসন্ন ও উমাপ্রসন্ন মনে হয় মুন্সীগঞ্জে কোন আদালতে কাজ করিতেন। সরখেলরা ছিলেন পাঁচটি পরিবার। বাড়ুজ্জ্যে বাড়ীর পাশে আনন্দ সরখেল থাকিতেন। তাঁহার দুই ছেলে ভুবনমোহন ও মোহিনীমোহন। ভুবনমোহন পুলিস ইনস্পেক্টর ছিলেন। মোহিনী বিশ্ববিদ্যালয়ে খুবই মেধাবী ছাত্র ছিলেন। এম-এ পাশ করিয়া ইনি ভাগলপুর কলেজে অধ্যাপক হন। এই বাড়ীরই অন্য ঘরে ঈশান সরখেল ও তাঁহার ছেলে জ্যোৎস্না সরখেল থাকিতেন। মধ্য সরকার বাড়ীতে শরৎ, বিশ্বেশ্বর ও লালমোহন সরখেল বাস করিতেন। তাঁহাদের ছেলে যথাক্রমে অবনী, কেদার, গোপাল, মাখন ও গঙ্গা সরখেল এবং তাঁহার ভ্রাতাগণ।

গোঁসাই পাড়ার বৈষ্ণবপন্থী ব্রাহ্মণদের উপাধি ছিল বারড়ী কিন্তু সাধারণতঃ তাঁহারা গোঁসাই নামেই অভিহিত হইতেন। প্রায় পনেরোটি পরিবার এই পাড়াতে থাকিতেন। তাঁহাদের বেশীর ভাগই "গুরুগিরি" করিতেন, অর্থাৎ শিষ্য, যজমান প্রত্যেকেরই অনেক ছিল। লোকনাথ, গোপাল, হারাণ বেশ বর্দ্ধিষ্ণু ছিলেন। মথুর গোঁসাই-এর পাঁচ ছেলে হরলাল, কুঞ্জলাল, অমৃতলাল,

শ্যামলাল ও মণিলাল। পাশের বাড়ীতেই রামতনু গাঙ্গুলী তাঁহার ভাগ্নেয় দেবেন্দ্রকে নিয়া থাকিতেন। রামতনু গাঙ্গুলীর চার ছেলে আশু, কালীশ, লালমোহন ও আর একটি। মথুর গোঁসাই-এর ছেলেরা এবং রামতনু গাঙ্গুলীরা সবাই চাকুরী করিতেন। রাজ-মোহন গোঁসাই-এর চার পুত্র বিশ্বেশ্বর, অক্ষয়, চন্দ্রকুমার ও হরকুমার গোঁসাই। বিশ্বেশ্বর গোঁসাই-এর জ্যেষ্ঠপুত্র হরেন্দ্র (রাধা) বারড়ী সাব-ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হন। চন্দ্রকুমার (টেঁপা) গোঁসাইর বাজারে একটি নাম করা মণিহারী দোকান ছিল, সে খুব ভাল ঘুড়ি বানাইতে পারিত। গিরিশ গোঁসাইরা পাঁচ ভাই ছিলেন গিরিশ, কিশোরী, লালমোহন, ললিতমোহন ও মনোমোহন। কিশোরী টেলিগ্রাফ মাষ্টার ছিলেন। ললিত নাম করা পালোয়ান এবং বিপ্লবপন্থী ছিলেন বলিয়া রাজরোষে পড়েন। প্রথমে তাঁহার পিছনে চার জন পুলিশ মোতায়েন করা হয়। পরে তাঁহাকে অন্তরীণ করিয়া রাখা হয়। মনোমোহনের একটি পাঠশালা ছিল। তিনি পরমহংসদেবের ভক্ত ছিলেন। বাড়ীতে একটি রামকৃষ্ণ আশ্রম স্থাপন করেন। আদিত্য গোঁসাই-এর গিরিধারী ও হরেকৃষ্ণ নামে দুই পুত্র ছিল। শীতল গোঁসাইরা তিন ভাই ছিলেন। শীতল, যদু, "গুঁয়া"। শীতল খুব ভালো নাটক করিতেন এবং খুব সুপুরুষ ছিলেন। কালীকিশোর বারড়ীর দুই পুত্র। ছোট বিজয়, খুব ভালো ফুটবল খেলিতে পারিত, অবসর গ্রহণের পর কালী-কিশোর বারড়ী গ্রামে আসিয়া স্কুলে শিক্ষকতা আরম্ভ করেন। সেই সময়ে তাঁহাকে অপর আর তিন জন শিক্ষকের সহিত স্কুল চালাইবার ভার গ্রহণ করিতে হয়।

গোঁসাই পাড়াতে প্রস্তরের সুর্য্যমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল।

সমবেত ভাবে গোঁসাইরা ইঁহার নিত্য পূজার ভার নেন। বৈষ্ণবপন্থী ব্রাহ্মণেরা কি করিয়া সূর্য্য মুর্ত্তির পূজা করেন তাহা তখন প্রশ্ন করিবার প্রয়োজন বোধ করি নাই। এখন প্রশ্ন করি কিন্তু উত্তর পাই না।

বাড়ুজ্জ্যে বাড়ীতে থাকিতেন উমাচরণ ব্যানার্জ্জী। তিনি বর্দ্ধমানের রাজকীয় কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন। তিনিই গ্রামের প্রথম এম-এম। তাঁহার তিন পুত্র বামাচরণ, প্রফুল্ল ও দীনেশ। বামাচরণ প্রথম জীবনে ঢাকা কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন পরে একাউণ্টেণ্ড জেনারেল হইয়া অবসর গ্রহণ করেন। প্রফুল্ল ও দীনেশ একাউণ্টেণ্ড অফিসেই কাজ করিতেন। উমাচরণ ব্যানার্জ্জীর বাড়ীর পাশে আরো কয়েকটি ব্রাহ্মণ পরিবার থাকিতেন। কর্ত্তাদের নাম আমার মনে নাই কিন্তু তাঁহাদের পুত্রদের নাম মনে আছে ঃ রমেশ, রেবতী, সতীশ, যতীশ বা যোগেশ ব্যানার্জ্জী ও রাধিকা মুখার্জ্জী। তাহারা সবাই স্কুলে আমার সমপাঠী ছিল।

ইহা ছাড়া নাম করা যাইতে পারে নারায়ণ পূজার ব্রাহ্মণদের, কিন্তু এখন তাঁহাদের নাম মনে নাই।

নাপিত ঃ

নাপিতদের উপাধি ছিল শীল। তাহাদের মধ্যে বসন্ত শীল ও তাহার পুত্রগণ মধুসূদন ও মতিলাল; হারাণ শীল ও তাহার পুত্রগণ রমণী ও মুরারী এবং মনা শীল ও তাহার ভ্রাতাই প্রধান ছিল। তাহারা তাহাদের জাতীয় ব্যাবসাই করিতেন। শীলেরা আরও অনেকে ছিলেন কিন্তু তাহারা তখন তাহাদের জাতীয় ব্যাবসা ছাড়িয়া দিয়াছেন, যথা ডাঃ চন্দ্রকান্ত শীল, ঐ অঞ্চলে তিনি নাম করা

ডাক্তার ও শল্যবিদ্ ছিলেন। তাঁহার পুত্র দ্বারিক শীলও ডাক্তার ছিলেন। অপর দুই পুত্র রাধিকা ও সহদেব আমাদের সহিত স্কুলে পড়িত। পশ্চিম পাড়ার শীলেরাও জাতীয় ব্যবসা করিতেন না। মহেন্দ্র শীল নামে একজন আমার সহপাঠী ছিল, অন্য সবার নাম মনে নাই।

ভুঁইমালী :

ইহারা পাঁচ ঘর ছিল। তাহারা সবাই নিজ নিজ কাজ ছাড়িয়া দিয়াছিল। কালীচরণ ও শ্যামাচরণ কাঁসা পিতলের ব্যবসা করিত। নিশা ঢাক বাজাইত, রজনী বর্ষাকালে নৌকা বাহিত এবং অন্য সময়ে ঘরামীর কাজ করিত। শশী, গোবিন্দ, রবি ও কালীচরণ চার ভাই যে কোন শ্রমসাধ্য কাজই করিত, রবি মাঝে মাঝে ঢাক বাজাইত। কালীচরণ ঘুড়ি বানাইতেও খুব দক্ষ ছিল।

নমঃশূদ্র :

ইহাদের সংখ্যাও কম ছিল না। ইহাদের মধ্যে আনন্দ মণ্ডল বেশ অবস্থাপন্ন ও শিক্ষিত ছিল। তাহার ছোট ভাই রামানন্দ মণ্ডল আই এ পাশ করিয়া গ্রামের স্কুলে শিক্ষকতা করিত। হরিমোহন মণ্ডল ও তাহার পুত্র হারাণ নামকরা ছুতার মিস্ত্রী ছিল। তাহারা মিস্ত্রী নামেই পরিচিত ছিল। হরিমোহন নামে আরও একজন খুব দক্ষ ছুতার মিস্ত্রী অতি সুন্দর কীর্ত্তন গান করিত। ঐ তল্লাটে কীর্ত্তনীয়া এবং দক্ষ মিস্ত্রী হিসাবে সে বিশেষ বিখ্যাত ছিল।

কর্ম্মকার :

নাগের বাড়ীর পুকুরের পূর্ব পারে এক ঘর কর্ম্মকার বাস করিত। তাহাদের নাম ভুলিয়া গিয়াছি।

ঋষি ঃ

গ্রামের দক্ষিণ পূর্ব কোণে খালের ওপারে কয়েক ঘর বাদ্যকর বাস করিত, তাহারা ঋষি নামে পরিচিত ছিল। তাহাদের নামও ভুলিয়া গিয়াছি। তাহাদের বাসস্থানের নিকটে বড় খাল হইতে গ্রামে আসিবার প্রধান ছোট খালটি আরম্ভ হইয়াছে, তাই ইহার নাম ঋষি বাড়ীর খাল।

কুম্ভকার ঃ

গ্রামে তিন ঘর কুম্ভকার বাস করিত। প্যারা ও তাহার ভাইয়েরা বিশ্বম্ভর, প্রভাত, কৃষ্ণকুমার ও তাহার পুত্রগণ বিহারী, মরণ, জীবন, কানাই ও নিবারণ এবং মুকুন্দ ও তাহার পুত্রগণ লেদা, বোচা, পুণা। রাধিকা নামে মুকুন্দের এক ভ্রাতুষ্পুত্রের ছেলে তাহার সহিত থাকিত। ইহাদের উপাধি ছিল রুদ্র পাল। গ্রামের মধ্যস্থলে বাস করিত বলিয়া ইহারা গ্রামের সমস্ত কাজে সকলের সঙ্গে সমান ভাবে মিশিতে পারিত। তাহা ছাড়া গ্রামের সমস্ত পূজাতে প্রায়ই মৃন্ময় মুর্ত্তির প্রয়োজন হইত এবং মাটির হাঁড়ী কলসী ইত্যাদির জন্যও কুমার বাড়ীর সহিত সকলেরই যাতায়াত ছিল। তখনকার দিনে মাটির হাঁড়ী কলসী খুবই ব্যবহৃত হইত।

ধোপা ঃ

মনা ও মধু ধোপা গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে থাকিত। মহিম ধোপা ও তাহার পুত্রেরা হলধর ও জলধর মুন্সীপাড়ায় থাকিত। স্কুলপাড়াতে ও গ্রামের উত্তর প্রান্ত সীমায় আরও কয়েক ঘর ধোপা ছিল, তাহাদের নাম ভুলিয়া গিয়াছি।

কৈবর্ত্তদের কথা :

গ্রামে প্রায় পঞ্চাশ ষাট-ঘর মৎস্যজীবি কৈবর্ত্ত বাস করিত। নদী খাল বিল জলা প্রভৃতি হইতে মাছ ধরিয়া তাহা বিক্রয় করিয়াই ইহারা জীবিকা নির্বাহ করিত। দশ বারোটি পরিবার একত্র হইয়া একই জায়গাতে সমবেত ভাবে বাস করিত। তাহাদের বাড়ীঘর অতি নিখুঁত ভাবে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকিত। এমন কি উচ্চ শ্রেণীর পরিবারের বাড়ীঘরও এত পরিচ্ছন্ন দেখা যাইত না। গ্রামের পাঁচটি জায়গায় তাহারা বাস করিত। জয়ব্রহ্মসার, দক্ষিণ পাড়া, লস্কর পাড়া, রমাকান্ত পাড়া ও স্কুল পাড়া। দক্ষিণ পাড়াতে বারোটি পরিবার থাকিত—শোম্ভা (শম্ভু), মহিমা, চন্দ্রা, মহিন্দ্রা, শীতইলা, মনা, সীতা, রেবইতা, দধীশ্বেরা, বৈকুণ্ঠা, গীরা, প্রসইন্না, শরইতা, মাউদ্দা (সাধু) প্রভৃতি। জয়ব্রহ্মসারে গৌরচাঁদ, লস্কর পাড়ায় নন্দলাল, রমাকান্ত পাড়ায় দীনবন্ধু ও স্কুল পাড়ায় অক্ষয়—এই কয়জন বেশ নামকরা ছিল। এই কৈবর্ত্তরা সবাই একত্র হইয়া জয়ব্রহ্মসারে খুব জাঁকজমক সহকারে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে নীল উৎসব করিত। সোনারঙ্গের নীল উৎসব পার্শ্ববর্ত্তী সমস্ত গ্রামে খুব উদ্দীপনার সৃষ্টি করিত।

কায়েস্থদের কথা :

কায়েস্থদেরও বৃহৎ সমাজ ছিল। কিন্তু তাহারা সংঘবদ্ধ ভাবে বিশেষ কোনও অনুষ্ঠান করে নাই। কিংবা গ্রামীয় সামাজিক অনুষ্ঠানে কোনও বৃহৎ অংশ নিতেন না। যদিও সংখ্যায় তাঁহারা কম ছিলেন না। প্রায় ৫০।৬০টি পরিবার তো ছিলই, বেশীও হইতে পারে। তাহারা সারা গ্রামেই বিস্তৃত ছিলেন, বিশেষ করিয়া

গ্রামের পূর্ব দিকটা নিয়া, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই শিক্ষিত ও গুণবান্ ছিলেন। সকলের কথা আমার বিশদ ভাবে স্মরণ নাই। যদিও প্রায় সকলকেই আমি জানিতাম। গ্রামের পশ্চিম দিকে বিশ্বাসেরা থাকিতেন। তাঁহাদের মধ্যে একজনের নাম আমার মনে আছে, অবনীমোহন বিশ্বাস। স্কুলে তিনি আমার সহপাঠী ছিলেন। জয়ব্রহ্মসারের রজনী ধর আদালতে চাকুরী করিতেন। তাহার ভাই রাধিকা ধর ষ্টীমারে কেরানী ছিলেন। পোষ্ট অফিসের পিছনে সুধন্য দে-র ছেলেরা বেশ কৃতবিদ্য ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে দুজনের নাম আমার মনে আছে সুশীল ও বিলাস। বিলাস আমার সহপাঠি ছিলেন। উত্তর দিকে মহিম দে (?) বাস করিতেন। তাঁহার ছোট ছেলে অতুল আমার সমবয়সী ছিল। পূর্ব্ব দক্ষিণ দিকে অধ্যাপক হেম সেনদের পুকুরের উত্তর পারে নিবারণ দে তাহার দুইটি ছেলে নিয়ে বাস করিত। সেই বাড়ীতেই নিবারণের খুড়তাত ভাই রাজেন্দ্র, সুরেন্দ্র ও নদা বাস করিত। পুকুরের পূর্ব্ব পারে এবং ঐ অঞ্চলে অনেক কায়েস্থ বাস করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রধান বিশ্বেশ্বর দেকে আমার মনে আছে, ঐ বাড়ীর দক্ষিণের বাড়ীকে দোকানবাড়ী বলা হইত। দুই ভাই দীনবন্ধু পাল ও তাঁহার পুত্র হরেন্দ্র পাল এবং কনিষ্ঠ ভাই প্রসন্ন পাল দুখানি বাসনের দোকান চালাইতেন। তাঁহাদের বাড়ীর পুকুরের দক্ষিণ পারে প্রভাত দাস বাস করিতেন। উত্তরে মোহন সিং-এর বর্দ্ধিষ্ণু পরিবার বাস করিতেন। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র নিকুঞ্জ আমাদের খেলার সাথী ছিল। ইহারা প্রধানতঃ কোনও শহরে বাস করিত, মাঝে মাঝে গ্রামে আসিত। বন বাড়ীর উত্তর দিকে পাঁচকড়ি দে বাস করিতেন। ইহা ভিন্ন আরও অনেক বিশিষ্ট কায়স্থ ঐ অঞ্চলে

বাস করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে বিশিষ্ট কয়েক জনের নাম এখানে দেওয়া হইল। নাগের বাড়ীর বিশ্বেশ্বর নাগ, তিনি কি করিতেন মনে নাই। তবে তিনি গ্রামের সর্ব জাতীয় লোকের সহিত খুব মেলামেশা করিতেন। ঐ বাড়ীতেই রাজমোহন নাগ ও তাঁহার পুত্রদ্বয় রমেশ ও উমেশ ছিলেন। ইহারা ছাড়া ঐ বাড়ীতেই কৈলাস নাগ, ললিত নাগ ও তুই ভাই তারাপ্রসন্ন নাগ ও ভূবনেশ্বর নাগ গ্রামের একেবারে পূর্ব্ব প্রান্তে বাস করিতেন। তাঁহারা তুজনেই মুন্সীগঞ্জে মোক্তার ছিলেন। মৌঘা দীঘির পূর্ব পাড়ে উকীল দেবেন্দ্রনাথ সিংহ ছিলেন। কিন্তু কোথায় তিনি ওকালতী করিতেন মনে নাই। লালবিহারী দে ও তাঁহার ভাইপো অনুপ-বিহারী দে আসামে চা-বাগানে চাকুরী করিতেন। ছৈয়াল বাড়ীর মুকুন্দ দে-র পাঁচ ছেলে ছিল। ব্রহ্মানন্দ, সত্য, অনন্ত, মতিলাল, ও হীরালাল। আর এক ছৈয়াল বাড়ীতে নিবারণ ও তাহার ভাই পোষ্ট-মাষ্টার রমণী বাস করিতেন। হালদার বাড়ীর ছকরী হালদার ও গাড়ী বাড়ীতে আনন্দ গাড়ী ও তাঁহার ভাই পণ্ডিত হরিপ্রসন্ন গাড়ী বাস করিতেন। এই পাড়াতে আরও অনেক কায়েস্থ বাস করিতেন। তাঁহাদের সকলের নাম আমার মনে নাই। তবে আমারই সমবয়সী রসাকে আমার বেশ মনে পড়ে। সে গ্রামে থাকিত না। বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার চন্দ্রকুমার দেকে ঐ অঞ্চলে সকলেই জানিত। পরবর্ত্তী যুগের কায়স্থদের খবর আমি জানি না। তবে শুনিয়াছি হেম সেনদের পাড়ার যোগেশচন্দ্র দে ব্যবসায় বিশেষ উন্নতি করিয়াছেন। কায়স্থেরা মিলিত ভাবে তুই বৎসর গ্রামে মৌঘা দীঘির পাড়ে নীল উৎসব করিয়াছেন। সেই কালের আরও কয়েকজন কায়স্থের নাম পাওয়া গিয়াছে।

স্কুলের দপ্তরী মহেন্দ্র ও তাহার ভাই দেবেন্দ্র দে। নাগের বাড়ীর পুকুরের পূর্ব্ব পাড়ে ছৈয়াল বাড়ীতে কামিনী, প্রিয়কান্ত ও নীলকান্ত, হরকুমার ও কালীকুমার দে থাকিতেন। আমার ছোট বয়সে গ্রামে তিনটি শ্রাদ্ধ বিশেষ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইতে দেখিয়াছিলাম। একটি রত্নেশ্বর সেনের মাতার আর একটি আনন্দ ডেপুটীর। তৃতীয়টি মৌঘা দীঘির দক্ষিণ পাড়ের কায়স্থ মোহন সিংহের। মোহন সিংহের ৫টি কৃতবিদ্য পুত্র ছিল। আজ এতদিন পরে তাহাদের নাম আমি ভুলিয়া গিয়াছি। সকলেই বিদেশে থাকিত। ছোটটির নাম ছিল নিকুঞ্জ। সে মাঝে মাঝে গ্রামে আসিত। ঐ দীঘির পূর্ব্ব পাড়ে অমৃত পিওন, ছোটকা ও হরিপদ বাস করিত।

এই সব ভিন্ন সুরেশবাবু আমাকে লিখিয়াছেন যে সোনারঙ্গের অন্তর্গত কুলীন হাওলা নামে একটা পাড়া আছে। ঐ পাড়াতে কেবল বারুজীবিরা বাস করিতেন। বারুজীবিদের উপাধি ছিল সেন। তাহাদের কাহারও নাম আমার মনে নাই।

আমি এখানে বৈদ্য ও ব্রাহ্মণদের যতটা সম্ভব পূর্ণ তালিকা দিয়াছি। কিন্তু কৈবর্ত্ত, কায়স্থ প্রভৃতির পূর্ণ তালিকা দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। তবে সব বর্ণের মধ্যে যাঁহারা বিশিষ্ট ছিলেন তাঁহাদের সকলের নামই প্রায়ই লিখিয়াছি। আর একটি কথা—আমার এই তালিকাতে শুধু তাঁহাদের নামই লিখিত আছে যাঁহারা ১৯২৫ সন পর্য্যন্ত একটি পরিবারের কর্ত্তারূপে বর্ত্তমান ছিলেন। সেই সময়ে তাঁহাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠার কথাও লিখিয়াছি, অল্প কয়েক জনের বেলায় তাঁহাদের পরবর্ত্তী জীবনের

কথাও কিছু লিখিতে পারিয়াছি। তাহার পর ১৯৪৭ সনে দেশ বিভাগ পর্য্যন্ত এবং তাহার পর এই ১৯৭০ সন পর্য্যন্ত কত কাল চলিয়া গিয়াছে। দেশে, সমাজে, পারিবারিক জীবনে কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহার কথা আমি ভাল ভাবে জানি না, তাই লিখিতেও পারি নাই। তবে আশা করি আর কেহ হয়তো এ কাজটা সম্পূর্ণ করিবেন। অন্ততঃ ১৯২৫ সন হইতে ১৯৪৭ সন পর্য্যন্ত সময়ের ইতিহাস লেখার কাজটুকু। উপস্থিত সোনারঙ্গ সম্মিলনীর যাঁহারা সদস্য তাঁহাদের মধ্যে এমন লোক নিশ্চয়ই আছেন, যাঁহারা এই বিবরণ অনায়াসে সংগ্রহ করিয়া লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেন। পরিশেষে আমার বক্তব্য ঃ আমার এই বিবরণী ক্রটীমুক্ত বা নিখুঁত নহে। কিছু দোষ ক্রটি রহিয়া গিয়াছে এবং থাকাও খুব সম্ভব। কারণ বর্ণিত কাল হইতে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে এবং গ্রাম হইতে দেড় হাজার মাইল দূরে এবং ভিন্ন রাষ্ট্রে বর্ত্তমানে আমি বাস করি।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

আবোল-তাবোল ঃ

মনে অনেক কথাই ভীড় করিয়া আসে, যাহাদের কোন নির্দ্দিষ্ট রূপ নাই। তবু রূপহীন হইয়াও ইহারা অপরূপ। বর্ণহীন হইয়াও ইহারা মনের প্রাঙ্গনে শ্বেত চন্দনের আলপনা কাটে। এই অধ্যায়ে এই সব কথাই লিখিব। ধারাবাহিক ভাবে ইহাদের নির্দ্দিষ্ট কোন পংক্তিতে বসান যায় না। তাই এই অধ্যায়ের নাম আবোল-তাবোল।

বিধবাদের প্রতি ব্যবহার :

গ্রামে বিধবাদের উপর অন্যায় অবিচার অন্যান্য গ্রামে যেরূপ হইত, এখানেও তাহার ব্যতিক্রম ছিল না। সর্বাপেক্ষা দুঃখের বিষয় আমাদের গ্রাম বিদ্যাশিক্ষায় শীর্ষ স্থানীয় হওয়া সত্ত্বেও বিধবাদের উপর এরূপ ব্যবহার যে অত্যাচারের সামিল, গ্রাম-দেবতারা তাহা বুঝিতে চাহিতেন না। পরবর্ত্তী কালেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। একবেলা অন্নাহার সম্বন্ধে তো কথাই নাই। ইহাকে স্বতঃসিদ্ধ বলিয়াই লোকে ধরিয়া লইয়াছিল। অম্বুবাচীর সময় বিধবাদের জন্য বাহাত্তর ঘণ্টা, কখনও বা কিছু বেশী ঘণ্টা পর্য্যন্ত অগ্নিপক্ক আহার নিষিদ্ধ ছিল। ৺দুর্গাপূজার সময় ইঁহারা তিন দিন অন্নগ্রহণ করিতেন না। বিবাহ ইত্যাদি উৎসব ও শুভকর্মে ইঁহারা যোগ দিতে পারিতেন না। বিবাহ বাড়ীতে বিধবাদের অন্ন গ্রহণ বিশেষ দূষণীয় বলিয়া পরিগণিত হইত। দুঃখের বিষয় বিধবাদের প্রতি প্রযোজ্য এই সব প্রথা আজও কিছু কিছু আছে, এমন কি শহরেও।

বিবাহ ব্যাপারে :

আমাদের বাল্যকালে দেখিয়াছি, বিবাহ যদিও শুভকর্ম বলিয়া গন্য হইত, কিন্তু ইহা সম্পন্ন করিতে নানা প্রকার বিভ্রাটও উপস্থিত করা হইত।

একটি প্রথা ছিল, যাহার নাম "কেছলা ছোঁয়ানো"। ইহার অর্থ তখনও বুঝি নাই, আজও বুঝি না। একটা কুলাতে কিছু ফুল এবং আরো কত কি রাখিয়া কন্যা-গৃহে প্রবেশোদ্যত বরের পাল্কীর উপর কন্যাপক্ষ ছুঁড়িয়া দিত। বরপক্ষ ইহা খুব অপমানজনক

মনে করিত এবং ফলে ঝগড়াও হইয়া যাইত। সেই সব দিনে এই সব অনুষ্ঠানে লোকেরা, বিশেষতঃ বরপক্ষীয়েরা কিছু কারণ-বারি পান করিয়া আসিতেন। আর সেই অবস্থায় এই "কেছলা ছোঁয়ানো"র ঝগড়া রীতিমত দাঙ্গাতে পরিণত হইত। আমাদের পাড়ায় আমি এইরূপ একটি দাঙ্গা দেখিয়াছি। দাঙ্গার ফলে সেই রাত্রে বিবাহ পণ্ড হইয়া যায়। পরে শুভবুদ্ধি উদিত হইলে এক সপ্তাহ পরে সেই বিবাহ সম্পন্ন হয়।

আরো একটা কারণে সাধারণতঃ বিবাহ-বিভ্রাট ঘটিত, তাহা হইল বিবাহ সভায় উপস্থিত উভয় পক্ষের কুলীনদের নিয়া। সভায় একখানা থালা রাখা হইত এবং সভাস্থ কুলীনগণের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ তাহা লইয়া বিচার হইত এবং এই বিচারের ফল কেহই মানিয়া লইতেন না। সবাই বলিতেন আমি শ্রেষ্ঠ। এই মতদ্বৈধতার ফলে অনেক সময় বহিরাগত বরযাত্রীদল রাগ করিয়া খাওয়া-দাওয়াও করিতেন না।

বর্ষাকালে নৌকা যোগে স্কুলে যাওয়া ঃ

আমাদের বাড়ী হইতে বিদ্যালয় প্রায় এক মাইল দূরে ছিল। বর্ষাকালে নৌকায় করিয়া অনেক খাল বিল নালা পার হইয়া যাইতে হইত। এই যাওয়া-আসা সাধারণতঃ ঘটনাশূন্যই হইত, তবে মাঝে মাঝে ইহার ব্যতিক্রম হইত সাপের আক্রমণে। বর্ষায় সাপের গর্ত্তগুলি জলে ভরিয়া গেলে সাপেরা গাছে উঠিয়াই ঋতুটা কাটাইয়া দিত। আর গাছগুলিও বর্ষার নতুন জলে যেন নব যৌবন লাভ করিত। নালা বা খালের ধারের গাছগুলি অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়া ডালপালা দিয়া রাস্তা ঘাট একেবারে জুড়িয়া ফেলিত। নৌকা

এই সব পথে চলাচল করিতে করিতে কখনও বা এই সব ডাল-পালাতে ধাক্কা খাইত এবং সেই ডালে কোন সাপ থাকিলে তাহা হয়তো নৌকায় আসিয়া পড়িত এবং তাহার পর নৌকায় লঙ্কাকাণ্ড সহজেই অনুমেয়। আবার কখনও পুকুর বা খাল দিয়া যাইবার সময় সাপ আপনা হইতেই বিনা কারণে আক্রমণ করিত।

নৌকাতে স্কুলে যাওয়ার আনন্দও ছিল অনেক। স্কুলের সামনে একটা মাঠ ছিল সেখানে পাট চাষ হইত। পাট কাটা হইয়া গেলে পরিষ্কার বাধাহীন বিস্তৃত একটি জলাশয় টল্‌টল্‌ করিত। তখন ঐ মাঠে দুইটি নৌকা আসিয়া পড়িলেই আগে মাঠ পার হইবার তীব্র প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইয়া যাইত। ইহাকে আমরা বলিতাম "নৌকা বাইচ"। এই খেলা আমাদের খুবই প্রিয় ছিল। কিন্তু পরে কচুরীপানা আসিয়া বাংলা দেশের জলাশয়, নদী নালা প্রভৃতি ভর্ত্তি করিয়া ফেলিলে এই খেলা বন্ধ হইয়া যায়।

গ্রামের স্বায়ত্তশাসন :

ছেলেবেলায় শুনিতাম বৈকুণ্ঠ ভূঁইয়া গ্রাম-পঞ্চায়েতের সভাপতি ছিলেন। কিন্তু সভাপতি হিসাবে তাঁহার যে কি কাজ ছিল সেই সম্বন্ধে কোন ধারণা ছিল না। তাঁহার অধীনে একজন দফাদার ও কয়েকজন চৌকিদার ছিল। চৌকিদাররা রাত্রে গ্রাম পাহারা দিত, চুরি, ডাকাতি বা কাহারও মৃত্যু হইলে মুন্সীগঞ্জ থানায় রিপোর্ট করিয়া আসিত। পরে দেখিয়াছি মুন্সীগঞ্জ মহাকুমাতে আরও কয়েকটি থানা হয়, ইহাদের মধ্যে সোনারঙ্গের নিকট টঙ্গীবাড়ী থানা অন্যতম। তাহার পর দেখি, কয়েকটি গ্রাম নিয়া ইউনিয়ন বোর্ড গঠিত হয়। আমাদের বোর্ডের নাম ছিল

টঙ্গীবাড়ী সোনারঙ্গ ইউনিয়ন বোর্ড। ইহাতে সোনারঙ্গ ও টঙ্গীবাড়ী ব্যতীত আরো কয়েকটি গ্রাম সংযুক্ত ছিল। প্রতি গ্রাম হইতে দুই তিনজন সদস্য লইয়া বোর্ড গঠিত হইত এবং ইহাদের মধ্যেই একজন হইতেন সভাপতি এবং একজন সেক্রেটারী। ইঁহারাই পঞ্চায়েত সভাপতির কার্য্যভার গ্রহণ করিতেন। প্রথমে অপূর্ব্ব সেন ইহার সভাপতি ছিলেন এবং তাহার পর শ্রীসুরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত এই পদে অধিষ্ঠিত হন। গভর্ণমেণ্টের নিয়মানুসারে এই ইউনিয়ন বোর্ড প্রথার প্রচলন হয়।

॥ চরিত্র-চিত্রণ ॥

নিতাই সাধু ও আশু সেন :

প্রথমেই বলা যাউক নৈর বাড়ীর ভারত সেনের জ্যেষ্ঠ পুত্র চিন্তাহরণ সেন ওরফে নিতাই সাধুর কথা। পিতা বরিশালে দৌলত খাঁ মহকুমায় উকিল ছিলেন। দুই ছেলে নিতাই ও আশু এবং কিছু টাকা রাখিয়া তিনি দেহরক্ষা করেন। আমরা ১৯১৩ সনে নিতাইকে প্রথম দেখি যখন তিনি স্ত্রী ও পুত্রকে নিয়া দেশে আসেন। বয়স পঁচিশ বৎসর কিন্তু পরণে সাধুবেশ—গেরুয়া বসন, বড় বড় চুল, কপালে মস্তবড় সিন্দুরের ফোঁটা, হাতে শাঁখা এবং যতটা মনে পড়ে বোধ হয় দাড়ি ছিল না। শুনিলাম তাঁহার এম-এ পাশ এক ভাই আছে নাম আশুতোষ। মস্তবড় বিদ্বান, বি-এ পরীক্ষাতে সংস্কৃতে প্রথম হইয়া "ঈশান বৃত্তি" পাইয়াছে এবং সম্প্রতি সে চাকুরী করে কিম্বা চাকুরীর সন্ধানে আছে। ইনি সাধু, উপার্জন করেন না বা করিবার দরকার নাই। গ্রামে আসিয়াই তিনি ছেলেদের দলের পাণ্ডা হইয়া উঠিলেন। তাহাদের অবসর বিনোদনের প্রধান কেন্দ্রই হইল নিতাই সাধুর বাড়ী এবং কিছু

দিনের মধ্যেই তিনি ছেলেদের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেন। আমি তখন ছেলেদের মধ্যে একটু বয়স্কদের দলে পড়িয়াছি। বড়রাও নিতাই সাধুর এই প্রভাবকে অসন্তুষ্ট দৃষ্টিতে দেখিলেন না। নিতাই সাধুর এই সান্নিধ্য কিন্তু ছেলেদের উপর ভাল প্রতিক্রিয়াই করিয়াছিল। আমার মনে হয় ছেলেদের নৈতিক চরিত্র এই সময়ে অনেক উন্নত হইয়া উঠিয়াছিল। পরে তাঁহার ভাই আশুতোষও গ্রামে আসেন ও গ্রামের বিদ্যালয়ে শিক্ষকরূপে বছর দুই কাটাইয়া যান। তিনিও অতি উচ্চ আদর্শের লোক ছিলেন। গ্রামবাসীরা তাঁহাকে খুবই ভালবাসিত। পরে তিনি পাটনা কলেজে প্রফেসর হইয়া চলিয়া যান এবং সেখানেই অকালে তাঁহার দেহান্ত হয়। নিতাইও ৪৪-এর মন্বন্তরে দেহত্যাগ করেন। এই দুই ভাইয়ের মত উচ্চ আদর্শের লোক গ্রামে খুবই কম ছিলেন।

ডাংরা :

ডাংরা ছিল গুণীন, ইংরাজীতে যাকে বলা হয় witch doctor। মজুমদার বাড়ীর পুকুরের পূর্ব পাড়ে সে বোধ হয় একাই থাকিত। তাহার স্ত্রী পুত্রাদি কিছু ছিল কি না আজ আর আমার মনে নাই। ডাংরা ভিন্ন তাহার অন্য কোন পোষাকী নাম ছিল কি না তাহাও আজ মনে নাই। সে নাকি নানা মন্ত্রতন্ত্র জানিত এবং ঝাড়ফুক ইত্যাদি করিয়া নানা ব্যাধিও সারাইয়া দিত। সে এই সব সত্যই করিতে পারিত কি না তাহার নিদর্শন আমরা পাই নাই। কিন্তু খুব বিষাক্ত সাপ হইলেও সে যে সাপ ধরিতে খুব দক্ষ ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ডাংরা বোধ হয় সাপুড়েই ছিল, যাহাকে বলা হয় সাপ-বেদে।

অমর মাঝি :

মানুষটি রোগা লম্বা এবং গৌরবর্ণ। ফেরী করিয়া সে সব্জী বিক্রয় করিত। গ্রামে সেই-ই একমাত্র সব্জীওয়ালা ছিল, কুমড়া, চালকুমড়া প্রভৃতি কাটিয়া বিক্রয় করিত এবং এইজন্য গ্রামে সে বেশ বিখ্যাত ব্যক্তি ছিল। নীলপূজার সময় সে সং সাজিয়া গ্রাম প্রদক্ষিণ করিত এবং তাহাতেও বেশ কিছু রোজগার করিত।

মহেন্দ্র দপ্তরী :

স্কুলে প্রায় চল্লিশ বৎসর ধরিয়া ইনি দপ্তরী ছিলেন। সহানুভূতিপূর্ণ এবং সরল স্বভাব এই মানুষটিকে গ্রামের সকলেই ভালবাসিত।

"পাগলা হরিবোল" :

আউটসাহী হইতে এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ প্রত্যহ একবার করিয়া গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়া যাইতেন এবং ক্ষণে ক্ষণে "পাগলা হরিবোল" ধ্বনি উচ্চারণ করিতেন। আমরা শিশুকালে দূর হইতে তাঁহার এই ধ্বনি শুনিলেই তাঁহাকে গিয়া অভ্যর্থনা করিয়া নিয়া আসিতাম। তাঁহার আসল নাম আজ ভুলিয়া গিয়াছি।

আনন্দ ব্যানার্জী :

আউটসাহী গ্রামের আর একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণও প্রায়ই গ্রামে আসিতেন। তাঁহার নাম ছিল আনন্দ ব্যানার্জী। দীর্ঘদেহী, গৌর-বর্ণ, সৌম্যদর্শন এই ব্রাহ্মণকে দেখিলেই মনে ভক্তি শ্রদ্ধার উদ্রেক হইত। এই বৃদ্ধও আমাদের বিশেষ ভালবাসার পাত্র ছিলেন।

অশ্বিনী চক্রবর্ত্তী :

ইনি রোষ বংশের আদি পুরোহিত শ্রীমহানন্দ চক্রবর্ত্তীর সাক্ষাৎ বংশধর ছিলেন। পাশের পুরাপাড়া গ্রামে তাঁহার বাড়ী ছিল। আমাদের গ্রামের অনেকেই তাঁহার যজমান ছিলেন। ইনি যজমানী ছাড়াও নানা রকম দালালীও করিতেন। আমাদের সময়ে গ্রামে যতগুলি কাঠের পোল নির্মিত হইয়াছিল, প্রতিটি ইনিই সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে নির্মাণ করাইয়াছিলেন। ইহা ছাড়াও তাঁহার চাল ডাল প্রভৃতি জিনিসের একটি দোকান ছিল। তিনি অনেক গরীব গৃহস্থকে দোকানের সওদা ধারে বিক্রয় করিয়া তাহাদের প্রভূত উপকার করিতেন। প্রতি বৎসর তীর্থযাত্রীর দল লইয়া লাঙ্গলবন্ধে ব্রহ্মপুত্র স্নানে যাওয়া তাঁহার একটি অবশ্য কর্ত্তব্য কাজ ছিল।

ক্ষিতীশ :

ক্ষিতীশ ছিল নৈর বাড়ীর অক্ষয় সেনের ভ্রাতুষ্পুত্র শরৎ সেনের পুত্র। সে ছিল আমার সমবয়স্ক, স্কুলের সহপাঠী বন্ধু। যখনকার কথা বলিতেছি তখন তাহার বয়স চৌদ্দ পনেরোর বেশী নয়। কিন্তু তখন হইতেই তাহার সংগঠন গড়িবার এবং নেতৃত্ব করিবার ক্ষমতা বেশ ভাল ভাবেই জন্মিয়াছিল। গ্রামের কিশোর ও যুবকের দল সর্ব্বদাই তাহার বাড়ীতে একত্রিত হইত। ছেলেদের খেলাধূলার ব্যবস্থাও সেই করিত। দুঃখের বিষয় একটি মাত্র পুত্র সন্তান রাখিয়া সে অতি অল্প বয়সেই মারা যায়।

টোনা :

পোষাকী নাম জ্ঞানেন্দ্রনাথ সেন, আমাদের বাড়ীর আনন্দ

সেনের কনিষ্ঠ পুত্র। সে ছিল একটু বেপরোয়া ভয়হীন প্রকৃতির ছেলে, সমস্ত রকম খেলাতেই পারদর্শী। কোন কিছুতেই সে পশ্চাৎপদ হইত না। তাহার কথা মনে হইলেই আমার শরৎচন্দ্রের ইন্দ্রনাথের কথা মনে হয়। ছেলেবেলায় সে এই রকমই ছিল। পরে তাহার সহিত আর সাক্ষাৎ হয় নাই।

শৈলেন সেন (কাইয়াবাবু):

আমার দাদা। চিররুগ্ন এই রোগা মানুষটির বিশেষ কোন গুণ ছিল না, তবু কি জানি কেন, গ্রামের ছোট বড় যুবক বৃদ্ধ সকলেই আসিয়া তাঁহার নিকট ভীড় করিত। গ্রামের ছেলেদের অন্যতম আড্ডাই ছিল আমাদের বাড়ী। ছেলেবেলায় এই দেখিয়াছি। পরে বি-এ পাশ করিয়া যখন গ্রামে শিক্ষকতা করিতেন তখনও এই রকম ভাবে সকলেই তাঁহার কাছে আসিত। নিজে তাঁহাকে কোন কাজ করিতে হইত না, অন্যে তাঁহার কাজ করিয়া দিত। তাহার পর দিল্লীতেও দেখিয়াছি একই ব্যাপার। দিল্লীর সমস্ত বাঙ্গালী সমাজ তাঁহাকে জানিত এবং সকলেই নানা ব্যাপারে তাঁহার কাছে আসিত। আজও তিনি জীবিত, অবিবাহিত এবং আমার কাছেই আছেন।

দাসী-প্রথা:

বিদেশে যাঁহারা থাকিতেন, একটু অবস্থাপন্ন হইলেই বাড়ীতে তাঁহারা দাসী রাখিতেন। এই দাসী একটু পুরাতন হইলেই বাড়ীতে প্রায় গৃহিণীর আসন দখল করিতেন। গৃহস্থের সন্তানেরা তাহাকে প্রায় মায়ের মত সম্মান করিত। আমাদের পূর্ববর্ত্তী যুগেও

ইহার বেশ প্রচলন ছিল। আমরা এই সব দাসীকে তাহাদের বৃদ্ধাবস্থায় দেখিয়াছি। বড় লস্কর বাড়ীতে একজন ছিল। তাহাকে সকলে ধাই-মা বলিয়া ডাকিত। নাতবৌরা তাহাকে দিদিশাশুড়ীর পূর্ণ সম্মান দিত এবং অনুরূপ সেবা যত্নও করিত। নীলকমল বিশারদের বাড়ীতে ছিল "ভগী", মুন্সীবাড়ীতে ছিল "ময়না" এবং মুন্সেফ বাড়ীতে ছিল "জগার মা" বুড়ী।

কুশপুত্তল :

এই জগার মা বুড়ীকে নিয়াই এই গল্প। সে বৃদ্ধা হইয়া যাইবার পর মুন্সেফ বাড়ীতে আর থাকিত না। স্কুলে যাইবার পথে খালের পাড়ে ছোট এক টুকরা মাঠওয়ালা বাড়ীতে সে জগার বৌকে নিয়া থাকিত। তাহাকে আমরা জগার মা বুড়ী বলিয়াই জানিতাম, কিন্তু আমরা জগাকে কখনো দেখি নাই। সে বিবাহ করিবার পর, কি জানি কি কারণে বৃদ্ধা মাতা ও বধুকে ফেলিয়া গৃহত্যাগ করে। সে আর ফেরে নাই। তাহার পর ১২ বৎসর পরে, তৎকালীন সামাজিক নিয়মানুসারে তাহাকে মৃত বলিয়া গণ্য করিয়া তাহার কুশপুত্তল নির্ম্মাণ করিয়া শ্মশান কার্য্যাদি এবং শ্রাদ্ধ প্রভৃতি অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়। তখনকার দিনে কেহ গৃহত্যাগ করিয়া ১২ বৎসর পর্য্যন্ত না ফিরিলে তাহাকে মৃত বলিয়া গণ্য করিতে হইত এবং তাহার কুশপুত্তলিকা নির্ম্মাণ করিয়া মৃত্যু-সম্পর্কিত তাবৎ অনুষ্ঠান পালন করিতে হইত। নানা দাহ্যপদার্থ নির্মিত এই কুশপুত্তলিকাটি পোড়ান হইলে লোকে বলিত 'অমুকের কুশপুত্তল হইল'। মৃতের স্ত্রীকে তখন বিধবা বলিয়া গণ্য করা হইত। জগার বৌকে পরে আমরা বিধবা বেশেই দেখিয়াছি।

এইরূপ আরো একটি ঘটনাও আমরা গ্রামে দেখিয়াছি। কুমার বাড়ীর রাধিকা রুদ্র পালের পিতা, স্ত্রী পুত্র ও বৃদ্ধা মাতাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। অবশ্য তাহারও কুশপুত্তল হইয়াছিল কিনা জানি না, কারণ আমরা তখন গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছি। অবশ্য দিনকালও তখন অনেক বদল হইয়া গিয়াছে।

নৈতিক বল ঃ

তাহার পর একদিন সন্ধ্যায় জগার মা বুড়ী মরিয়া বাঁচিল। কিন্তু বিপদে পড়িল জগার বৌ। পাড়ার কায়স্থ সমাজ মৃতের শেষকৃত্য সম্পন্ন করিতে রাজী হইল না, কারণ জগার মা বুড়ী দাসীবৃত্তি করিত বলিয়া সমাজ তাহাকে গ্রহণ করে নাই। আর গ্রাম্য সমাজের রীতিই ছিল এই যে সমাজরীতি মানিতে হইবে মৃত্যু সময়ে। মৃত যে সমাজভুক্ত, শেষকৃত্য করিবার অধিকারী শুধু সেই সমাজ, অন্যান্য সমাজ কেহ অগ্রসর হইবে না। কিন্তু এই সব বর্ণীয় সমাজ ব্যতীত গ্রামে আরও একটা সমাজ ছিল তাহার নাম গ্রাম্য সমাজ। এই সমাজের ডাকে আমরা সকলে আগাইয়া গেলাম। নিতাই সাধু ও তাহার দলের আমি, হরা (ডাঃ হরেন সেন, হর্ষ ডাক্তারের ভাই), টোনা, দুর্গা, আউশা (ললিত কবিরাজের ছেলে আশুতোষ) আর মুন্সেফ বাড়ীর যদু তো ছিলই কারণ বুড়ী তাদেরই দাসী এবং সমাজের নেতৃস্থানীয় দীনবন্ধু রায়, অপূর্ব্ব সেন, মহেন্দ্র সরকার প্রভৃতি সকলেই আসেন। মৃতদেহ শ্মশানে আনা হইল কিন্তু মুশকিল হইল কাঠ চেরা নিয়া। আম গাছ কাটিয়া চলাচেরা করাই কঠিন ব্যাপার। আমরা তখন ছেলে মানুষ। নিতাই সাধু ভিন্ন সকলেরই বয়স ১৫ হইতে ১৭-র মধ্যে। সর্ব্বোপরি চলাচেরা

কাহারও অভ্যাস নাই। গাছ কাটা হইল এবং গাছটিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া চলাচেরা আরম্ভ হইল। কিন্তু আরম্ভ হইতেই সকলের হাতে ফোস্কা পড়িয়া গেল, কারণ কুঠার দিয়া কাজ করিতে অভ্যাস দরকার। এমন সময় সমাজের আদেশ লঙ্ঘন করিয়া, হয়তো বা বাবুদের ডাকেই ড্যাংরা আসিয়া মুশকিল আসান করিয়া দিল। চলাচেরা হইল এবং মৃতদেহও দাহন করা হইল।

ইহারই কিছুদিন পরে, ঠিক কতদিন পরে মনে নাই, কিছুদিন আগেও হইতে পারে মুন্সীবাড়ীর সতীশ সেনের মেয়ে সন্তান প্রসবের জন্য পিত্রালয়ে আসেন এবং সঙ্গে আসে তাহার শ্বশুরালয় মুলচরের নীচু জাতীয়া একটি মহিলা, প্রসবাগারে সাহায্য করিবার জন্য। হঠাৎ একদিন তাহার কাপড়ে আগুন লাগিয়া সর্বাঙ্গ পুড়িয়া গিয়া ঘা হইয়া যায়। সেবা করিতে আসিয়া সে নিজেই সেবাপ্রার্থী হইয়া পড়ে। কিন্তু তাহার সেবা করা বাড়ীর লোকের পক্ষে অসম্ভব হইল। অথচ তখন সেবার দরকার। গ্রামবৃদ্ধদের ডাকে নিতাই সাধু অগ্রসর হইয়া আসেন তাঁহার সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়া। আমিও তাহাদের মধ্যে ছিলাম। তিন চার দিন অক্লান্ত চেষ্টা করিয়াও তাহার প্রাণরক্ষা করা গেল না।

লোকের বিপদে আপদে সাহায্য করা সামাজিক মানুষের ধর্ম্ম কিন্তু এই ধর্ম্ম পালন করিতেও নৈতিক বলের প্রয়োজন হয়। নিতাই সাধু ও আশুতোষ এই নৈতিক বল সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং তাহাতে সাহায্য করিয়াছিল মনমোহন গোঁসাই ও রামকৃষ্ণ আশ্রম।

জামাইবাবু :

বৎসরান্তে একবার করিয়া এক ভদ্রলোক গ্রামে আসিতেন।

তাঁহাকে সকলেই জামাই বলিয়া ডাকিত। তিনি পাশের কোন গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার পেশা ছিল নিকটবর্ত্তী গ্রামের বৈদ্য ঘরের যত কানা, বোবা, পঙ্গু কন্যাকে বিবাহ করা এবং তাহাদের 'কুমারী' নাম ঘোচান। তখনকার দিনে সমাজের অনুশাসন ছিল কন্যা কানাই হউক আর বোবাই হউক তাহাকে বিবাহ দিতেই হইবে, তাহা না হইলে সমস্ত পরিবারটিই গ্রামে এক ঘরে হইয়া যাইবে। এই ভদ্রলোকের পেশাই ছিল এই সব অঙ্গহীনা, অনূঢ়া কন্যাকে বিবাহ করা। অবশ্য তাঁহার অন্য কোন পেশা ছিল কিনা জানি না। ইনি আমাদের গ্রামের একটি বোবা কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

বকুলতলা :

কলিকাতা শহরে আছে 'রক', আর আমাদের গ্রামে ছিল বকুলতলা। বকুল গাছের ছায়ায় সকালে সন্ধ্যায় গ্রামের লোকদের আড্ডা বসিত। প্রচুর রাজা, উজীর, হাতী, গণ্ডার প্রভৃতি নিহত হইত, অনেক রাজ্য ধ্বংস হইত, অনেক অর্জ্জুন অনেক বারই লক্ষ্যভেদ করিতেন। এই বকুলতলা গৌরবে আড়ম্বরে বাবুদের বৈঠকখানাকেও হার মানাইত। এখানে মা লক্ষ্মীদের ঘন ঘন তেলমুড়ি, চা সরবরাহ করিতে হইত না। রামা চাকরকেও মুহুর্মুহু তামাকু পরিবেশন করিতে হইত না। আমাদের গ্রামে তিনটি বকুলতলাকে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে প্রসিদ্ধি লাভ করিতে দেখিয়াছি। ইহাদের মধ্যে প্রধান ছিল অপূর্ব্ব সেনের বকুলতলা। ইহার আড্ডাধারী ছিলেন স্বয়ং অপূর্ব্ব সেন, চারু রায় ও বিশ্বম্ভর দাস। অন্যটি ছিল লস্কর বাড়ীতে—রত্নেশ্বর সেন যখন গ্রামে আসিতেন

তখন তিনিই আড্ডাধারী হইতেন। অন্যান্য সময়ে আনন্দ লস্কর মহাশয়ই আড্ডা জমাইয়া রাখিতেন, অবশ্য তাঁহার সাথী ছিল পাড়ার যত বালখিল্যগণ। তৃতীয়টি ছিল নৈর বাড়ীর ব্রজমোহন দাসের বকুলতলা এবং ইহার আড্ডাধারী নিতাই সাধু—গ্রামের যুব সম্প্রদায় ইহার সভ্য ছিল।

লাঙ্গলবন্ধের স্নানযাত্রা ঃ

উত্তর ভারতে গঙ্গাস্নান যেমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় অনুষ্ঠান, সেইরূপ পূর্ব ভারতে ব্রহ্মপুত্র স্নানও হিন্দুদের একটি পবিত্র কর্ত্তব্য। চৈত্র মাসের বাসন্তী অষ্টমীতে এই স্নান হইত। তাই ইহাকে সাধারণতঃ অষ্টমী স্নান বলা হইত। ব্রহ্মপুত্র নদের যে কোন ঘাটই এই স্নানের পক্ষে প্রশস্ত তবে নারায়ণগঞ্জের তিন মাইল পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্রের তীরবর্ত্তী গ্রাম লাঙ্গলবন্ধে স্নানের একটি বিশেষ মাহাত্ম্য ছিল। তাই এই স্নান লাঙ্গলবন্ধের স্নান নামেই বিশেষ প্রখ্যাত ছিল। কথিত আছে এখানে ব্রহ্মপুত্র স্নানের পরেই পরশুরামের হাত হইতে কুঠার খসিয়া পড়ে। আর কিম্বদন্তী অনুসারে হলধর বলরাম নাকি চাষ করিবার পর তাঁহার লাঙ্গলটি এই ঘাটেই ধৌত করেন এবং এই ঘটনা হইতেই লাঙ্গলবন্ধ নামের উদ্ভব। এই সব কারণে লাঙ্গলবন্ধে অষ্টমী স্নান বিশেষ পুণ্যময়। সারা ভারত হইতে সহস্র সহস্র তীর্থযাত্রী ঐ দিন এই স্নানের জন্য উপস্থিত হইত। আমাদের ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম হইতে পুরোহিতরা দশ বারো জনের এক একটি দল গঠন করিয়া নৌকা সহযোগে যাত্রীদের স্নান করাইতে নিয়া যাইতেন। এই স্নানের সময় দেখিয়াছি গ্রামে গ্রামে কি উদ্দীপনা, কী উৎসাহ!

রবীন্দ্রনাথের মৈত্র মহাশয়ের স্নান যাত্রার মতই এক এক জনের নৌকা যাত্রার কথা গ্রামে গ্রামে ক্রমশঃ রটিয়া যাইত। এই সব স্নান যাত্রাতেই অত্যন্ত শোকাবহ দুর্ঘটনাগুলি ঘটিত। কারণ চৈত্রের শেষ, কালবৈশাখীর দিন, ঝড় উঠিলেই নৌকাডুবি হইয়া বহুলোক প্রাণ হারাইত। জানি না দেশ বিভাগের পরে এই স্নান আর হয় কি না। এই স্নানের আরো একটা নামও বোধ হয় ছিল বারুণী স্নান। কিন্তু কেন এই নাম তাহা জানি না।

আম টোকানের কথা :

চৈত্রের শেষে এবং বৈশাখের আরম্ভে আমগুলি বেশ বৃহৎ হইয়া উঠিত। কালবৈশাখীর ঝড় উঠিলেই তাই আমগুলি মাটিতে পড়িতে থাকিত। এই ঝড়ে পড়িয়া যাওয়া আম "টোকানোর" ব্যাপারটা আমাদের কাছে অত্যন্ত আনন্দদায়ক ছিল। ঝড় থামিয়া গিয়াছে, বৃষ্টি পড়িতেছে কি পড়িতেছে না, সন্ধ্যা রাত্রি—বাঁশ ও শুকনো পাতা নির্মিত "জোংগা" মাথায় দিয়া আধো অন্ধকারের মধ্যে ভিজা মাটির গন্ধ ভরা আমবাগানের মধ্যে আম টোকানোর আনন্দ ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। প্রায় প্রত্যেকের বাড়ীতেই আমগাছ পাঁচ ছয়টা বা আরও অনেক থাকিত। আমের গুণ বা গাছের অবস্থিতি অনুসারে তাদের নামকরণও হইত। যেমন আমাদের কয়টা আম গাছের নাম ছিল চিনিটুকইরা, ভূতুইরা, কাঁচামিঠা, সিন্দুইরা, জানপাইরা, খালপাইরা, বুইরা ইত্যাদি। বাড়ীর সকলে মিলিয়া দল বাঁধিয়া আম টোকাইতে যাইতাম। আমবাগান সাধারণতঃ ভিটাবাড়ী হইতে কিছু দূরে থাকিত। তবু আম টোকানোর নেশায় আমরা অন্ধকারে ভয় পাইতাম না, বৃষ্টিকে

পরোয়া করিতাম না, এমন কি সাপকে পর্য্যন্ত 'ডরাইতাম' না। এমনই ছিল আম টোকানোর নেশা।

প্রথম বর্ষা :

সারা ভারতে বর্ষা মানে বৃষ্টি এবং বর্ষাকাল অর্থাৎ যে কালে বৃষ্টি হয়। এমন কি পশ্চিম বঙ্গেও। শুধু বিক্রমপুরেই দেখিয়াছি এই অর্থের অল্প ব্যতিক্রম আছে। সেখানে বর্ষা মানে প্রধানতঃ নদীর জলে প্লাবন এবং বর্ষাকাল মানে যে সময়ে নদীতে প্লাবন আসে। সাধারণতঃ এই প্লাবন ছয় মাস থাকে। পাহাড়ের বৃষ্টির জল নদী বাহিয়া সাগরে চলিয়া যাইবার আগে আশপাশের গ্রাম শহর প্লাবিত করিয়া যায়। বিক্রমপুর বাসীরা ইহাকেই বর্ষা বলিত। অবশ্য কখনও কখনও বৃষ্টিকেও বর্ষা বলা হইত। এই প্লাবন ক্রমে ক্রমে চতুর্দ্দিক ভরিয়া ফেলিত। প্রথমে খালগুলি ভরিত, তাহার পর খালের দুই কুল ছাপাইয়া বানের জল মাঠে প্রবেশ করিত। মাঠ হইতে যাইত বাগানে এবং কখনো কখনো মানুষের বসতবাড়ী পর্য্যন্ত প্লাবিত হইয়া যাইত। বৈশাখের শেষে আরম্ভ হইয়া আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র পূর্ণ বর্ষা চলিত। তাহার পর আশ্বিন হইতে জল নামিতে সুরু করিয়া কার্ত্তিকের শেষাশেষি জল সম্পূর্ণ নামিয়া যাইত।

বিক্রমপুরে সরাসরি বৃষ্টির জল হইতে বর্ষা আসে না। পাহাড়ের বৃষ্টি, অতিরিক্ত জলভরা নদী যখন বড় খাল বাহিয়া ঝোড়াখাল দিয়া গ্রামে প্রবেশ করিত তখনই বলা হইত বর্ষা আসিয়াছে। বর্ষার এই প্রথম আগমন ছোটদের কাছে বিশেষ আনন্দজনক ছিল। বড় খাল হইতে ছোট খালে জল প্রবেশ

করিতেছে শুনিলেই আমরা দা, কোদাল, শাবল প্রভৃতি নিয়া খালের দিকে ছুটিতাম। খাল তখনও শুষ্ক, ছোট ছোট আগাছায় পূর্ণ। আমাদের উদ্দেশ্য, এইগুলি কাটিয়া রাস্তা পরিস্কার করিয়া দিতে হইবে, জল আসিতে যেন বাধা না পায়। তখন বাতাসও বেশ জোরে বহিতে থাকে এবং বাতাসের প্রবলতা বৃদ্ধির সাথে সাথে জলের গতিবেগ বাড়িতে থাকে। তাহার পর ক্রমশঃ জলের মাত্রা খালের পাড় ছাপাইয়া মাঠে, বাগানে, পুকুরে, রাস্তা ঘাটে সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। পুকুরে যখন জল প্রথম আসিয়া পড়িত তখন মাছের জগতে প্রলয় নাচন সুরু হইয়া যাইত। সারা পুকুরের জল মাছেদের উত্তেজনায় আলোড়িত হইতে থাকিত। ইহা ছিল মাছেদের ছয় মাস পুকুরে বন্দীদশার পর প্রথম মুক্তির আনন্দোচ্ছ্বাস, নতুন জল তাহাদের প্রাণেও নতুন যৌবনের হিল্লোল বহাইয়া দিত। তাহারাও পুকুরের 'জাম' (পুকুরে জল আসা যাওয়ার নালা) দিয়া বাহিরে নতুন জলে যাইবার চেষ্টা করিত। কিন্তু এই উত্তেজনা কেবল তাহাদের মৃত্যুকেই টানিয়া আনিত। চতুর মানুষ তখন এই নালায় 'চাই' (মাছ ধরিবার জন্য বাঁশের তৈরী ফাঁদ) পাতিয়া মাছগুলি ধরিয়া ফেলিত। সেই সময়টা গ্রীষ্মকাল হওয়ার দরুণ খুব সকালে স্কুল বসিয়া দশটা সাড়ে দশটায় ছুটি হইত। স্কুল ছুটির পর ফিরিবার পথে তখন ছোট ছোট খাল নতুন জলে ভরা দেখিয়া আমরা লোভ সংবরণ করিতে পারিতাম না। বই খাতা কাপড় জামা খালের পাড়ে রাখিয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িতাম এবং তাহার পর বাড়ী ফিরিতাম দুই এক ঘণ্টা পর, নতুন জলে স্নানের সাধ মিটাইয়া। বর্ষার এই প্রথম আগমনের কয়টা দিন বেশ

আনন্দে কাটিত। তাহার পর ধীরে ধীরে বর্ষা সমগ্র দেশটাকে গ্রাস করিয়া ফেলিত।

বর্ষায় নানা ঘটনাই ঘটিত। একটি ঘটনা উল্লেখ করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। সেবার বর্ষা প্রচণ্ড আকার ধারণ করে। রাস্তাঘাট, পুকুর, খাল, এমন কি মানুষের বসতবাড়ী পর্য্যন্ত সেবার প্লাবিত হইয়া যায়। এক ঘর হইতে অন্য ঘরে যাইতে হইলে জল ভাঙ্গিয়া যাইতে হইত। পদ্মাপারে বিদ্‌গাও কি বনারী গ্রাম, নাম মনে নাই, সেখানেও বসতবাড়ী পর্য্যন্ত এমনি প্লাবিত হইয়া যায়। এক বাড়ীতে সন্ধ্যার পর ভ্রাতৃবধূ দেবরকে খাইতে ডাকিয়াছে, দেবর ছিলেন শুইবার ঘরে। রান্নাঘরে যাইবার সময়ে দেবর দেখিলেন যে উঠানের মাঝখান দিয়া একটি কাঠ ভাসিয়া যাইতেছে। বৌদিকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া ঠাকুরপো কাঠটিকে নিরাপদ জায়গায় তুলিয়া রাখিতে গেলেন, রাত্রে জলের টানে ভাসিয়া না যায়। কিন্তু দেবর গিয়া যেই কাঠটিকে ধরিয়াছেন অমনি কাঠটিও তৎক্ষণাৎ তাঁহার পা কামড়াইয়া ধরিয়াছে। আসলে ইহা ছিল একটি কুমীর, বর্ষার জলে ভাসিয়া গ্রামে আসিয়া ঢুকিয়াছিল। দেবরের চীৎকারে মা ও ভ্রাতৃবধূ দুই জনেই আসিয়া তাঁহাকে ধরিলেন এবং তাঁহাদের আর্ত্তনাদে আকৃষ্ট হইয়া পাড়া-প্রতিবেশীরাও সকলে আসিয়া পড়িলেন। সকলের সম্মিলিত আক্রমণে এবং জলের অগভীরতার জন্য কুমীরটা বিশেষ সুবিধা করিতে না পারিয়া ছাড়িয়া দিল বটে, কিন্তু ছাড়িবার আগে দেবরকে মারাত্মক রকম জখম করিয়া ছাড়িল। ভদ্রলোক সে জখমের প্রতিক্রিয়া কাটাইয়া উঠিতে পারিলেন না। ঢাকা যাইবার পথেই তাঁহার মৃত্যু হইল।

আমাদের ছেলেবেলায় এরূপ একটি কুমীরের ঘটনা আমাদের

পার্শ্ববর্ত্তী আলদী গ্রামেও ঘটিয়াছিল। বর্ষাতে একটা কুমীর নদী হইতে আসিয়া গ্রামের পুকুরে সকলের অজ্ঞান্তে থাকিতে আরম্ভ করে এবং গরুটা ছাগলটা ধরিয়া নিয়া যাইতে সুরু করিয়া দেয়। পরে একদিন গ্রামের একটি বউকে ধরিয়া লইয়া যাইবার উপক্রম করিতেই সকলে তাহার উপস্থিতি টের পাইয়া যায় এবং আর কোন ক্ষতি করিবার আগেই কুমীরটাকে মারিয়া ফেলে।

বিয়ের চলন (Procession)

সতীশ একদিন নিবারণ কাকা ও নরেনদাকে আসিয়া খবর দিল, নয়াবাড়ীর সাবজজ্ দেবেন সেনের পুত্র ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট দ্বিজেন সেনের সহিত রতন সেনের কনিষ্ঠা কন্যার বিব্যাহ। "আজই সেই বিবাহের "চলন" (বরের শোভাযাত্রা) যাইবো তগো বাড়ীর উত্তরের রাস্তা দিয়া। ঐদিন বাইদ্য বাজাইয়া যাইতে দিবি না।" তখনকার দিনে কাহারও বাড়ীর সীমানার মধ্য দিয়া কোন বিবাহের শোভাযাত্রা বাদ্য বাজাইয়া গেলে গৃহ-স্বামীর পক্ষে তাহা অত্যন্ত অপমানজনক ছিল। কিন্তু নিঃশব্দে গেলে কোন আপত্তি নাই। কাকা ও দাদা সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "হক কথা, বাইদ্য বাজাইয়া যাইতে দিমু না।" কন্যাপক্ষ ও বরপক্ষ উভয়ই আমাদের আত্মীয়, কেহ কন্যাপক্ষে থাকিবেন আবার কেহ বা বরের চলনের সহিত আসিবেন। পাড়ার বাচ্চাদের একত্রিত করা হইল এবং যথেষ্ট পরিমাণে ঢিল সংগ্রহ করা হইল। সন্ধ্যার সময়ে দূর হইতে বাজনা শুনিয়া বুঝিলাম বর আসিতেছে। রাস্তার ধারে গিয়া তখন সকলে দাঁড়াইলাম। চলন আসামাত্র সকলে তারস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলাম "থামাও বাজনা, থামাও।" চলনের সঙ্গে প্রধান ব্যক্তিরা আসিয়া থামাইবার কারণ জানিতে চাহিলেন এবং কারণ জানিতে

পারিয়া বাজনা থামাইবার আদেশ দিয়া জায়গাটা নিঃশব্দে পার হইয়া গেলেন। পরে আমরা এই প্রকার কাণ্ড আরো কয়েকবার করিয়াছি।

নষ্ট চন্দ্র

কয়েকদিন ধরিয়াই দেখিতেছি বৈকুণ্ঠ ভূঁঞার বাড়ীর কাঁঠাল গাছে অকালে বেশ একটি হৃষ্টপুষ্ট নধরকান্তি কাঁঠাল ঝুলিয়া রহিয়াছে। নারিকেল গাছেও বেশ কয়েকটি ডাগর ডাগর সরেস নারিকেল "লাগাইলের" (নাগালের) মধ্যেই ফলিয়াছে। আরও নজর করিয়াছি লেংড়াদের বাড়ীর ঝাঁকার নীচেও সুন্দর কয়েকটি শশা হইয়াছে। পাশের বাড়ীর পেয়ারা গাছেও তখন পেয়ারাগুলি ডাঁসা হইয়া গিয়াছে। খবর পাইয়াছি বাগানে কিছু লটকাও আছে। এইসব দেখি আর অতি কষ্টে জিভের জল সামলাই। সুযোগ সন্ধান করি। গ্রামের ছেলে আমরা, পরের বাড়ীর ফল আমাদের উদরস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত শান্তি নাই এবং তাহার জন্য বৈধ-অবৈধ কোন উপায়ই অপ্রশস্ত নহে। গ্রামে তখনও বানরের উৎপাত আরম্ভ হয় নাই। কিন্তু শাখার উপর ঐ প্রকার দৌরাত্ম্য আমরাও কম করি নাই। টোনা আসিয়া বলিল, "দ্যাখ ঐগুলি ঝুইল্যা থাকে, জিহ্বার জল সামলান যায় না, চুরি করতে হইব।" কিন্তু বাল্যশিক্ষাতে পড়িয়াছি 'চুরি করা মহাপাপ'। হঠাৎ টোনার মনে পড়িল "আরে, এইটা তো ভাদ্র মাস, নষ্টচন্দ্র আছে না—ঐদিন চুরি করিলে পাপ নাই।" ভাদ্র মাসের পূর্ণিমাকে বলা হইত নষ্টচন্দ্রের পূর্ণিমা। পাপ নাই যখন, তখন চুরি করা তো অবশ্য কর্ত্তব্য। তবে নষ্টচন্দ্র যে কি অথবা এইদিন চুরি করিলে যে কেন পাপ হয় না তাহা তখনও জানিতাম না, এখনও জানি না। যাহা হউক, ঐদিন রাত্রিতে নিয়মমাফিক ফলগুলি সংগ্রহ করা হইল এবং ঐ রাত্রিতেই

যথাসম্ভব সদ্ব্যবহারও হইয়া গেল। কিন্তু মুস্কিলে পড়িলাম কাঁঠালটিকে নিয়া। কাঁঠাল কাঁচাও খাওয়া যায় না আবার পাকিতেও সময় লাগে এবং পাকিলেও গন্ধ বাহির হয়। মহা ফ্যাসাদ। তবু আমরা চুরি তো করিলাম, পরে যাহা হয় হইবে। পরের দিন বৈকুণ্ঠ ভুঁঞা চুরির খবর জানিয়া তৎক্ষণাৎ ধরিয়া ফেলিল কাহাদের দ্বারা এই কর্ম্ম হইয়াছে। তাই আমাদেরই ঘরের চতুষ্পার্শ্বে আসিয়া ঘুর-ঘুর করিতে লাগিল। একটা নারিকেলের তাজা ছোবড়া পড়িয়াছিল। সে আমাদের ডাকিয়া তাহা দেখাইয়া বলিল, "তরাই চুরি করছস, তগোই কর্ম্ম এই সব"। আমরা তো অস্বীকার করিলামই, বরঞ্চ উল্টা মারমুখী হইয়া উঠিলাম। কারণ ইংরাজীতে প্রবাদ আছে, আক্রমণই আত্মরক্ষার সর্বোৎকৃষ্ট উপায়। যাহা হউক গোলমাল সেখানেই মিটিয়া গেল। বৈকুণ্ঠ ভুঁঞাও অত্যন্ত অসন্তুষ্ট চিত্তে গজ গজ করিতে করিতে চলিয়া গেল। এখন বলি, কাঁঠালটি সময় মতোই পাকিয়াছিল এবং সকলের অগোচরে তাহা নির্বিঘ্নে উদরসাৎও করিয়াছিলাম।

ফল খাওয়া

নষ্ট চন্দ্র ভিন্নও ফল খাওয়ার নানান উপায় ছিল। একবার গরমের ছুটিতে তুড়তুড়ি পিসীমা দেশে আসিয়াছেন, বোধ হয় তাহার পূর্ববর্ত্তী বৎসরই তিনি টংগীবাড়ীতে নূতন বাড়ী করিয়াছেন। আমি দেশে থাকি। পিসীমা বলিলেন "চৈতা, কাল ভোরে আমার বাড়ীতে আসিস্ আম খাওয়াব।" তখনকার দিনে আত্মীয়-স্বজনকে আম খাওয়ার নিমন্ত্রণ একটা সাধারণ রেওয়াজ ছিল। বাড়ীতে কয়েকটা আম গাছ থাকিলেই অনেকের ভাগ্যেই এইভাবে আম খাওয়া জুটিত। তার পরদিন ভোরে তার বাড়ীতে গেলাম। আমার সমবয়সী ছেলেরা বদন (সুকুমার সেন

আই-সি-এস), খুকু (ডঃ অমিয় সেন), ছোটরণা (ছোট ভাই অশোক সেন, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী) প্রভৃতি সকলেই ছিল। আর ছিল লখার বাড়ীর বড়্কোন্ (বিখ্যাত কন্ট্রাকটর বি, এম, সেন) আর ছোট্কোন্ (ডঃ ডি, এম, সেন)। কিছুক্ষণ ছোটাছুটি খেলার পর আম খাইয়া বাড়ী ফিরিলাম।

বন-বাড়ীর বাগানে বিস্তর 'গয়া' (পেয়ারা) গাছ ছিল। সেখানে আমরা··ছেলেরা খেলা-ধূলা করিতাম আর পেয়ারা গাছে উঠিয়া কাঁচা-পাকা পেয়ারা বিনা নিমন্ত্রণেই মনের সুখে খাইতাম। মালিক লস্করেরা কখন কখন লোক পাঠাইয়া পেয়ারা খাওয়া বন্ধ করিতেন। মৌথা দীঘির পারে গুপ্তের বাড়ীতে একটি ভাল বরই (কুল) গাছ ছিল, তাহাতে অজস্র ফল হইত। মালিকেরা বিদেশে থাকিত কিন্তু বাড়ীর অন্য সরিক লাঠি নিয়া তাড়া করিয়া আসিত। দে ছুট্। তিনি বাড়ী চলিয়া গেলেই আবার সুরু হইত কুল গাছের উপর আক্রমণ।

লস্কর বাড়ীর পিছনে সরকারদের আম্বলি ভিটায় একটা অল্প-বয়সী গাব গাছ ছিল। তাতেও অজস্র গাব হইত। কাঁচা অবস্থায় গাবের আঠা ঘুড়ি জোড়াতে বিশেষ সাহায্য করিত। প্যাকিলে খাইতেও খুব উপাদেয় ছিল। গাছটার পাশে একটা সুপারী গাছ ছিল। একবার আমি ও টোনা স্কুল ছুটির পর পাকা গাব খাওয়ার জন্য ঐ গাছে উঠিয়াছি। ২।১টা গাব খাওয়ার পরেই দেখি, একটা সাপ উপর থেকে আমাদের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। উপায়ান্তর না দেখিয়া আমরা সুপারী গাছ বাহিয়া নীচে নামিয়া প্রাণ বাঁচাই।

স্কুলের পাশে খোয়াজ মিঞার ক্ষিরাই (শশা) ক্ষেত ছিল। ক্ষিরাই ফল ছেলেদের কাছে অতি উপাদেয় খাদ্য ছিল। ক্ষেতের ফল

বাঁচাইবার জন্য খোয়াজ মিঞা তাহার ছোট ছেলেকে রোজই স্কুলের সময় ক্ষেতে পাঠাইত। আমরা ৪।৫ জন ছেলে ফল চুরির মতলবে টিফিন টাইমে মাঠে গিয়া উপস্থিত হইতাম। ক্ষিরাই মাটিতে লুটান লতা গাঁছে হইত। পাতার নীচের একটি রসাল ফল ল ন্য করিয়া একটি ছেলে সেখানে গিয়া দাঁড়াইতাম, অন্য ছেলেরা প্রহরীকে অন্য দিকে ব্যাপৃত করিয়া রাখিত। সময় বুঝিয়া ফলটি পকেটস্থ করিতাম। এমনিভাবে ৪।৫টি ফল সংগ্রহ করিয়া আমরা তাহার সদ্ব্যবহার করিতাম। মনে হইত খোয়াজ মিঞা এব্যাপার বুঝিত না, কিন্তু নালিশ হইত এবং প্রধান শিক্ষক মহাশয় ছেলেদের ঠিক ঠিক ধরিয়া Stand up on the Bench করাইতেন। আখের মরশুমে মাঠ থেকে খাগরি আখ (সর সর আখ) খাওয়া নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল।

অম্বষ্ঠ সম্মিলনী

তখনকার দিনে যাহারা প্রবাসে থাকিতেন। তাহারা সকলেই পূজার সময় দেশে আসিয়া একত্রিত হইতেন। প্রতি জায়গাতেই নানারূপ সভা-সমিতি হইত। বিক্রমপুরের বৈদ্যরা এইরকম একটি সমিতি গঠন করিয়াছিলেন। নাম অম্বষ্ঠ সম্মিলনী। এক এক বার এক এক গ্রামে পূজার সময় এই সম্মিলনীর অধিবেশন হইত। পূর্ব বৎসরই স্থান ঠিক করিয়া রাখা হইত। এই সব অধিবেশনে বৈদ্য সমাজের তাবৎ সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা হইত। আমার অতি বাল্যাবস্থায় মনে আছে একবার এই অধিবেশন আনন্দ ডেপুটীর বাড়ী হইয়াছিল। পরে ১৯১৩ সনে হেম সেনের চেষ্টায় স্কুলেও একবার এই অধিবেশন হয়। ঐ অধিবেশনে আমি খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থাপনার ভার নিয়াছিলাম। ইহার উদ্যোক্তাদের মধ্যে কয়েক-জনের নাম আমার মনে আছে—সোনারঙ্গের হেম সেন, গাড়ুগার

রাজকুমার সেন, আউটসাহীর সুধীরচন্দ্র সেন প্রভৃতি। পরবর্ত্তীকালে বিক্রমপুরের এই অম্বষ্ঠ সম্মিলনী বন্ধ হইয়া যায়। তাহার পর সমগ্র বাংলার বৈদ্য সমাজ নিয়া কলিকাতায় "বৈদ্য বান্ধব-সমিতি" প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার উদ্যোক্তাদের মধ্যে আমার কেবল দুইটি নামই মনে আছে—হেমচন্দ্র সেন ও বিধুভূষণ সেন। এই সমিতির দুইটি অধিবেশনের কথা আমার পরিষ্কার মনে পড়ে—একটি শোভা বাজারের আর, সি, গুপ্তর বাড়ী, অপরটি জোড়াসাঁকোর নন্দলাল গুপ্তর বাড়ী। দুই জায়গাতেই উপস্থিত সভ্যবৃন্দকে ভুরিভোজ করানো হইয়াছিল। তখন পূজার সময় দেশে যাওয়া সকলেরই প্রায় বন্ধ হইয়া আসিয়াছে।

দামোদরের বন্যা

১৯১৩ সালে দামোদরের ভীষণ বন্যায় ত্রাণ কার্য্যের জন্য মাখন সেন গিয়াছিলেন এবং সেখান হইতে অপূর্ব্ব সেনের নিকট লিখিয়াছিলেন স্বেচ্ছাসেবক পাঠাইবার জন্য। অপূর্ব্ব সেন আমার ও টোনার উপর স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহের ভার দিলেন। আমাদের যাইবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা নিকটবর্ত্তী বলিয়া অভিভাবকেরা আমাদের যাইতে দিলেন না। তখন বর্ষাকাল—নৌকা করিয়া গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া আমরা চারজন স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করিলাম, আমাদের গ্রামের মাখনলাল সেন লস্কর ও নৃপেন্দ্রনাথ সেন (প্রোফেসার প্রমোদ সেনের কাকা) এবং বেতকা গ্রামের গোপাল চক্রবর্ত্তী ও ধরণী চক্রবর্ত্তী। অপূর্ব্ব সেন সেইদিনই তাহাদের প্রয়োজনীয় অর্থ এবং উপদেশ দিয়া বর্দ্ধমানে পাঠাইয়া দিলেন।

নিশার ডাক

নিশার ডাক মানুষকে বিপথে নিয়া যায়। কিন্তু সেই নিশার

ডাক এখানে আমি বলিতে বসি নাই। আমি বলিব গ্রামের রাত্রির সেইসব অশরীরী আহ্বানের, সেইসব প্রহেলিকার কথা, যাহা অবাস্তব নহে, অতি প্রাকৃতিক নহে অথচ আমাদের ভয়ে বিস্ময়ে, আনন্দে রোমাঞ্চিত করিয়া রাখিত। ইহা হইল গ্রামের রাত্রির রূপ যাহা কেবল গ্রামবাসীরাই অনুভব করিত। প্রথমেই আসে গ্রামের রাত্রির অন্ধকারের কথা। সে অন্ধকার অসাধারণ, অতি ভয়াবহ। জমাট বাঁধা অন্ধকার যেন পুঞ্জ পুঞ্জ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মেঘের মত ধরণী পরিব্যপ্ত করিয়া আছে। যেন হাত বাড়াইয়া এই অন্ধকার স্পর্শ করা যাইবে। চলিতে গেলে হাত দিয়া অন্ধকার সরাইয়া পথ করিয়া চলিতে হইবে। সূর্য্যাস্তের পরমুহূর্ত্তেই এই অন্ধকার পৃথিবীকে গ্রাস করিয়া ফেলিত। তখন আর এক হাত দূরের জিনিসকেই দেখা যাইত না। এমনি এক রাত্রিতে একদিন আমি বাগানের পথে বাড়ী ফিরিতেছিলাম। অন্ধকারে রাস্তায় নজর চলে না। হঠাৎ আমার সমান একটা প্রাণীর সঙ্গে আমার ধাক্কা লাগিল। ভয়ানক ভয় পাইয়া পাশে সরিয়া গেলাম। তারপর ঠাহর করিয়া দেখি ওটা একটা খোদাই ষাঁড়। গ্রামের লোক—সে হিন্দুই হউক আর মুসলমানই হউক এইরূপ ষাঁড় সমাজের কল্যাণের জন্য খোদার নামে ছাড়িয়া দেয়। এই ষাঁড়গুলি আপন মনে মাঠে ঘাটে ঘুরিয়া বেড়ায়, আপনার আহার আপনি খুঁজিয়া লয়, নিজেই নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করে। কেহ বিরক্ত না করিলে ইহাদের মেজাজ কখনই বিগড়ায় না। বর্ষাকালে মাঠ ছাড়িয়া ইহারা লোকের বাড়ীতে, বাগানে বাগানে ঘোরে—ইহাদের নামই খোদার ষাঁড়।

গভীর অন্ধকার রাত্রির আবার অন্য আর একটা রূপও আছে। জোনাকীর বিন্দু বিন্দু আলোকে সজ্জিত রাত্রি আবার অন্য এক

রূপমতী। যেন সল্‌মাচুমকীর ওড়না গায়ে অন্ধকার প্রকৃতি দেবী সাজিয়া বসিয়াছেন।

কিন্তু এই প্রচণ্ড রূপের আড়ালে মৃত্যুও লুক্কায়িত থাকে। আলো না লইয়া পথ চলা অত্যন্ত বিপজ্জনক, কেননা পূর্ববঙ্গের গ্রামে গ্রামে সাপের ভয় বড় বেশী।

রাত্রি কিছু অগ্রসর হইলে অকস্মাৎ 'খোক্‌কোর' ডাকে চমকিয়া উঠিতে হয়। খোক্‌কোর পোষাকী নাম হইল তক্ষক। তাহারা গাছের খোড়লে বা গর্ত্তে বাস করে এবং টক্‌কে টক্‌কে টক্‌কে করিয়া ডাকে। আমরা তক্ষকের ডাক শুনিতাম। এক, তুই, তিন। সাধারণতঃ আট দশবার ডাকিয়াই থামিয়া যাইত। আমরা এই ডাক শুনিয়া তক্ষকের বয়স নিরূপণ করিতাম — যে যতবার ডাকিবে তাহার তত বয়স। তাহার পর কোড়াল পাখী। দেখিতে অনেকটা চিলের মত, কিন্তু গাত্রবর্ণ ধূসর। দিনে পুকুরের ধারে গাছের ডালে বসিয়া থাকিয়া মাছের উপর নজর রাখিত এবং মাছ দেখিলেই ঝাঁপাইয়া পড়িত। রাত্রে কিন্তু ইহার কাজ ছিল প্রহর ঘোষণা করা। প্রহরে প্রহরে কোড়াল পাখী ডাকিয়া উঠিত।

শিয়ালের ডাকও গ্রাম্য রাত্রির একটি বিশেষ অঙ্গ। ইহারাও নাকি প্রহরে প্রহরেই ডাকে। একটা শিয়াল কোনখান হইতে "হুক্কা হুয়া" করিয়া উঠিলেই আশেপাশে যতগুলি শিয়াল থাকে সবগুলি একসঙ্গে ডাকিয়া ওঠে এবং একবার ডাকিতে আরম্ভ করিলে তুই তিন মিনিট ডাকিয়া থামে। আবার হয়ত ঘণ্টা তুই পরে আবার ডাক আরম্ভ হয়। এমনিভাবে সারা রাত্রিতে চার পাঁচ বার শিয়ালেরা ডাকে।

জ্যোৎস্না রাত্রে গ্রামের পথ-ঘাট বাগান-মাঠ জ্যোৎস্নায় প্লাবিত

হইয়া যায়। জ্যোৎস্না-স্নাত পৃথিবীর সে অপরূপ শোভা আধুনিক শহরবাসীর পক্ষে অনুমান করা অসম্ভব। যে দেখিয়াছে সেই-ই কেবল তাহা জানে।

এমনিতে জ্যোৎস্না রাত্রি অপরূপ। কিন্তু এই জ্যোৎস্না রাত্রিই গ্রামের মানুষকে মাঝে মাঝে বিভ্রান্ত করিয়া দিত। জ্যোৎস্না রাত্রে মাঠের পথে চলিতে চলিতে হঠাৎ মানুষ কি জানি কেন দিশাহারা হইয়া বিভ্রান্ত পথিকের মত যতক্ষণ জ্যোৎস্না থাকিত ততক্ষণ ঐ মাঠেই ঘুরিয়া বেড়াইত। একই জায়গায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত গোলক ধাঁধাঁয় ঘোরার মত, যতক্ষণ না জ্যোৎস্না শেষ হয় তাহার সম্বিৎ ফিরিয়া আসিত না। এই অবস্থাকে আমরা বলিতাম "কানা হোলায় পাওয়া"। কানাহোলা অর্থ যে কি তা অবশ্য জানি না। এই অবস্থায় কাহারও মৃত্যু হইয়াছে কি না তাহাও জানি না।

তারপর সকালে ঘুম ভাঙ্গিত কাকের ডাকে। দিল্লীতেও অবশ্য কাকের ডাকেই ঘুম ভাঙ্গে। কিন্তু দেরাদুনে এক রকম নাম-না-জানা সুন্দর পাখীর মধুর ডাকে ঘুম ভাঙ্গিত। এই সুন্দর পাখীর মধুর ডাকে ঘুম ভাঙ্গিলেই বোধ হয় কবিতা বাহির হয় "ঐ যে আমার ভোরের পাখী নিত্য করে ডাকাডাকি"।

ভোররাত্রির আর একটা প্রাণারাম ডাকের কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। সেই ডাক আমাদের শিশুমনে কি শান্তিই না আনিয়া দিত! রাত্রিটা আমরা ছোটরা বড় ভয়ে এবং অস্বস্তিতে কাটাইতাম। দুপুর রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে সজাগ-সন্ত্রস্ত ভীত চিত্তে কান খাড়া করিয়া থাকিতাম। কোথাও একটু শব্দ হইলেই—হাওয়ায় নারিকেল পাতার ঝির ঝির শব্দ, কিম্বা ঘরের বাহিরে শিয়াল, কুকুর প্রভৃতির চলার শব্দ শুনিলেই প্রাণ শুকাইয়া আসিত। ভয়ে যেন হাত-পা নাড়িবার ক্ষমতাও লুপ্ত হইয়া যাইত। এই অকারণ ভয়ের

অবসান তখনই হইত, যখন অপর একটি মাভৈঃ শব্দ শুনিতাম। তাহা হইল চৌকীদারের ডাক। পাড়ায় আসিয়াই চৌকীদার হাঁকিত "বাবু জাগেন"। কি মধুব! সেই মানসিক অবস্থায় এই ডাক যে কতখানি স্বস্তি আনিত, কত বড় ভরসা দিত, তাহা বুঝাইবার শক্তি আমার নাই।

ফুল

ভাদ্রের মাঝামাঝি শিউলী ফুটিযা মায়ের আগমনী ঘোষণা করিয়া দিত। তারপর পূজা আসিত। মায়েব পূজাব বিশেষ উপকরণ পদ্মফুল। সুরথ রাজার বাসন্তী পূজায় পদ্মের প্রয়োজন ছিল কিনা জানি না, তবে শ্রীরামচন্দ্র মায়ের অকাল বোধন করিয়াছিলেন পদ্ম দিয়া। গ্রামে প্রতি বাড়ীতে পদ্ম ফুটিত না ঠিকই কিন্তু পূজা অনেক বাড়ীতেই হইত। আমাদের বাড়ীতে রাশি রাশি স্থলপদ্ম ফুটিত। এ পদ্মের চাহিদা খুব বেশী ছিল। আমাদের দেশে সাধারণতঃ স্থলপদ্মকেই পদ্মফুল বলা হইত।

বিক্রমপুরের প্রতি গ্রামেই সব ঋতুতে নানা রকম ফুল ফুটিত। গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় জ্যোৎস্না রাত্রে যখন উঠানে আসিয়া বসিতাম, সন্ধ্যামালতী, বেল, যুঁই আপন সৌরভে বাতাস ভরিয়া রাখিত। ভোরবেলায় রাশি রাশি শ্বেত গন্ধরাজ গন্ধ ও সৌরভে বাগান মাতাইয়া দিত। অবশ্য গন্ধরাজ সব বাড়ীতে থাকিত না। সাদা ফুলের মধ্যে টগর, কাঞ্চন সর্বত্রই হইত। গ্রামের পোষ্ট অফিসে মাধবী, লেচু, হাসনাহানা, কৃষ্ণচূড়া ছিল। বোধ হয় বৈকুণ্ঠ রায় সেখানে একটি ছোটখাট বাগান করিয়াছিলেন। রক্তজবা শক্তিপূজার অর্ঘ্য, সব বাড়ীতেই প্রায় হইত। আমাদের বাড়ীতে একটি কনকচাঁপার গাছ ছিল। ঝুম্‌কাফুলও দেখিয়াছি, কিন্তু কোন্ বাড়ীতে মনে নেই। রঙ বেগুনী, গোল এবং চার দিকে

বেগুনী রঙের ঝুম্‌কা বা ঝালর। কনকচাঁপার সোনার মত রঙ, দেখিতে ছোট—এ ছুটিই দেখিতে খুব সুন্দর। কামিনী সাদা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কিন্তু সৌরভে অদ্বিতীয়। তেমনই বকুল। আর ছিল বেগুনী রঙের নীলকণ্ঠ। সন্ধ্যায় লালচে বেগুনী রঙের নন্দত্বলাল ফুটিতে আরম্ভ করিলেই বলিতাম সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। আর ছিল ছোট ছোট সাদা রঙের দ্রোণ। ভাইট ছোট ছোট মারবেলের মত পাপড়িওয়ালা। এবং মালঞ্চ ও অপরাজিতা সারা ভারতেই আছে। এ ছাড়া অতসী, ছোট ছোট হলুদ রঙের। বৈশাখের সন্ধ্যায় ফুটিত। অতসী তলায় আমরা নারিকেলের মালা টক্ টক্ করিয়া বাজাইয়া ঝিঁ ঝিঁ পোকা ধরিতাম। এ আমাদের একটা খেলা ছিল। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা একত্র হইয়া সন্ধ্যাবেলায় অতসী তলায় নারিকেলের মালা বাজাইয়া আওড়াইতাম, "ঝিঝিলো মুছিলো বাঁশতলা তর ঘর, লোহার টোপর মাথায় দিয়া উইড়া আইসা পড়্। আইজকা ঝিঝির অধিবাস, কাইলকা ঝিঝির বিয়া, ঝিঝিলো মুছিলো বাড়ীতে আয়"···ইত্যাদি।

তারপর আসে হলুদরঙা কল্কের কথা। সমস্ত বছর ধরিয়া সর্বত্রই হইত। ইহা ভোলানাথ শিবের নাকি অত্যন্ত প্রিয়। রাধাকৃষ্ণের লীলার সাক্ষী কদম গাছ ছিল প্রচুর। অশোক বনের সীতার প্রেরণা-সঞ্চারী অশোক গাছও গ্রামে ছিল। কেয়া বনের মনমাতানো গন্ধে সাপও আকুল হইয়া উঠিত। শরতের শেষে হইত দোপাটী, নানা রঙের, নানা আকারের। আরও কত নাম-না-জানা ফুল যে গ্রামের পথে ঘাটে ফুটিয়া থাকিত তাহার সংখ্যা নাই। কিন্তু গ্রামে কখনও গোলাপ গাছ দেখি নাই।

ফল

ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং পৃথিবীর তদনুরূপ দেশ যথা :—আফগানিস্থান, পারস্য ফলের জন্য বিখ্যাত। সে সব দেশে যে যে ফল পাওয়া যায় তাহার তুলনা নাই। আমি কুর্দ্দিস্তানের পাহাড়ের উপর অপরূপ ফলের বাগান দেখিয়া আসিয়াছি।

আমাদের বিক্রমপুরে তথা সোনারং গ্রামেও নানা জাতীয় ফল পাওয়া যাইত। তবে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের আঙ্গুর, বেদানা, আপেল, আখরোট ইত্যাদি শুষ্ক অবস্থায় খাওয়াই প্রশস্ত। আর আমাদের দেশের আম, জাম, কাঁঠাল কাঁচা খাওয়াই প্রশস্ত। আমাদের দেশের মতো এত রকমারী ফল আমার মনে হয় পৃথিবীর কম দেশেই পাওয়া যায়। প্রথমেই ফলের রাজা আমের কথা বলি। প্রত্যেকের বাড়ীতেই ৮।১০টা করিয়া আমের গাছ ছিল, পর্য্যাপ্ত আম হইত সেই সব গাছে। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসই আমের প্রশস্ত সময়। তারপর কাঁঠাল। কাঁঠালের প্রশস্ত সময় প্রথম আষাঢ়ে। নারিকেল বার মাসই হইত। নানা রকম কলা—কবরী, সবরী, মর্তমান, অমৃতসাগর, অগ্নিশ্বর, কানাই বাশী কলার কত নাম! বীচিওয়ালা আইট্যা কলাও প্রচুর পাওয়া যাইত। কলা ভিন্ন মনসা পূজা হইত না। গইয়া (পেয়ারা) বর্ষাকালে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যাইত। শশী ভুঁইমালীর বাড়ীতে অসংখ্য পেয়ারা গাছ ছিল। বাদুড় তাড়াইতে শশীর বৌ সারারাত ঠা-ঠা বাজাইত। আমাদের ঘুম হইত না। ভাদ্র মাসে হইত তাল, তবে সকলের বাড়ীতে তালগাছ ছিল না। তালের বিশেষত্ব ছিল, তালের কাঁচা বয়সে তাল শাঁস, পূর্ণ বয়সে পরিপক্ক তাল এবং শেষ বার্দ্ধক্যে আবার অন্য রকম শাঁস এক তাল থেকেই পাওয়া যাইত। শশা বোধ হয় বার মাসই হইত।

'ক্ষিরাই' (শশার ক্ষুদ্র সংস্করণ) কিন্তু শীতকালে সরস্বতী পূজার সময় পাওয়া যাইত। জাম ছিল নানা রকমের। তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ গোলাপ জাম. হৃষ্টপুষ্ট কালোজামও বেশ হইত। তাছাড়া বনে জঙ্গলে জঙ্গলী জামেব ত সংখ্যাই ছিল না। টকের মধ্যে লট্‌কা শ্রেষ্ঠ। তারপর ডউয়া, ডেকল, কাউ চাল্‌তা, বরই নানা রকমের। শীতের শেষে বরই পাওয়া যাইত। যাদের বাড়ী বরই বা কুলগাছ থাকিত, ছেলে-ছোকড়াদের অত্যাচারে বরই খাওয়া গৃহস্থের পক্ষে সম্ভব ছিল না। নানা রকম জম্বুরা, (বাতাপী লেবু), বেথুন, আমলকী পাওয়া যাইত। পায়লা বলে এক রকম ফল ছিল সবুজ মারবেলের মত। হাত দিয়া টিপিয়া টিপিয়া সেটাকে পাকাইতে হইত। জলপাইও বাগানে বেশ হইত। করমজা ঠিক ফলের পর্য্যায় পড়ে না। কাঁচা খাওয়া যাইত না, রান্না করিয়া খাইতে হইত। আর ছিল খেজুর, অবশ্য ইহা আরব দেশের খেজুরের মত রসাল.হইত না। বাঙ্গী, চীনালও গ্রামে হইত। কিন্তু তরমুজ গ্রামে হইত না। বাহির হইতে আনিতে হইত। গাবটা ফল পর্য্যায়ে আসিত না, কিন্তু পাকা গাব খুব সুস্বাদু ছিল। বৈকুণ্ঠ রায়ের বাড়ীতে ছিল বিলাতী গাব। সেটা কি পদার্থ বুঝিয়া উঠিতাম না। লিচুও খুব হইত। গাছ ছোট হইলে অনেকে তা জাল দিয়া ঢাকিয়া রাখিত বাদুড় তাড়ানোর জন্য। বেল ত সব বাড়ীতেই হইত। কদ্‌বেল আমাদের গ্রামে পাওয়া যাইত না। আতা ও নোনা স্বাদে, গন্ধে, চেহারায় প্রায় একরকমই ছিল, পার্থক্য বুঝিতাম না। কামরাঙা ছেলেদের পক্ষে খুবই সুস্বাদু ছিল। জামরুল গ্রীষ্মে, বর্ষায় হয়। প্রচুর ঠাণ্ডা জলীয় রসে পিপাসার্ত্ত লোকের পিপাসা নিবারণ করিত। লেবু নানা রকমের, ফল পর্য্যায়ে হয়ত আসে না, সেরূপ হরতকী ও

সুপারী। যদিও এসব বাংলার প্রত্যেক গৃহস্থের নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু। জলে শাপলা জাতীয় গাছে যে ফল ধরিয়া থাকে আমরা পানিফল বলি, দেশীয় নাম 'সিংহারা'। শীতের শেষে হইত কলাই শুটি যাকে আমরা 'ছেই' বলিতাম, বেশ ভালই লাগিত। ইহা বাজারে পাওয়া যাইত না, ক্ষেত হইতে চুরি করিয়া খাওয়াই প্রশস্ত ছিল। লোকে হয়ত বিশ্বাস করিবে না, কিন্তু আমাদের দেশে এ অজস্রভাবে হইত। আমাদের পরবর্ত্তী সময়ে গ্রামের ছেলেরা হয়ত এসব এমনভাবে টের পায় নাই, কারণ বানর তখন গ্রামে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। মানুষের পক্ষে ফল খাওয়া তখন দুঃসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের ছোটবেলায় বেশী বানর ছিল না। তবে বাদুড় ছিল, কিন্তু বানরের মত তারা এত অনিষ্টকারী ছিল না। এছাড়া ছিল পেঁপে, কাঁচা অবস্থায় সবজী, পাকিলে সুস্বাদু, মাটির নীচে শাক আলু, আনারসও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইত। মাখৈ (বৈঁচির মত) নামে আর একটা ছোট, গোল, লাল রঙের, টক টক স্বাদ মালার মত করিয়া বেচিতে আনিত। বকুলগাছে বকুল হয়, বেশ ছোট ছোট, পাকিলে খাইতে খুব মিষ্ট। কমলা সাধারণতঃ বিক্রমপুরে হয় না, কিন্তু আমাদের বাড়ীতে একটা কমলাগাছ ছিল, শীতকালে সেই গাছে বেশ কিছু কমলা হইত।

বশীকরণ মন্ত্র

দুপুরবেলায় রান্না ঘরের পাশে কি কাজে যেন বাগানে গিয়াছি। হঠাৎ সেখানে ব্যাঙের আর্ত্তনাদ শুনি। বুঝিলাম সাপে ব্যাঙ ধরিয়াছে। যাহাই হউক ফিরিয়া আসিলাম। মনে হইল তেঁতুল কাসুন্দি চুরি করিয়া খাইতে হইবে। যেমন মনে হওয়া তখনি সোজা রান্নাঘরে গিয়া ঢুকিলাম। তেঁতুল কাসুন্দি অতি লোভনীয়

বস্তু। চুরি করিয়া খাইতে পারিলে স্বাদ যেন দশগুণ বাড়িয়া যায়। "ছিকার" উপরে কাসুন্দির হাঁড়ী ঝুলান আছে। কিন্তু যেই হাঁড়ীতে হাত ঢুকাইয়াছি, অমনি বাহিরে মা চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "সাপ, সাপ"। ভীত ত্রস্ত দৃষ্টিতে দেখি একটা কেউটে সাপ রান্নাঘরে ঢুকিতেছে। মায়ের চীৎকারে সাপটা বাহির হইয়া জঙ্গলে চলিয়া গেল। আমিও খুব ভয় পাইয়া জানাইয়া দিলাম রান্নাঘরে আমি আছি। মা আসিয়া আমাকে বাহিরে লইয়া গেলেন।

ব্যর্থ মনোরথ হইয়া শুইবার ঘরে শুইয়া আছি। দাদামহাশয় আনন্দ সেন বাহির হইতে চীৎকার করিয়া জানাইলেন, ঘরের পাশে একটা সাপ ঘোরাঘুরি করিতেছে। তিনি সাপটাকে তাড়াইয়া দিলেন। বুঝা গেল, আমি বাগানে যাওয়াতে সাপটার শিকার হস্তচ্যুত হইয়াছে, তার জন্য সাপটি আমার উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছে। সে আমাকে সহজে ছাড়িবে না। সবাই একত্র হইয়া স্থির করিলেন, এই অবস্থায় "আঁচলী" বাঁধিতে হইবে। অর্থাৎ সাপের মন্ত্র পড়িয়া আঁচল বাঁধিয়া রাখিতে হইবে, তাহা হইলে সাপ আর আক্রমণ করিবে না। সাপের বন্ধু আস্তিক মুনির নামে সাপের মন্ত্র পড়া হইবে। কৈবর্ত্ত বাড়ীর মহিমা কৈবর্ত্ত সাপের মন্ত্রপড়াতে ওস্তাদ। আমাকে সেখানে নিয়া যথারীতি "আঁচলী" বাঁধা হইল। তাহার পর সাপ কিন্তু আর আমার পিছু নেয় নাই। শুনিতে আশ্চর্য্য লাগে এবং হইতে পারে কাকতালীয়, কিন্তু ঘটনাটির সত্যতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই।

ছবি দৌড়ায়

কবিরাজ বাড়ীর কিষ্ট দাশ (কৃষ্ণকুমার) এবং তাহার পুত্র বিজা (ব্রজেন্দ্র) কলিকাতা হইতে আসিয়াছে। কলিকাতায় থাকে এবং কাপড়ের মস্তবড় ব্যবসায়ী, বেশ দু পয়সা আছে। বৎসরে একবার

সপরিবারে গ্রামে আসিয়া এক মাস থাকিয়া যায়। দেশে শুধু মা ও মাসীমা থাকেন। শুনিলাম সে নাকি একটা 'কল' আনিয়াছে। উহাতে নাকি গান গায়, তাই উহাকে কলের গান বলে। বড়ই আশ্চর্য্যের ব্যাপার। গ্রামবৃদ্ধদের পরামর্শ মত স্থির হইল পরদিন বৈকুণ্ঠ ভূঁঞার বাড়ীতে কলের গান হইবে। সবাই আসিলেন। কিষ্টও যথাসময়ে কল নিয়া তথায় উপস্থিত হইল। একটা বাক্স, তাহার উপর কালো একটা চাক্‌তী, উপরে আবার একটা চোঙ, সেটার ভিতর দিয়া গান বাহির হয়। একটা হাতলও আছে। কিষ্ট সেটা ঘুরাইয়া দিল, আর কি জানি একটা চাক্‌তীর উপর বসাইয়া দিল। কি আশ্চর্য্য! চোঙটার ভিতর হইতে সুন্দর গান বাহির হইতে লাগিল—"তুমি কাদের কুলের বউ"। আমরা স্তম্ভিত হইয়া শুনিতে থাকি।

কিছুদিন পরে আবার একটা আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিল। মুন্সীপাড়ার উপেন রায় একটা 'কল' আনিয়াছে। সেটাতে ছবির মানুষ হাঁটে, দৌড়ায়। সেটা শুধু রাত্রেই দেখানো হয়, ইহার নাম নাকি বায়োস্কোপ। স্থির হয় মুন্সীবাড়ীর নাটমন্দিরে রাত্রে উহা দেখান হইবে। গ্রামের সবাই সেখানে গিয়া হাজির। নাটমন্দির অন্ধকার করার পর কল হইতে আলো বাহির হয়। সেই আলোতে দেখা যায়, বহুদূর হইতে ছোট ছোট কালো কালো কি সব আসিতেছে। ভাল করিয়া দেখি, সেগুলি সব মানুষ। যত কাছে আসিতে থাকে তত বড় হইতে থাকে। শেষে আলো হইতে বিদায় নিবার সময়ে আমাদের দিকে চাহিতে চাহিতে চলিয়া যায়। কী ভীষণ ব্যাপার!

চতুর্দিকে রাষ্ট্র হয় সোনারং অত্যন্ত উন্নত গ্রাম। সেখানে কলে গান গায়, ছবিতে দৌড়ায়। এ বোধ হয় ১৯০৪/৫ সনের কথা।

ভয়

খুব ছোট সময়ের কথা—দিনে রাত্রে ভয়ে জুবুথুবু হইয়া থাকিতাম। প্রথমেই জুজুবুড়ী। সে নাকি একটা ছালা নিয়া "আগানে-বাগানে" (যেখানে সেখানে) ঘুরিয়া বেড়ায়। ছোট ছেলেমেয়েদের একা দেখিলেই ছালায় ভরিয়া নেয়। ঠাকুরমা বলিতেন জুজুবুড়ী পুরুষও হইতে পারে, স্ত্রীও হইতে পারে "আপুরে-দুপুরে (অসময়ে) আগানে-বাগানে যাইও না, জুজুবুড়ী ধরিয়া লইয়া যাইবো।"

তাহার পরে আসে ভূতের কথা। গ্রামে অনেক ভূত থাকিত। আমাদের বাড়ীর পার্শ্বে বড় রাস্তার ধারে প্রাচীন আম গাছটি পরগাছার শিকড়ে সারাদেহ তাহার কেমন কালো হইয়া গিয়াছিল—আর ইহার একটা বড় ডাল রাস্তার এপার হইতে ওপারে গিয়া রাস্তা জুড়িয়া ফেলাতে, দিনে-দুপুরেও রাস্তাটা অন্ধকার থাকিত। এই গাছে একটা ভূত থাকিত। একটু অগ্রসর হইয়া একটা ঘোর কৃষ্ণবর্ণ গাব গাছ। এখানেও একটা ভূত থাকিত। শুনিতাম বেলগাছে এক ব্রহ্মদৈত্য থাকিত, লস্কর বাড়ীর বকুলগাছে এবং বড় সরকার বাড়ীর বকুলগাছেও একটা করিয়া ভূত থাকিত। কুমার বাড়ীর উত্তর দিয়া যে রাস্তাটা লস্কর বাড়ীর পাশ দিয়া উত্তরমুখী রায়ের বাড়ীর দিকে গিয়াছে, সেখানে যে কত ভূত থাকিত তাহার সীমা-সংখ্যা নাই। রাস্তাটা বাঁশঝাড়ে এবং বেথাইক (বেত) গাছে ভরা, দুই পাশে দুইটা দুর্গন্ধময় জলা, দিনেও চতুর্দিক অন্ধকার। বান্দি ঠাকুরাণীর বাড়ীর বাগানে অতি উচ্চ ডেফলগাছ ছিল। গাছগুলির গায়ে কালো রঙের শিকড় গজাইয়া গাছগুলিকে একেবারে কালো করিয়া ফেলিয়াছিল। এইখানেও দুই একটা করিয়া ভূত থাকিত। ভূতেরা আবার

নানারকমের, কোনটা লম্বা, গায়ে আবার কালো কালো লম্বা লোম, চক্ষু রক্তবর্ণ, কোনটার মাথায় তুইটা করিয়া শিং, কোনটা স্কন্ধ কাটা মাথা ও গলা নাই, বুকের মাঝখানে একটা হলুদ রং-এর চোখ স্কুলের নিকটে শ্মশানের পার্শ্বেবটি ছিল খুব লম্বা। সে আবার রাত্রে বাহির হইত না। দিনেই শুধু বাহির হইত। আমাদের বাড়ীতেও একটা ছিল—সেটা আমাদেব পূবের পুকুরের পূর্ব পারে বট গাছের উপর একটা পা এবং আমাদের বাড়ীর পশ্চিমে, তুই ফার্লং দূরে চালতা গাছে আর এক পা দিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত। আমরা তাহাকে দেখি নাই, কিন্তু বৃদ্ধেরা শেষ রাত্রে বাহিরে আসিলেই তাহাকে দেখিতে পাইতেন। আমরা কিন্তু কখনও কোনো মোটাভূত গ্রামে ছিল বলিয়া শুনি নাই।

সন্ধ্যারাত্রি একটু অগ্রসর হইলেই "ফেউ" ডাকিত। শিয়াল কোন কারণে বিশেষ ভয় পাইলে, তাহার মুখ দিয়া "হুক্কাহুয়া" বাহির না হইয়া আর এক রকম বিশেষ ডাক বাহির হইত, যাহা "ফেউ"এর মতো শুনাইত। তাই শিয়ালকে এই অবস্থায় ফেউ বলা হইত। বনে বাঘ দেখিলে শিয়াল ফেউ ডাকিত, ভয়ে। তাই এই ডাক শুনিলেই লোকে বুঝিত, বাঘ আসিয়াছে। কিন্তু অন্য কারণেও শিয়াল ফেউ ডাকে, যেমন শারীরিক যন্ত্রণায়। যাহা হউক ফেউ ডাকিলেই আমরা ছোটরা মনে করিতাম বাঘ আসিয়াছে এবং তাই বিছানায় জড়সড় হইয়া এক কোণায় শুইয়া থাকিতাম। তুপুর রাত্রে হাওয়ায় নারিকেলের পাতা নড়ার আওয়াজ হইলে মনে হইত, চোর আসিয়াছে। ভয়ে কাঠ হইয়া থাকিতাম। চৌকীদার "বাবু জাগেন" বলিয়া ডাকিয়া সেই ভয় হইতে বাঁচাইত। তাহার পর শৈশব গেল, কৈশোর গেল, যৌবনের প্রারম্ভে কলেজে আসিয়া পড়িলাম। সব ভয় অন্তর্হিত হইল।

জুজুবুড়ী, ভূতেরা আমার জগৎ হইতে কোথায় যেন চলিয়া গেল, কেউও আর যেন তেমনভাবে ডাকে না, দুপুর রাত্রে মৃদু হাওয়ায় নারিকেলের পাতা আর ঠিক তেমনভাবে নড়িতে পারে না। সব ভয় কোথায় যেন হারাইয়া গেল।

কিন্তু কিছু ভয় রহিয়া গেল—সাপের ভয় আর পাগলা শিয়ালের ভয়। ১৯২৪ সালে সবে ডাক্তারী পাশ করিয়া মাকে নিয়া গ্রামে আসিয়াছি। অভিজ্ঞতা হইয়া গেল। সকালে ডাকের আশায় ডাকঘরে বসিয়া আছি হঠাৎ দেখি লস্কর বাড়ীর মুন্না একটা পাগলা কুকুরকে তাড়া করিয়া আসিতেছে। ভালো করিয়া দেখিতে বুঝিলাম উহা কুকুর নহে, একটা পাগলা শিয়াল। তখন সকলে মিলিয়া শিয়ালটাকে তাড়া করিয়া মারিয়া ফেলিলাম। দেখা গেল, শিয়ালটা কোন মানুষকে কামড়ায় নাই বটে, কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় চারটি কুকুরকে কামড়াইয়াছে। আমরা সদ্যলব্ধ ডাক্তারী বিদ্যায় অনুমান করিলাম যে এই কুকুরগুলি অল্প দিনের মধ্যে পাগল হইয়া যাইবে এবং গ্রামবাসীকে কামড়াইবে। আর তাহা হইলেই জলাতঙ্ক রোগ অনিবার্য্য। অবিলম্বে আমি নিবারণ ডাক্তারের নিকট হইতে কিছু ষ্ট্রাক্নিন বিষ সংগ্রহ করিয়া দুধের সহিত তাহাদের খাওয়াইয়া দিলাম। কুকুরগুলি মরিল, কিন্তু গ্রামের লোক বাঁচিল। অবশ্য আমাকে প্রচুর বেগ পাইতে হইয়াছিল গ্রামের লোকেরা অর্থাৎ যাহারা কুকুরের প্রভু ছিল তাহারা কিছুতেই ঔষধ খাওয়াইতে দিবে না, পাছে মরিয়া যায়। অনেক বুঝানোর পর তাহারা রাজী হইল এবং কুকুরগুলি ঔষধ খাইয়া মরিয়া গেল। আমি আর ঐমুখো হই নাই। ইহার কিছুদিন পরে গ্রাম ছাড়িয়া আমার কার্য্যক্ষেত্রে চলিয়া যাই। ঐ কুকুরগুলির একটা ছিল আমার

বাল্যবন্ধু সাব ডেপুটি রাধা বাড়রীর। তাহার কুকুরটার মৃত্যুতে সে খুবই দুঃখিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহাকে বুঝাইবার সুযোগ আমি পাই নাই। আমি বাংলাদেশ ছাড়িয়া দিল্লী আসিলাম—সেও কার্য্যোপলক্ষে অন্যত্র গেল। পরে তাহার সহিত আর দেখা হয় নাই।

তারা গণনা ও নৌকা গণনা

ছোটবেলায় তারা গণনা নামে একটা খেলা খেলিতাম। দুই তিনজন একত্র হইলেই খেলাটা জমিত। তবে নেহাতই ক্ষণস্থায়ী। দুই তিন মিনিটের বেশী স্থায়ী হইত না। এই মাত্র সূর্য্য ডুবিয়াছে। অন্ধকার এখনও আসে নাই। আকাশ নির্মল, পৃথিবী শান্ত। ছেলেরা ঘরের বাহিরে উঠানে বাহির হইযা আকাশের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, "আয় আয় তারা।" তাহার পর আরম্ভ হইল, 'ঐ একটা!' কে আগে দেখিয়াছে। 'ঐ আর একটা।' কোন্‌টা আগে উঠিয়াছে? 'ঐ আর একটা, না, তুই ভুল দেখেছিস। ঐ আর একটা, দুইটা, তিনটা, চারটা···।" তারপর ক্রমশঃ সারা আকাশ তারায় ভরিয়া উঠিত। আমরাও এই খেলার শেষে অন্য খেলায় মাতিয়া উঠিতাম।

এই ভাবেই আমরা নৌকা গণনার খেলাও খেলিতাম। ছেলেবেলায় আমাদের গ্রাম হইতে আট মাইল দূরে বাহেরক গ্রামে পিসীমার বাড়ী নৌকায় যাইতাম। বিনাইনার খাল দিয়া মাক্কুহাটীর বড় নদীতে পড়িলেই পাল-তোলা বড় নৌকা দেখা যাইত। আমরা উহা গণিতাম। দাদা, তুই কতখানা নৌকা দেখেছিস? পাঁচখানা। ভুল দেখেছিস, আমি ছখানা দেখেছি। ঐ আর একখানা, আবার ঐ আর একখানা। গ্রামে ফিরিয়া সাথীদের কাছে খুব উৎসাহভরে এই নৌকা গণনা বলিতাম। সাথীরাও উদ্‌গ্রীব ভাবে শুনিত।

আজ এই বৃদ্ধ বয়সে তারা গণনার কথা, নৌকা গণনার কথা শুনিলে মনে কোনরূপ ভাবান্তরই আসে না। কিন্তু শৈশব ও কৈশোরে সামান্য একটু ভাবের স্পর্শে প্রাণে যে বিমল আনন্দের স্পর্শ পাইতাম তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। কালপ্রবাহের সাথে সাথে সেই আনন্দের গুঞ্জন চলিয়া গেছে কিন্তু স্মৃতিটুকু রহিয়াছে। সেই দূরাগত সঙ্গীত মাঝে মাঝে প্রাণে এখনও এক অপূর্ব্ব সুর মূর্চ্ছনার সৃষ্টি করে।

বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য

বিরাট নদী, ঢেউখেলানো ধানের ক্ষেত, দিকচক্রবাল পর্য্যন্ত বিস্তৃত মাঠ। একটা জলে-ডোবা ধানক্ষেতের ওধারে একটা বাস্তু-ভিটা। মাঝখানে একটা পুকুর। তাহার উচ্চ পাড়ের উপর ছয়-সাতখানা আটচালা। উল্টাদিকে বাঁশের ঝাড়। স্থির নিস্তরঙ্গ জলে আটচালার স্পষ্ট ছায়ায় উপরের নীল আকাশ ও সন্ধ্যার রক্তিম মেঘের ছায়া পড়িযাছে। এই তো বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য!

বাংলার এই শ্রীতে বিশাল গরিমা ও মহিমা আছে। সে বিশালত্ব গরিমা ও মহিমা বাংলার জলরাশির। তাহার কতরূপ! এই জলরাশির সহিত আকাশের নীলিমা, ক্ষেতের সবুজ বর্ণের শ্যামলিমা মিশিয়া বাংলার শ্রী গঠিত হইয়াছে। বাঙালী বুদ্ধির দোষে, অন্ধ উত্তেজনার বশে, ভয়াবহ দ্বেষের তাড়নায় বাংলাকে ভাগ করিয়াছে।

বঙ্গবিভাগের পর অন্য সব দিক দিয়াই হাহাকার ও ঝগড়ার বিরাম নাই। শুধু একটি কথা শোনা যায় নাই—সব চাইতে বড় ক্ষতি সম্বন্ধে। বাঙালী তাহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য হারাইয়াছে।

নদী জল, উন্মুক্ত, উদার নীলাকাশ, কাজল কালো বা মরালশুভ্র মেঘ, দিগন্ত প্রসারিত ক্ষেত ও ঘনশ্যাম বনানী বাঙালীর জীবনে প্রধান অবলম্বন। ইহা ছাড়া জীবন্ত বাঙালী কল্পনা করা যায় না।

বাস্তুহারা বাঙালী আর তাহার এই প্রাকৃতিক সম্পদ, বিশেষ করিয়া জলের কথা ভুলিয়া গিয়াছে।

শ্রীনীরদ চৌধুরীর কথাগুলি প্রতি পুর্ববঙ্গবাসীর মনের কথা। প্রতিক্ষণে, প্রতিমূহুর্তে জীবনের স্পন্দনে স্পন্দনে এই কথাগুলি আক্ষেপ করিয়া ফেরে। কিন্তু জলেব কথা কি আমরা ভুলিয়াছি, না ভুলিতে পারি। জল ছিল আমাদের জীবনের প্রতি পদক্ষেপের সঙ্গী। পৃথিবীর দিকে দিকে আমি ঘুরিয়াছি। ঘুরিতে ঘুরিতে হঠাৎ আমি আবার আমার দেশের সেই কাজল কালো জলের দেখা পাইলাম। ইস্রায়েলে, সী অব্ গ্যালিলির জলে। টাইবেবিযাস নগরের পাশ দিয়া যাইতেছিলাম হঠাৎ সী অব্ গ্যালিলির গভীর জল দেখিয়া আমার আবার বাংলাদেশের জলের কথাই বারংবার মনে পড়িতেছিল। শুনিয়াছি নীরদবাবুরও ইহা ভালো লাগিয়াছিল।

বাংলার রমনী

বাংলার রমনীর কথা বাৎস্যায়ন তৃতীয় শতাব্দীতে বলিয়াছেন, সপ্তম শতকে চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাংও উল্লেখ করিয়াছেন। দ্বাদশ শতকে বাংলার কবি উমাপতি ধর বাংলার নারী চরিত্রের একটি অনন্য সাধারণ চিত্র "সদুক্তি কর্ণামৃত" গ্রন্থে অাঁকিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন বাংলায় নারীর আদর্শ ছিল, লক্ষ্মীর মতো কল্যাণী, বসুধার মতো সর্বংসহা স্বামীব্রত-নিরতা এই নারীত্বই ছিল প্রাচীন বাংলা নারীর চিত্তাদর্শ, বিশ্বস্তা, সহৃদয়া, বন্ধুসখা এবং স্থৈর্য্য, শান্তি ও আনন্দের উৎস্বরূপিনী স্ত্রী হওয়াই ছিল তাহাদের একান্ত কামনা, ধীর ও গুণী সন্তানের জননী হওয়াই ছিল তাহাদের সকল কামনার চরম বাসনা। তাই রমনী স্ত্রী ও জননীরূপেই সংসারে পুজিতা হইতেন।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়া গিয়াছেন তাহার সীতারামে জয়ন্তী ও শ্রীর সংলাপ। সন্ন্যাসীনী জয়ন্তী শ্রীর স্বামী পরিত্যক্তা জীবনেও স্বামীর প্রতি তাহার ভালোবাসার পরিচয় পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

জয়ন্তী—তোমার সহিত তাহার তো দেখা সাক্ষাৎ নাই বলিলেই হয়—এত ভাল বাসিলে কিসে?

শ্রী—তুমি ঈশ্বর ভালবাস, কয়দিন তোমার ঈশ্বরের সহিত দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছে।

জঃ—আমি ঈশ্বরকে মনে মনে রাত্রিদিন ভাবি।

শ্রী—যেদিন বালিকা বয়সে তিনি আমাকে ত্যাগ করিয়াছিলেন সেদিন হইতে আমিও তাহাকে রাত্রিদিন ভাবিয়াছিলাম।

জয়ন্তী শুনিয়া রোমাঞ্চ কলেবর হইয়া উঠিল। শ্রী বলিতে লাগিল "যদি একত্র ঘর সংসার করিতাম, তাহা হইলে বুঝি এমনটি ঘটিত না। মানুষ মাত্রেই দোষগুণ আছে, তাঁহারও দোষ থাকিতে পারে। না থাকিলেও আমার দোষে আমি তাঁর দোষ দেখিতাম। কখনো না কখনো কথা, মন তার অকৌশল ঘটিত। তা হইলে এ আগুন এত জ্বলিত না। কেবল মনে মনে দেবতা গড়িয়া আমি তাহাকে এত বৎসর পূজা করিয়াছি। চন্দন ঘসিয়া দেওয়ালে লেপন করিয়া মনে করিয়াছি তাঁর অঙ্গে মাখাইলাম। বাগানে বাগানে ফুল চুরি করিয়া দিনভোর কাজকর্ম রাখিয়া অনেক পরিশ্রমে মালা গাঁথিয়া পুষ্পভরা গাছের ডালে পড়াইয়া মনে করিয়াছি তাঁহাকে পড়াইলাম। গহনা বিক্রয় করিয়া ভাল খাবার সামগ্রী কিনিয়া পরিপাটীভাবে রন্ধন করিয়া নদীতে ভাসাইয়া মনে করিয়াছি তাঁহাকে খাইতে দিলাম। ঠাকুর প্রণাম করিতে গিয়া কখনো মনে হয় নাই ঠাকুর প্রণাম করিতেছি, মাথার কাছে তাঁরই পাদপদ্ম দেখিয়াছি।

তারপর জয়ন্তী—তাঁকে ছাড়িয়া আসিয়াছি। তিনি ডাকিলেন, তবু ছাড়িয়া আসিয়াছি।"

এই বাঙ্গালী রমনী এই যে আকুলভরা ভাবের গভীরতা, ইহাই রমনীর নিজস্ব। ইহাকেই আমি বাসে-প্রবাসে সর্ব্বত্র একইরূপে দেখিয়াছি। এই বিংশ শতকের শেষভাগেও রমনী সেরকমই আছে।

কেন যায় ?

সকলের থাকে ধনপিসী, আমার ছিল পিসীধন। পিতা অষ্টম বর্ষে গৌরী দান করেন, কন্যা নবম বর্ষেই স্বামী হারাইলেন। সেই হইতেই তিনি 'কিন্তু স্বামী গৃহেই রহিয়া যান। পিতৃগৃহে আসিলেন না। যদিও মাঝে মাঝে দুই তিন বৎসর পর পর আসিতেন, আমরা তাঁহাকে যখন দেখিয়াছি, তখন তাঁহার বয়স চল্লিশ বৎসরের কাছাকাছি, দেবরের সংসারে ঘোর সংসারী। মেয়েদের বিবাহ দেন, ছেলেদের "মানুষ" করেন। বড় বাড়ী কাহারও বড়মা, কাহারও কাকীমা, কাহারও জ্যাঠাইমা, খুবই ব্যস্ত সংসারে। তাহার বছর দশেক পরেই শুনি পিসীধন হঠাৎ কাশীবাসী হইয়াছেন, আর সংসারে ফিরিবেন না। ইহার পরই পিসীধনেরও কাশীপ্রাপ্তি হয়।

তাহার পর কতকাল গিয়াছে পিসীধনের কথা ভুলিয়াই গিয়াছি। তবে মাঝে মাঝে মনে হয় বাল্যে সর্বহারা আমাদের পিসীধন আপন গুণে জীবনের মধ্যাহ্নে পরকে আপন করিয়া নিয়াছিলেন। তাঁহাকে কেন জীবনের সায়াহ্নে আবার নূতনভাবে সর্বহারা হইতে হইল ?, কেন তিনি একদিন, এতদিনের, এত আদরের, এত পরিচিত সংসার ছাড়িয়া কাশী গেলেন চোখ বুজিয়া একথা ভাবিতাম, কিন্তু চোখ খুলিয়াই দেখি দুনিয়ার এই তো

নিয়ম। কত বিত্তবান, গুণবান, লোকবলে বলীয়ান, ঘোর সংসারী, সমর্থ পুরুষ—হঠাৎ তার জীবনে কি ঘটিয়া যায়—সে সংসার ছাড়িয়া কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন চলিয়া যায় আর ফিরিয়া আসে না। কেন তারা এইভাবে চলিয়া যায়? ইতিহাসে দেখিয়াছি, রাজা বল্লাল সেন বৃদ্ধ বয়সে পুত্র লক্ষণ সেনের হস্তে রাজ্য ভার অর্পণ করিয়া বাণপ্রস্থ অবলম্বন করেন এবং ত্রিবেণীতে গিয়া সেখানেই দেহ ত্যাগ করেন। রূপ সনাতন মহাপ্রভুর সংস্পর্শে আসিয়া বিলাস বৈভব ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবন চলিয়া যান আর ফিরেন নাই, ঐশ্বর্য্যবান ছাতুবাবু সব ফেলিয়া সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। তবু ইহাদের যাওয়া জানি, বুঝি কেন ইহারা চলিয়া যান। কিন্তু পিসীধনরা কাহার কথায় কেন চলিয়া যান? তারপর কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন অনেক জায়গা আমি ঘুরিয়াছি। বহু লোকের সহিত দেখা হইয়াছে। আজ আমি জানি পিসীধনেরা কেন চলিয়া যান। সে বড় দুঃখের কাহিনী, সে কাহিনী না বলাই ভাল।

হে বন্ধু বিদায়

শৈশবের বন্ধুরা যাহারা শৈশবেই ঝরিয়া গিয়াছে আজ জীবনের শেষে তাহাদের কথা মনে পড়ে। যে ফুল ধরাকে সুন্দর করিতে পারিত সে তো ফুটিলই না, মৃত্যু আসিয়া অকালে একে একে তাহাদের নিয়া গেল। আর বন্ধুদের জন্য রাখিয়া গেল অসীম বেদনা। প্রথমে গেল পরেশ, ঈশ্বর কেরাণীর পৌত্র। ছেলেরা তাহাকে খুবই ভালবাসিত। বাবা ও দাদু তখন মৃত, বিধবা ঠাকুরমা ও মা জীবিত। বংশের একমাত্র দুলাল। তারপর গেল ফড়িংগা, রায়ের বাড়ীর গরীব বাপ মায়ের একমাত্র পুত্র। বয়স ষোল। হরকিশোর লস্করের চতুর্থ পুত্র অক্ষয় গেল চোদ্দ বৎসর বয়সে। বিধবার একমাত্র পুত্র ছকু দশ বৎসর বয়সে মাকে দুঃখ

সাগরে ভাসাইয়া চলিয়া গেল। বন্ধুদের মধ্যে সর্বশেষ গেল "গোল আলু।" ছোট সরকার বাড়ীর রমনী ডাক্তারের বোন কুসুমীর জ্যেষ্ঠপুত্র। পুত্র স্নান করিতে গিয়াছে. মা ভাত বাড়িয়া বসিয়া আছে কিন্তু সে আর ফিরিয়া আসিল না।

আমরা মাটির মানুষ। মৃত্যুকে আমাদের বড় ভয়। মৃত্যু আসিয়া জীবনকে নিয়া যায়। দার্শনিকেরা বলেন জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে কোন ভেদ নাই। এশুধু মাতৃবক্ষে শিশুর স্তন হইতে স্তনান্তরে যাওয়া। শিশু মহাশক্তিতে মাতৃবক্ষে স্তন পান করে, কিছুক্ষণ পরে মাতাই তাহাকে এক স্তন হইতে স্তনান্তরে নিয়া যায়। শিশু যাইবে না কাঁদে। তবু মাতা জোর কবিয়া নিয়া যায়। কিন্তু তাহার পর শিশু কান্না ভুলিয়া যায় আবার মহাশক্তিতে সে ঐ স্তন্য পান করে। কিন্তু দার্শনিক দার্শনিকই, আর আমরা মাটির মানুষ। মৃত্যুকে আমাদের বড় ভয়।

হঠাৎ দেখা পথের মাঝে কান্না আমার থামে না যে।

দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর পর তাহার সঙ্গে আমার দেখা। তবে পথের মাঝেও নয় হঠাৎও নয়। আগে খবর দিয়া তাহার সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম। আমাকে দেখিয়াই তাহার কান্না আর থামে না, সেও কাঁদে আমিও কাঁদি। কথা আর বলা হয় না। পুরাে দিনের কথা ভোলা কি যায়? একসঙ্গে বাগানে ফুল তুলিয়াছি, বকুল তলায় গান করিয়াছি, মাঠে কত খেলা খেলিয়াছি। তারপর একদিন শৈশবের দিনগুলি ফুরাইয়া গেল, পাড়ি দিলাম সংসার সমুদ্রে। যৌবন গেল, প্রৌঢ়ত্বও পিছে রইল। তারপর এই বার্দ্ধক্যে ৫০ বৎসর পরে তাহার সাথে আবার দেখা। সেই ক্ষণিকের দেখা কান্নাতেই ফুরাইয়া গেল। বয়সে সে আমার চাইতে কিছু বড়। তাহার সময় হইয়া আসিয়েছে, আমারও তাই। বিদায়

বেলায় তারাকে শিউলী কহিল "আমি ঝরিলাম তারা," তারা কহিল "আমিও হলেম সারা।" তারপর একদিন সে ঝরিয়া গেল, আমারও সারা হওয়ার দিন আসিয়াছে।

প্রত্যাবর্ত্তন

বিদায় নিয়ে গিয়েছিলাম বারে বারে
ভেবে ছিলুম ফিরব নারে—
এইতো আবার নবীন বেশে
এলাম তোমার হৃদয় দ্বারে।

১৯৩৩ সালে দিল্লী হইতে খুলনা, বরিশাল, ঢাকা হইয়া আমার আত্মীয় বিভূতিকে নিয়া গ্রামে গিয়াছি। ঢাকা হইতে ট্রেনে 'ন' মাইল নারায়ণগঞ্জে, ভাড়া প্রত্যেকের দশ পয়সা। নারায়ণগঞ্জ হইতে কমলাঘাট, মাঝে দুই নদী শীতলক্ষ্যা ও ধলেশ্বরী। শেয়ারের নৌকায় পাড় হইয়া আসিলাম। নদীপথ তিন মাইল। ভাড়া জন প্রতি ছয় পয়সা। কমলাঘাট হইতে পায়ে হাঁটিয়া চারি মাইল পথ, গ্রামে পৌঁছিলাম বেলা ন টায়। শূন্য গ্রাম তবু পথে দেখা হইল গোঁসাই পাড়ার এক ঠাকুরের সহিত। "কিরে কেমন আছস, কবে আইলি?" একটু পরে রমেশ রায়ের সহিত। গ্রাম সম্পর্কে দাদা মহাশয় হইতেন। মজার মজার কথা কইতেন। "কিরে গ্রামটারে এক্কেবারে ভুইলা গেছ্ছো"। আট বৎসর পরে গ্রামে ফিরিলাম। কুমার বাড়ীর মরইনার মার সঙ্গে পথে দেখা। বলিল "ভূইঞা আমাগো বাড়ী যাইও।" পাড়ায় পৌঁছিবার পর নিবারণ ডাক্তারের একটা ঘর হইতে আওয়াজ আসিল "চৈতা নাকি রে?" গিয়া দেখিলাম সুরেশ দাশ, গ্রামের পঞ্চায়েত প্রেসিডেন্ট। প্রণাম করিয়া কথাবার্তা কহিবার পর দাদা মহাশয় ভুবন ভূঞার বাড়ীতে উঠিলাম। খবর পাইয়া পাড়ার বড় দিদিমা, টোনার মা, কৈবর্ত্ত বাড়ীর মহিমার বৌ, মাহিন্দ্রার বৌ, সন্তোষা, অংগেরা, ধনবৌ

কাকিমা সবাই দেখা করিতে আসিল। আট বৎসর পরে গ্রামে আসিয়াছি, দেখিবার বস্তু বই কি। তারপর খবর পাইয়া আরো কত কত লোক আসিল। মহেন্দ্র সরকার আসিল, মণি পিসিমা আসিল, রসিদ দফাদার, প্যারী কুমার কাকা, মহেন্দ্র দপ্তরী, অনেকেই আসিল। কত পুরানো স্মৃতি, কত বিমল আনন্দ। কিন্তু থাকিবার মেয়াদ আমার মোট আট ঘণ্টা। সন্ধ্যা হইয়া আসিল। এখন আমার বাঁধন ছিঁড়িতে হইবে। আবার তারা সবাই আসিল কিন্তু সবারই চোখে জল। সাথে সাথে সকলেই চলিল। পাড়া পার হইয়া গেল তারা কেউ ফিরিয়া যাইতে চায় না—ধরিল না বাহু মোর রুধিলো না দ্বার, শুধু নিজ হৃদয়ের স্নেহ অধিকার প্রচারিল "যেতে আমি দিব না তোমায়" তবু সময় হল শেষ, তবু হায় যেতে দিতে হ'ল। আজ রবীন্দ্রনাথের কথা আমার মনে পড়ে—

যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে—
বাইব না মোর খেয়াতরী এই ঘাটে—
চুকিয়ে দেব বেচা কেনা, মিটিয়ে দেব লেনা-দেনা
বন্ধ হবে আনাগোনা এই ঘাটে
তখন আমায় নাইবা মনে রাখলে
তারার পানে চেয়ে চেয়ে নাইবা আমায় ডাকলে।

তখন কে বলে গো সেই প্রভাতে নেই আমি
সকল খেলায় করবে খেলা এই আমি
নতুন নামে ডাকবে মোরে বাঁধবে নতুন বাহুর ডোরে
আসব যাব চিরদিনের সেই আমি—
তখন আমায় নাইবা মনে রাখলে
তারার পানে চেয়ে চেয়ে নাইবা আমায় ডাকলে।

বনেব পাখী

"শেফালী তোমাব আঁচলখানি বিছাও শারদ প্রাতে" কিন্তু তাহার সেই আঁচল বিছানো কেবল শাবদ প্রাতেরই সম্পদ। মা দশভূজাকে অভ্যর্থনা জানাইতেই এ আঁচল বিস্তৃত হয়। কিন্তু আমার জন্মভূমি যে মা সারা বৎসর শীতে, বসন্তে, গ্রীষ্মে, বর্ষায়, শরতে, হেমন্তে আপন উন্মুক্ত শ্যামল গৃহ প্রাঙ্গণে আপনাব অঞ্চল বিছাইয়া রাখিত। সকালে সন্ধ্যায় দিনে রাত্রে। সন্তানের আগমনের প্রত্যাশায় সে মায়ের বাজিয়া উঠিত কত বিহগ কাকলীর সুর। তাহার অন্তরের অন্তরতম গভীরে বাজিত অসীম স্নেহের সঙ্গীত। তাহার সন্তান আসিয়া সে গভীরেরই খানিক আভাষ পাইত সকলের ভালবাসার মধ্যে। তাহার পর যাইবার সময় শিশুর স্নেহময় বাধা "যেতে নাহি দিব"র মধ্যেও সেই মায়েরই প্রাণের বিচ্ছেদ বেদনার আলোড়ন যেন। চলিয়া যাইতে হইত। কিন্তু এই বিদায়েব স্মৃতিই আবার ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত সদা ভাস্বর হইয়া হৃদয়পটে জাগিয়া থাকিত।

তারপর দেশ গেল। মাকে আমার ছাড়িয়া আসিলাম। আমরা এখন বনের পাখী। যাযাবর, বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াই। আজ এই বন ভাল লাগে, নীড় বাঁধি। এই আসা যাওয়ায় শেফালী তো তার আঁচলখানি বিছাইয়া রাখে না, বিদায় বেলায় শিশুতো আর "যেতে নাহি দিব" বলিয়া তাহার স্নেহের আবদার জানাইয়া যায় না। বনের পাখী আমরা বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াই। কোথাও আপন নীড় বাঁধি না। বনের পাখী বোঝে না যে মায়ের প্রাণের ব্যথা, বুঝি, কিন্তু তার সামাধান খুঁজিয়া পাই না। আমরা পথ হারাইয়া ফেলিয়াছি। তাই পথভ্রান্ত বলিয়া পথে পথে ঘুরি। কেহ আমাকে আপন বলিয়া ডাকে না। আমিও কাহাকে চিনি না।

আমরা বনের পাখী বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াই। আমরা নীড় বাঁধি না।

কি পাই নি তার হিসাব মিলাতে মন মোর নহে রাজী

জীবনে আমরা গ্রাম হইতে অনেক পাইয়াছি।—স্নেহ, দয়া, মায়া গ্রাম আমাদের অকাতরে দিয়াছে। জীবনের প্রধান অবলম্বন শিক্ষা আমরা গ্রাম হইতেই পাইয়াছি। আজ আমি গ্রামবাসীদের কথা এত বিস্তারিত ভাবে লিখিতে পারিতেছি তাহার একমাত্র কারণ গ্রামের সবাই আমাকে ভালবাসিতেন। তাঁহারা সবাই আমাদের জানিতেন এবং আমরা তাঁহাদের সবাইকেই জানিতাম। আজ সেই সব আপনজন জীবনের দিগন্ত অতিক্রম করিয়া চলিয়া গিয়াছেন কিন্তু আমাদের মনের মুকুরে শুধু রহিয়াছে তাঁহাদের সেই ফেলিয়া যাওয়া ছায়াটুকু। সেই ভালবাসার স্মৃতিই আজ বৃদ্ধ বয়সে আমাকে এই অর্ঘ্য রচনা করিতে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। তাই "কি পাই নি" সে হিসাব মিলাইতে এখন আমার মন রাজী নহে।

কি লিখিব আর কি লিখিব না—এই দোটানায় পড়িয়া আমার এই স্মৃতিচারণ আরম্ভ করি। বার্দ্ধক্যের বিস্মৃতির অস্বচ্ছ আবরণ ভেদ করিতে পারিব কি না, এই সংশয় নিয়া মনে অনেক দ্বিধা ছিল। কিন্তু লিখিতে বসিয়া দেখিলাম স্মরণের সমুদ্র সৈকতে অনেক পদচিহ্ন এখনো সুস্পষ্ট, অনেক বালিয়াড়ীর আড়ালে আড়ালে অতীতের অনেক মণিমুক্তা সঞ্চিত আছে। তাহার কিছু আহরণ করিতে পারিয়াছি। সেই চরণ চিহ্ন ধরিয়া চলিতে চলিতে কখন আবার গিয়া পড়িয়াছি দক্ষিণ পাড়ার দীঘির পাড়ে, যেখানে অনেক কালবৈশাখীর পরে "আম টোকানোর" দিনগুলি ভীড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। যেখানে অজস্র বাল্যস্মৃতি আম-কাঁঠালের শাখায় শাখায় মঞ্জরিত আছে। যতটা পারিলাম তাহা লইয়া ভবিষ্যতের

জন্য মাল্য রচনা করিলাম শুধু একটি আশা নিয়া যে আমাদের উত্তর পুরুষ সবটা না হউক, কিছুটা অন্তত সৌরভ পাইবে—তাহাদের মাতৃভূমির কিছুটা পরিচয়। ভবিষ্যৎ অতীতকে শ্রদ্ধা করে না জানি। তবু কালস্রোতের আবর্ত্ত কিছুটা রোধ করিতে চেষ্টা করিলাম মাত্র।

জানি না যুগবিচারে বর্ত্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে ইহার সার্থকতা কতটুকু! তবে আমার মাতৃভূমির কিছুটা পরিচয় লিপিবদ্ধ, করিয়া রাখিতে পারিলাম ইহাই আমার জীবনে এক পরম সার্থকতা।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

সোনারঙ্গ গ্রামের স্মৃতিকথা

১। শ্রীসুরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত (৮৭)

আমি সোনারঙ্গ গ্রামের মুন্সেফ বাড়ীর একজন। ১৮৯৬ সনের শেষ ভাগ হইতে ১৯৪৬ সন পর্য্যন্ত আমি সোনারঙ্গ গ্রামের সহিত জড়িত ছিলাম। এই দীর্ঘকাল ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত থাকার ফলে গ্রামের বহু পরিবর্ত্তন ও উন্নতি আমি দেখিয়াছি। সব এখন মনে পড়ে না, তবে বিশেষ বিশেষ ঘটনাগুলি আজিও স্মৃতিতে অম্লান ভাবে আছে।

ছাত্রজীবন যদিও আমার সোনারঙ্গের বাহিরে অতিবাহিত হয়, কিন্তু আমার কর্ম্মজীবনের সুরু গ্রামের উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকরূপে। এই সোনারঙ্গ উচ্চ বিদ্যালয় ছিল গ্রামের শিক্ষা

ব্যবস্থাব কেন্দ্র স্বরূপ। পূর্ব্বে সোনারঙ্গে নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছিল। কিন্তু ১৯০০ সনে ৺শশীকুমার সেন মহোদয়ের উদ্যোগে সোনারঙ্গ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়। ১৯০৭ সনে বিপ্লবী ৺মাখনলাল সেনের জাতীয় বিদ্যালয় (National School) প্রতিষ্ঠা হওয়ায় সোনারঙ্গ উচ্চ বিদ্যালয়ের অবস্থা খারাপের দিকে যায়। তখন গ্রামবাসীগণ বিশেষ করিয়া যুবক সম্প্রদায় বিদ্যালয়ের অবস্থার উন্নতির জন্য উদ্যোগী হন। দুর্ভাগ্যক্রমে ১৯১৪ সনে স্কুলটি ভস্মীভূত হয়। স্কুলের পূর্ব্বের গ্রন্থাগারটি সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়। শিক্ষার ধারাকে অব্যাহত রাখার এই চেষ্টাতে গ্রামবাসীগণ সর্বসময়ে উদ্যোগী ছিলেন। স্ত্রীশিক্ষার জন্য পাঠশালা পর্য্যায়ের প্রতিষ্ঠান ছিল। পরে ১৯২১ সনে চিন্ময়ী দেবীর উদ্যোগে চিন্ময়ী বালিকা বিদ্যালয়ের গৃহ নির্ম্মিত হয়। প্রথমে উচ্চ মাধ্যমিক ও পরে নিম্ন মাধ্যমিক স্কুলেব প্রতিষ্ঠা হয়। সোনারঙ্গ গ্রামের সঙ্গে ৺অপূর্ব্বচন্দ্র সেনের নাম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। গ্রামের শিক্ষায়তনের জন্য ৺অপূর্ব্বচন্দ্র সেনের দান অসামান্য। সোনারঙ্গ সন্মিলনী নির্মাণে ৺হেমচন্দ্র সেন যথেষ্ট সহযোগীতা করেন। সোনারঙ্গ উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র হীরেন্দ্র সেন ও ক্ষেত্রমোহন দে বৃত্তিলাভ করেন।

এই গ্রাম বৈদ্যপ্রধান। এই বৈদ্যগণ ভূঁঞা, লস্কর, সরকার ও মজুমদার—এই চারিটি শাখায় বিভক্ত ছিলেন ও তাঁহাদের স্থাপিত কুলীনেরা ছিলেন। এই বৈদ্যগণ সূর্য্য সেনের বংশোদ্ভব। ইহাদের খাস জমি ছিল না বলিলেই চলে তবে প্রজা পত্তন ছিল। বৈদ্য সম্প্রদায়ের সহিত কিন্তু ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ সম্প্রদায়ও ছিলেন। ব্রাহ্মণগণের জমি ছিল। গ্রামের প্রান্ত সীমায় ছিল মুসলমানদের বাস। ইহা ছাড়া কৈবর্ত্ত, নমঃশূদ্র, কুম্ভকার, ভুঁইমালী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে

মোটামুটি সদ্ভাব ছিল। গ্রামবাসীদের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল একতা। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় গ্রামে তাঁতশিল্প শিক্ষণের ব্যবস্থা হয়।

সোনারঙ্গ গ্রামের প্রথম পঞ্চায়েতী ব্যবস্থায় এবং পরে ইউনিয়ন-বোর্ডের সঙ্গে জড়িত থাকায় গ্রামের নানা উন্নয়নের ও উন্নয়ন প্রচেষ্টার কথা মনে পড়ে। রায় বাহাদুর ৺ললিতমোহন সেনের সাহায্যে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হয়। ইউনিয়ন বোর্ডের দ্বারা নয়া বাজারের খালের উপর সেতু নির্ম্মাণ, শবদাহের স্থানের ব্যবস্থা, রাস্তাঘাট উন্নয়নের কার্য্য চলে। যখন বৈজ্ঞানিক জগদীশ বসু মুন্সীগঞ্জে আসেন তখন একটি মহতী জনসভা হয়। গ্রামের ৺রত্নেশ্বর সেন উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হইয়া পানীয় জলের জন্য জলাশয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। পূর্ব্বে এই পুষ্করিণীতে প্রতিমা নিরঞ্জন হইত। জলাশয় প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর মুন্সীবাড়ীর দীঘিতে প্রতিমা নিরঞ্জন হইত। খালপাড়ের দেউল বাড়ীতে কিছু ঐতিহাসিক ভগ্নাবশেষ পাওয়া যায়, ঢাকা মিউজিয়ামে তাহা সংরক্ষিত ছিল। আজ দৃষ্টিহীন চোখে জগতের আলো না পৌছাইলেও সোনারঙ্গের দিনগুলির কথা ভাবিয়া বেশ আনন্দ পাই। বিশেষত আজ নগর-কেন্দ্রিক জীবনে সেই গ্রামীন স্মৃতির রোমন্থন পরিচিত প্রিয়জনের সাক্ষাতে রঙ্গীন হইয়া উঠে।

১৭।৮।৬৯ স্বাঃ—সুরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত

২। শ্রীনীরেন্দ্রমোহন সেন (৮৩)

শ্রীনীরেন্দ্রমোহন সেন, সেনের বাড়ীর রায় বাহাদুর ললিতমোহন সেনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং আমাদের অতি শ্রদ্ধেয় মাষ্টার মহাশয়। আমাদের ভাগ্যক্রমে তিনি এখনও জীবিত আছেন। তাঁহার বর্ত্তমান বয়স ৮৩ বৎসর। বি-এ পাশ করিয়া প্রথম জীবনে তিনি আমাদের স্কুলে কিছুকাল (১৯১৩-১৪) শিক্ষকতা করেন, আমি তখন স্কুলের

উচ্চ শ্রেণীর ছাত্র। উত্তর জীবনে তিনি একজন ভাল শিক্ষক রূপে সমগ্র পূর্ব বাংলায় খ্যাতিলাভ করেন। তিনি ২৪.৯.৬৯ তারিখে মধ্যমগ্রাম হইতে লিখেন, '"আমি পাঠ্যজীবনে কিছু দিনের জন্য একবার বাড়ী যাই। তখন মাখনবাবুর প্রভাব কিছুটা দেখি। তিনি রোজ ভোরে দলবল নিয়া স্বদেশী গান গাহিতে গাহিতে গ্রাম প্রদক্ষিণ করিতেন। তারপর এক বৎসর আমি সোনারঙ্গ স্কুলে শিক্ষকতা করি। তখন তুমি দশম শ্রেণীতে পড়িতে এবং আমরা অপাদাদার (অপূর্ব সেন) বাড়ীতে থাকিতাম। আমার মনে পড়ে, সোনারঙ্গ স্কুলঘর যখন আগুনে সম্পূর্ণ পুড়িয়া যায় তখন আমার বড়দাদা ললিতবাবু চাঁদা তুলিয়া প্রায় দেড় হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া স্কুল তহবিলে দেন। আমাদের সোনারঙ্গ-এর মত এত শিক্ষিত ও উন্নত গ্রামে একটা দাতব্য চিকিৎসালয় নাই—ইহা দাদাকে বড় বেদনা দিত। তাই দাদা সম্পূর্ণ নিজ ব্যয়ে আমার মার নামে শ্যামাসুন্দরী দাতব্য চিকিৎসালয়' স্থাপন করেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য-ক্রমে তাহার সকল চিহ্ন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আমার মনে পড়ে, আমার ঠানদিদিকে (বোধ হয় কাশীর রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের বড়মা প্রমদা ঠাকুরাণী) এবং মনে পড়ে মুন্সীবাড়ীর দীঘিতে যে প্রতিমা বিসর্জ্জন হইত তাহা বেশ আকর্ষণীয় ছিল, মহাসমারোহে এই বিসর্জ্জন পর্ব্ব শেষ হইত। লোকের কতই না আনন্দ হইত। আমার আর একটা বিশেষ ঘটনা মনে পড়ে। একবার (আমরা তখন সবাই বাড়ীতে ছিলাম) কামাখ্যা সেন (সাব ডেপুটী) কয়েক-জন কনেষ্টবল নিয়া আমাদের বাড়ী আসেন। আমার বড় বৌঠান (ললিতবাবুর স্ত্রী বিমলাদেবী) কামাখ্যাবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এত কনষ্টেবল নিয়া কোথায় যাচ্ছেন। কামাখ্যাবাবু উত্তর দিলেন যে সোনারঙ্গ স্কুল প্রাঙ্গনে মেয়েদের যে সভা হবে, সে সভা ভাঙ্গিবার

জন্য পুলিশ নিয়া যাইতেছেন। তিনি বলিলেন দরকার হইলে মেয়েদের লাঠি চার্জ করিয়া সভা ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে। বৌঠান ক্রোধভরে কহিলেন, মেয়েদের গায়ে হাত দিবে এত বড় সাহস ও স্পর্দ্ধা তোমার, আচ্ছা যাও। আমিও সভায় যাইতেছি, দেখি আমার গায়ে কে হাত দেয়। কামাখ্যাবাবু আমার বৌঠানকে খুব শ্রদ্ধা করিতেন। তাই তিনি বড় মুস্কিলে পড়িলেন। শেষে ঠিক হইল মেয়েদের লাঠি চার্জ করা হইবে না। তখন বৌঠান নিরস্ত্র হইলেন।

আমার এই বৌঠানই চাঁদপুর পুলিশ ষ্ট্রাইকের (Strike) সময় নিজের গলার মোটা সোনার হার যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্তকে (J. M. Sengupta), দিয়াছিলেন কুলিদিগের উপকারার্থে ব্যয় করিতে। আমার আর কোনও উল্লেখযোগ্য ঘটনা মনে পড়ে না, আমার নিজের স্মৃতিশক্তিও খুব কমিয়া গিয়াছে, যাহা মনে আছে তাহাই লিখিলাম।

২৪-৯-৬৯ স্বাঃ নীরেন্দ্র মোহন সেন

৩। শ্রীঅতুলচন্দ্র সেন (৮৩)

শ্রীঅতুলচন্দ্র সেন বড় লস্কর বাড়ীর শ্রীনাথ সেনের কনিষ্ঠপুত্র এবং রত্নেশ্বর সেনের ভ্রাতুষ্পুত্র। তিনি ১৯০৩ সালে গ্রামের স্কুল হইতে প্রবেশিকা পাশ করেন। পরবর্ত্তী জীবনে তিনি বিলাত হইতে এম, এ, পাশ করিয়া ভারতীয় শিক্ষা বিভাগে যোগ দেন এবং মধ্য প্রদেশের শিক্ষা বিভাগের Director হইয়া কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁহার বর্ত্তমান বয়স ৮৩ বৎসর। তিনি কলিকাতা রাসবিহারী এভিনিউ থেকে লিখিতেছেন—এখন শরীর ভাল থাকে না, মনও ভাল থাকে না, ভেবে চিন্তে কিছু লিখতে পারি না। আমার বয়স এখন ৮৩ বৎসর। সোনারং এম, ই,

স্কুল সম্বন্ধে এই জানি যে, আমাদের পুকুরের পশ্চিম পাড়ে, ৺বৈকুণ্ঠ রায় (যাহার একমাত্র সন্তান ছিল ৺দাক্ষায়ণী মজুমদার) তখন ডেপুটী ইনস্পেক্টর অব স্কুল হিসাবে ক্ষমতাপন্ন ও উৎসাহী ছিলেন। স্কুলটি খুব ভাল ছিল। স্কুল ও ডাকঘরের জন্য তিনি জমি দেন। Grant ইত্যাদি সংগ্রহ করেন। সেই এম-ই স্কুলকে হাই স্কুল করিবার ভার আমাদের পরিবারের উপর ছিল। ইহাতে আমাদের ১০।১৫ হাজার টাকা খরচ হয়। ইহার বেশী খরচ করা সম্ভব ছিল না। বিশ্বম্ভর সেন ও প্রসন্ন সেন তাহার জন্য সস্তায় জমি দেন।

২৯-৮-৬৯ স্বাঃ অতুলচন্দ্র সেন

৪। সতীশচন্দ্র সেন (৭০)

সতীশচন্দ্র সেন নারায়ণ সেন বিশারদের কনিষ্ঠ পুত্র। তিনি গ্রামের স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করেন। শিক্ষা সমাপনান্তে বঙ্গীয় শিক্ষা বিভাগে যোগ দিয়া ডিঃ ইনস্পেক্টর অব স্কুল পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁহার বয়স এক্ষণে ৭০ বৎসর। তিনি উত্তরপাড়া হইতে লিখিতেছেন :

গ্রামের স্মৃতি সম্বন্ধে' আমার বাল্য ও স্কুল-জীবনের কথাই মনে পড়ে। আমাদের গ্রামকে আমাদের ছোটবেলায় সোনারঙ্গ না শুনিয়া সাধারণের মুখে সোনার টঙ্গই শুনিতাম এবং এই নাম হইতেই নাকি গ্রামের নাম সোনারঙ্গ হইয়াছে। সোনা নামক এক কৃষক নাকি সেখানে বসতি স্থাপন করে এবং নিজ শস্যক্ষেত্র পাহারা দিবার জন্য একটা টঙ্গ (উচ্চ মঞ্চ) তৈরী করে। কেহ কেহ আবার বলে এখানে বল্লালী আমলে সোনার আরঙ্গ ছিল এবং ইহা হইতেই এই গ্রামের নাম পরে সোনারঙ্গ হইয়াছে।

নিম্নলিখিত তিনটি বিষয়ে গ্রামের বিশেষত্বের পরিচয় দেয়—
১। এখানে দুইটি অতি প্রাচীন ও উচ্চ দেউল (বৌদ্ধ আবাস)

আছে। এক হইতে পাথরের একটি অতি বৃহৎ স্তম্ভ পাওয়া গিয়াছে। ২। এখানে বহু পুরাতন দুইটি মঠ আছে যাহা অনেকদূর হইতে গ্রামের অবস্থান বিজ্ঞাপিত করে। ইহাদের মুন্সীবাড়ীর মঠ বলা হইত এবং মঠ দুইটিতে কালীমাতা ও মহাদেবের নিত্য পূজা হইত। ৩। গ্রামের প্রান্তভাগে ঢাকা জিলার প্রথম জাতীয় বিদ্যালয় (স্বদেশী যুগে) স্থাপিত হয়। মাখনচন্দ্র সেনের ঐকান্তিক চেষ্টায় স্বদেশী ও বৈপ্লবিক আন্দোলনের তখন ইহা একটি বড় কেন্দ্র ছিল। এখান হইতে অনেক বৈপ্লবিক কার্য্যকলাপ সাধিত হইত। আমি ইহা কতকটা অনুভব করিয়াছি। কারণ আমি ঐ স্কুলের ছাত্র ছিলাম দুই বৎসর, বোধ হয় ১৯০৭-০৯ পর্য্যন্ত। ইহা ছাড়া আমাদের গ্রামে স্বদেশী ও বৈপ্লবিক আন্দোলন দমনার্থে পিউনিটিভ পুলিস-পোষ্ট স্থাপিত হয়। গ্রামের স্কুলগৃহে একবার বিক্রমপুর অম্বষ্ঠ্য সম্মিলনী হয়। গ্রামের বাল্যজীবনের স্মৃতির কথা বলিতে গেলে এই চার জনের কথাই মনে পড়ে—অপূর্ব্বচন্দ্র সেন, ক্ষিতিমোহন সেন, হেমচন্দ্র সেন ও আশুতোষ সেন। আর মনে পড়ে প্রথম স্বদেশী যুগের কথা। পড়াশুনা ও আশুবাবুর আদর্শে ধর্ম্মচর্চার স্মৃতিটুকু খুব স্পষ্টভাবে মনে পড়ে।

আপনি গ্রামের একটা স্মৃতিকথা রাখিয়া যাইতে চান, ইহা খুবই ভাল কথা। কিন্তু যাহা এখন আর আমাদের নাই, ক্রমে উহা চির-অন্ধকারে ডুবিয়া যাইবে। তবে উহার এককালীন অভ্যুদয় ও বৈশিষ্ট্যের কথা লিপিবদ্ধ হইলে ভবিষ্যতে ইহা উত্তরসূরীদের কাহারও কৌতূহল সৃষ্টি করিতে পারে। আমি নিজে সুস্থ থাকিলে এ বিষয়ে আপনাকে আরও সাহায্য করিতে পারিতাম। আমার মনে পড়ে আমি সোনারঙ্গ স্কুলে পাঠকালীন বাৎসরিক সোনারঙ্গ সম্মিলনীতে সোনারঙ্গ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠ করি এবং

সেই জন্য রৌপ্যপদক পাই। আমি এখন অবসর সময়ে কিছু কিছু মনের ভাব কবিতায় প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইতেছি। "মন্দ কবি যশঃ প্রার্থীর" মত হয়তো উহা অসমাপ্তই রহিয়া যাইবে।

২৪-৯-৬৯ স্বাঃ সতীশচন্দ্র সেন

৫। শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (৮৫)

জয় ব্রহ্মসারের আনন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র, পণ্ডিত দীনবন্ধু বিদ্যালঙ্কারের ভ্রাতুষ্পুত্র। তিনি ১৮৯৯ ইং সালে সোনারঙ্গ এম, ই, স্কুল হইতে শেষ পরীক্ষায় বৃত্তিলাভ করিয়া পাশ করেন। পরে ১৯০৩ ইং সালে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল হইতে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করেন। পরীক্ষায় সংস্কৃতে প্রথম হওয়াতে চার বৎসরের জন্য ১০ টাকা করিয়া বিদ্যাসাগর বৃত্তি পান। উত্তরকালে তিনি সাব ডেপুটী মেজিষ্ট্রেট হইয়া কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। বর্ত্তমানে (১৯৬৯ ইং) তাঁহার বয়স ৮৫ বৎসর। তিনি কলিকাতা বালিগঞ্জ হইতে লিখিতেছেন ঃ

তোমার পত্র পাইলাম। ইহা আমাকে আনন্দ, বিস্ময়, সুখ ও দুঃখে অভিভূত করিয়াছে। সুখ ও দুঃখপূর্ণ অনেক অতীত স্মৃতি আজ আমার মনে জাগিতেছে। আমার স্মৃতিশক্তি খুবই প্রবল— আমি তোমাদের কাহাকেও ভুলি নাই। তোমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নরেন আমার সমবয়সী ছিল না, সে আমার বিশেষ বন্ধু ছিল। তাহার অকাল মৃত্যুতে আমরা সকলেই খুব মুহ্যমান হইয়াছিলাম। তারপর তোমাদের কথাও ভাবিয়াছি। বেশী আর কি লিখিব, দুঃখও ভগবানের দান, সুখও তিনিই দেন। পূর্ব্বজন্মকৃত সুকৃতির ফলে, দেবানুগ্রহে—নিজ পুরুষকারে তোমরা সকলেই আজ সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে ও শান্তিতে আছ ইহা খুবই আনন্দের বিষয়। তোমরা সুখে শান্তিতে থাকিয়া সুদীর্ঘ জীবন

লাভ কর ইহাই ভগবানের কাছে আমার আন্তরিক প্রার্থনা।

আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, ৮৫ বৎসর, চোখে কম দেখি দীর্ঘ চিঠি লিখিতে পারিত না। তবুও তোমাকে ধীরে ধীরে চিঠিখানা লিখিতেছি। তারপর খুবই সুখের কথা তুমি সোনারঙ্গ গ্রামের একটা ইতিহাস লিখিতেছ। আমার দীর্ঘ চিঠি লিখিবার শক্তি থাকিলে হয়ত কিছু লিখিতাম। তোমার পত্রে সোনারঙ্গ গ্রামের ব্রাহ্মণদের প্রত্যেক বাড়ীর কথা তোমার যে এতটা মনে আছে তাহা জানিয়া বাস্তবিকই আমি খুবই আনন্দিত হইয়াছি।···তারপর উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বন্ধে একটু বেশী করিয়া লিখিতে পার। তিনি ইংরাজী ও সংস্কৃত দুই ভাষাতেই সুপণ্ডিত ছিলেন। দুই বিষয়েই বি, এ, পরীক্ষার পরীক্ষক হইয়াছিলেন। তিনি দীর্ঘদিন প্রায় ২০ (বিশ) বৎসর বর্দ্ধমান রাজ কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন।

আমাদের বাড়ীর পূর্ব্বদিকে এক বিশাল দীঘি ছিল, তাহার পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে এক বিশাল অশ্বত্থ বৃক্ষ ছিল। ঐ বৃক্ষের মূলদেশে একজন সিদ্ধ যোগীপুরুষ—সাগ্নিক ব্রাহ্মণ অহোরাত্র অগ্নি জ্বালাইয়া রাখিতেন এবং যজ্ঞ করিতেন। তিনি মাঝে মাঝে "জয় ব্রহ্মসার" এই ধ্বনি তুলিতেন। সেই থেকে এই দীঘিও জয় ব্রহ্মসার দীঘি বলিয়া পরিচিত হয়। কালক্রমে এই দীঘির বেশী অংশই শুকাইয়া গিয়াছে, দক্ষিণ দিকে পাট চাষ হয়, মধ্যে কতকটা জল থাকে। সর্ব্বশেষ আমাদের পরিবারের কথা। আমাদের পিতামহ ৺পদ্মলোচন বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মস্থান ছিল বজ্র যোগিনী গ্রামে। আমরা নৈকষ্য কুলীন বলিয়া তৎকালে বিক্রমপুর ব্রাহ্মণ সমাজে আমাদের যথেষ্ট সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল। আমাদের বর্ত্তমান বাড়ীর পূর্ব্ব পুরুষ ছিলেন আমার ঠাকুরমার বাবা নীলকান্ত চক্রবর্ত্তী। তাহারা দুই ভাই ছিলেন, নীলকান্ত ও কমলাকান্ত।

কমলাকান্ত শিরোমণি ছিলেন আমাদের উত্তরের বাড়ীর নগেন্দ্রদের পূর্বপুরুষ। নীলকান্ত অপুত্রক ছিলেন, তাঁহার তিন কন্যা ছিল। তৎকালে শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণগণ নিজের একটি কন্যাকে কুলীন পাত্রে বিয়ে দেওয়া ধর্ম্মানুমোদিত ও শাস্ত্রানুমোদিত মনে করিয়া কুলীন পাত্রে কন্যার বিবাহ দেওয়া একটি গৌরবের কাজ মনে করিতেন। নীলকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার প্রথমা কন্যা গৌরমণিকে পদ্মলোচনের সাথে বিবাহ দিয়া তাহাকে নিজ বাড়ীতে আনিয়া রাখেন।

আমার জ্যেঠা মহাশয় দীনবন্ধু বিদ্যালঙ্কার ও উত্তরের বাড়ীর প্রসন্ন শিরোমণি মহাশয় (কমলাকান্ত শিরোমণির পুত্র) সমবয়সী ছিলেন। উভয়েই কাব্যে ও ব্যাকরণে সুপণ্ডিত ছিলেন। জ্যেঠা মহাশয় বাড়ীতে টোল খুলিয়া ছাত্রদিগকে কাব্য ব্যাকরণ শিক্ষা দিতেন। গ্রামের অনেক বৈদ্য সন্তান যাহারা পরে কবিরাজ হইয়াছিলেন, জ্যেঠা মহাশয়ের টোলে ২।৩ বৎসর অধ্যয়ন করিতেন। কুমিল্লা, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ জেলা হইতে ছাত্র আসিত—আমাদের বাড়ীতে থাকিয়া পড়াশুনা করিত। বিক্রমপুরের দূরস্থিত বালিগাও, গারুরগাও, লাঙ্গলবন্দ, পঞ্চসার প্রভৃতি গ্রামের ছাত্ররাও আমাদের বাড়ীতে থাকিয়া পড়াশুনা করিতেন। আমার যতদূর মনে আছে, একসময়ে ৮।১০ জন ছাত্রও আমাদের বাড়ী থাকিয়া অধ্যয়ন করিতেন।

আমি ৭ [সাত] বৎসর বয়সে সোনারঙ্গ মাইনর স্কুলে ভর্ত্তি হই। সোনারঙ্গ মাইনর স্কুল তৎকালে বিক্রমপুরের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল। প্রতি বৎসরই শেষ গভর্নমেণ্ট পরীক্ষায় এই স্কুল হইতে একজন না একজন বৃত্তি পাইত। আমাদের বারে তিনজন বৃত্তি পায়। ১। নরেন্দ্রনাথ রায়, ইহার বাড়ী ছিল কুমিল্লা শ্যামগ্রামে,

টঙ্গীবাড়ী চক্রবর্ত্তী বাড়ী থেকে স্কুলে আসিত। ২। আমি—শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ৩। মুন্সীবাড়ীর অখিল সেনের প্রথম পুত্র নগেন্দ্রনাথ সেন। দুর্ভাগ্যক্রমে সে এক বৎসর পরেই কলেরাতে চাঁদপুরে মারা যায়। আমি যখন নীচের ক্লাসে ছিলাম তখন হেড-মাষ্টার ছিলেন পশ্চিম বিক্রমপুরের নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য। সোনারং স্কুলে তিন বৎসর চাকুরী করিয়া পুলিশ বিভাগে দারোগার চাকুরী পাইয়া চলিয়া যান। পরবর্ত্তী জীবনে বরিশালের পুলিশ সুপার হইয়া রায় বাহাদুর রূপে অবসর গ্রহণ করেন। তারপর আসেন তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য। তিনিও দু বৎসর পর দারোগার চাকুরী পাইয়া চলিয়া যান এবং ঢাকার পুলিশ সুপার হইয়া কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তিনিও রায় বাহাদুর হন। তারপরে আসেন আড়িয়ল গ্রাম নিবাসী কালীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি খুব ভাল ইংরেজী জানিতেন। তিনি দুই বৎসর কাল সোনারং ন্যাই স্কুলেও হেডমাষ্টার ছিলেন। তিনি বি-এ পাশ ছিলেন না, তাই স্কুল ইনস্পেক্টর আপত্তি করায় তিনি হেডমাষ্টারের কাজ ছাড়িয়া দেন, পরে ওকালতী পাশ করিয়া মুন্সীগঞ্জে উকীল হন। হেড পণ্ডিত হিসাবে ললিত রাউত মাইনর ও হাইস্কুলে কাজ করিয়াছিলেন। তিনি বাংলা ও সংস্কৃত খুব ভাল জানিতেন এবং দুই ভাষাতেই খুব ভাল বক্তৃতা দিতে পারিতেন। গ্রামের সব শ্রেণীর লোকই—নমঃশূদ্র, ধোপা, নাপিত, কৈবর্ত্ত সবাই স্কুলে আসিত।

জয়ব্রহ্মসারের উত্তর পারে তিন ঘর কায়স্থ ও ৫।৬ ঘর কৈবর্ত্ত বাস করিত। কায়স্থদের মধ্যে রজনীকান্ত ধর কালেক্টরীতে কাজ করিতেন ও রাধিকা ধর স্টীমার অফিসে কাজ করিতেন। কৈবর্ত্তদের মধ্যে গৌরচন্দ্র দাস শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি খুব ভাল লোক ছিলেন, সকলের সহিত তিনি ভাল ব্যবহার করিতেন। গ্রামের রায় বাহাদুর

আনন্দচন্দ্র সেন এই গৌড়চাঁদকে খুব ভালবাসিতেন। বৈকুণ্ঠ রায় সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না। তাঁহাকে আমি দেখি নাই। তবে সোনারং মাইনর স্কুল যে তাঁহারই বাড়ীর দক্ষিণ দিকে নিজের জমিতে তিনি স্থাপন করেন ইহা সত্য ঘটনা। বৈকুণ্ঠ রায়ের কন্যা দাক্ষায়ণী ও তাঁহার দৌহিত্র ডাক্তার সত্য মজুমদার স্কুল সম্বন্ধে খবরাখবর নিতেন। বৈকুণ্ঠ রায় মহাশয়ের চেষ্টায় কমলাঘাট হইতে বহর পর্য্যন্ত খালটি হয় – যাহা সোনারঙ্গের পূর্ব দিক দিয়া প্রবাহিত। গবর্ণমেণ্ট ও জিলাবোর্ড ঐ খালটি খনন করে।

২৬-১০-৬৯ স্বাঃ শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

দ্রষ্টব্য ঃ প্রফুল্লবাবু আমার কাছে ভিন্ন ভিন্ন তারিখে যে ৬।৭ খানা চিঠি লিখিয়াছেন, সেই সকল চিঠি হইতে তাঁহার নির্দ্দেশ মত এই প্রবন্ধ সংকলন করিয়া দিলাম।—গ্রন্থকার

৬। শ্রীরমণী মোহন সেন (৯১)

শ্রীরমণী মোহন সেন লস্কর বাড়ীর তারকচন্দ্র সেনের কনিষ্ঠ পুত্র। তিনি রেঙ্গুন হাই কোর্টে এড্ভোকেট ছিলেন। তাঁহার বর্ত্তমান বয়স ৯১ বৎসর। তিনি কলিকাতা হইতে লিখিতেছেন—গ্রাম সম্বন্ধে আমার বিশেষ কিছু লিখিবার নাই। আমাদের পরিবার সম্বন্ধে লিখিতেছি। ঠাকুরমার কাছে শুনিয়াছি আমার বাবা পিতৃ-শ্রাদ্ধ করিয়া কর্মস্থান দেওয়ানগঞ্জ (জিঃ নোয়াখালী) চলিয়া যান। খুব সম্ভব ১৮৮৫।৮৬ সনে সেখান হইতে নিরুদ্দেশ হন। ১৮৯৩ সনে দাদা (ডাঃ অপূর্বচন্দ্র সেন) ও ঠাকুরমা কৈলা পাহাড় হইতে বাবাকে বাড়ীতে নিয়া আসেন। আমি আমার তের বৎসর বয়সে বাবাকে প্রথম দেখি। আমাদের খুড়া মহাশয় (শ্রীরাজেন্দ্র সেন—সোনারং সম্মিলনীর সম্পাদক হিমাংশু সেনের পিতা—লেখক) ১৯০৫ সন পর্যন্ত সংসার চালাইয়াছেন।

ভূঁইঞা বাড়ীর নিবাবণকে বেশ মনে পড়ে। গ্রীষ্মকালে ছুটির সময়ে যখন গ্রামে যাইতাম তখন ক্ষিতি, শীতল, মাখন, নগেন প্রিয়বন্ধু এবং অন্যান্য অনেকের সহিত খুব আড্ডা দিতাম।

আমার মা সুধীরঞ্জন দাশের (সুপ্রীম কোর্টের প্রাক্তন চীফ জাষ্টিস) বড় পিসী ছিলেন।

২৮-২-৭০ স্বাঃ রমণী মোহন সেন

৭। শ্রীপ্রতুলচন্দ্র সেন (৮২)

শ্রীপ্রতুলচন্দ্র সেন ভারতীয় সার্ভে বিভাগে অফিসার ছিলেন। চাকরীর ব্যপদেশে তিনি জীবনের অধিকাংশ সময়ই ভারতের বাহিরে কাটাইয়াছেন। তিনি তাঁহার কলিকাতার বাসস্থান হইতে লিখিতেছেন—

সোনারঙ্গের গৌরবময় ঐতিহ্যের (Rowlatt Committee-র Report-এ মাখন ভিলা) একখানি বহি লেখার প্রচেষ্টায় তোমার সার্থকতা কামনা করি। শৈশব হইতেই নানা স্থানে ঘুরিতেছি, ফলে গ্রামের এবং গ্রামের লোকের সঙ্গে, এমন কি আপন আত্মীয়-পরিজনের সঙ্গেও তেমন যোগাযোগ রক্ষা করিতে পারি নাই। ফলে এ বয়সে (৮২) আপন জনেরও ডাক নাম মনে করিতে পারি না।

২২-৩-৭০ স্বাঃ প্রতুলচন্দ্র সেন

৮। বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (৭৬)

বাঁড়ুজ্যে বাড়ীর প্রিন্সিপাল উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র একাউন্টেণ্ট জেনারেল বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার নিউ আলিপুরের বাড়ী হইতে লিখিতেছেন: আপনার পত্র পেয়ে খুবই সুখী হলাম। আপনার পত্র পড়ে দেখলাম যে আপনি গ্রামের ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় সম্বন্ধে আমার চেয়ে অনেক বেশী খবর রাখেন। আমি গ্রাম সম্বন্ধে কিছু সংবাদ সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম,

কিন্তু ব্যর্থ প্রয়াস হয়েছি। কাজেই আমি আমার বাড়ী সম্বন্ধে যতটা জানি তাই লিখছি। সোনারঙ্গ বাঁড়ুজ্যে বাড়ীর প্রতিষ্ঠাতা দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি দক্ষিণ বিক্রমপুরের লোমসিং গ্রাম হতে সোনারং এসে বাস করেন। তিনি উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মৈমনসিংহে গবর্ণমেণ্টে উকীল ছিলেন। তিনি ধর্মপ্রাণ লোক ছিলেন। ১৯০৬ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়। ২। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ শাস্ত্রী, বিদ্যাবারিধি। প্রায অর্দ্ধ শতাব্দী কাল বর্দ্ধমান রাজ কলেজেব অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি সুপণ্ডিত ও সুবক্তা ছিলেন। মৃত্যু হয় ১৯৪৩ সালে। তাঁহার রচিত বই (ক) Annotated Edition of Goldsmith's Deserted Village. ইনিই বোধ হয় প্রথম ভাবতবাসী যিনি ইংরেজী কাব্য গ্রন্থের Annotated Edition বার করেন। এই বইখানা Text Book হিসাবে বাংলায সব কলেজেই F. A. এবং I. A. ক্লাসে বহু বৎসব ধরেই পড়ান হয়েছে। (খ) সংস্কৃত বই— "প্রবন্ধ প্রসূনম্"। এই বইখানাও Text Book হিসাবে বাংলার সব স্কুলেই পড়ান হয়েছে। (গ) ইনি "সংস্কৃত ভারতী" নামক অতি উচ্চ দরের Anglo-Sanskrit Magazine-এর Editior-Proprietor ছিলেন। ৩। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় M.A, IAAS, J.P., ইনি জীবনের প্রারম্ভে নানা Govt. College-এ ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। পরবর্ত্তী জীবনে তিনি Indian Accounts Service-এ যোগ দিয়া প্রায় ত্রিশ বৎসরকাল কার্য্যের পর অবসর গ্রহণ করেন। তিনি কার্য্যকালে প্রায় দশ বৎসরকাল নানা প্রদেশের Accountant General ছিলেম, কিছুকাল Orissa Govt.-এর Finance Secretary এবং কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের Controller of

Accounts ছিলেন। বর্ত্তমানে তাঁহার বয়স ৭৬ বৎসর। তিনি কলিকাতা নিউ আলিপুরে বাস করছেন। তাঁর অন্যতম প্রবন্ধ "The position of Non-Aryans in the age of Ramayanam" ধারাবাহিকরূপে সংস্কৃত-ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর চার পুত্র (i) শান্তিকুমার, (ii) অরুণকুমার, (iii) প্রণবকুমার Dy Account General, (iv) মিহিরকুমার, সুগায়ক। তাঁর দুই ভ্রাতা প্রফুল্লচরণ ও দীনেশচরণ। উভয়েই Govt. Accounts office-এ চাকুরী করতেন। প্রফুল্লচরণের পুত্র দিলীপকুমার Dy. Magistrate.

১৫-৯-৬৯ স্বাঃ বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

৯। মোহিনী মোহন সরখেল (৮১)

শ্রীমোহিনী মোহন সরখেলের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীঅনিলচন্দ্র সরখেল ভাগলপুর হইতে লিখিতেছেন: শ্রীযুক্ত মোহিনী মোহন সরখেল আমার পিতৃদেব। তিনি আজ গত তিন বৎসর যাবত অসুস্থ। দীর্ঘ দিন রোগ ভোগের জন্য তাঁর স্মৃতিশক্তি অনেকটা লোপ পাইয়াছে। বর্ত্তমানে তাঁহার বয়স ৮১ বৎসর। তাঁকে লেখা আপনার পত্রে জানিতে পারিলাম আপনি তাঁর কাঁছ থেকে সোনারঙ্গ গ্রাম সম্বন্ধে কিছু জানিতে চাহিয়াছেন যা আপনার পুস্তক রচনা সম্বন্ধে সাহায্য করিবে। সেই বিষয়ে জানাই, বর্ত্তমানে যা তাঁহার শারীরিক অবস্থা, তাঁর পক্ষে আপনাকে কিছু জানানো সম্ভব নয় কারণ কোনও বিষয়েই তিনি আর গুছিয়ে লিখিতে বা বলিতে পারেন না।

তিনি আরও লিখিতেছেন: আমি জ্ঞানবয়সে কখনও দেশে থাকি নাই। তবে আমাদের পরিবার সম্বন্ধে মা, বাবা ও পিসীমার কাছে যাহা শুনিয়াছি তাহা আপনার নিকট ব্যক্ত করিতেছি।

আমার পিতামহ আনন্দচন্দ্র সরখেলের পিতার নাম কমলাকান্ত সরখেল। তিনি প্রথম বয়সে গৌহাটীতে ব্যবসা কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন, পববর্ত্তী জীবনে ওকালতি করিয়া প্রভূত অর্থ ও যশের অধিকারী হন। আমাব পিতামহ আনন্দচন্দ্র সবখেল কুচবিহার তুফানগঞ্জ মহকুমাব নিকটবর্ত্তী চিলাখানা নামক স্থানে থাকিয়া প্রতিষ্ঠাবান ব্যবসায়ী হিসাবে বিশেষ নাম কবেন। শেষ জীবনে তিনি দেশেই কাটাইয়া গিযাছেন। আনন্দচন্দ্র সবখেলেব দুই পুত্র ভুবনমোহন ও কনিষ্ঠ মোহিনী মোহন। উভযেই কৃতবিদ্য ছাত্র ছিলেন। স্কুল ও কলেজ জীবনে ববাবব বৃত্তি পাইযাছেন। শিক্ষা সমাপনান্তে ভুবনমোহন কিছুদিন গ্রামেব স্কুলেব প্রধান শিক্ষকের কাজ করেন, পরে পুলিশ বিভাগে কিছুদিন কাজ কবিযা পিবোজপুরে ওকালতি করিতেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র প্রতুলচন্দ্র। বিমল ও প্রশান্ত নামে তার দুই পুত্র। মোহিনী মোহন কুচবিহার কলেজে ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের প্রিয় ছাত্র ছিলেন। শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি আলিপুর আদালতে ওকালতি কবেন। পরে কিছুদিন রঘুনাথপুর হাই স্কুলে প্রধান শিক্ষকেব কাজ কবিয়া. ভাগলপুর T. N. জুবলী কলেজে ইংরাজী অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। এই কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ কবিয়া তিনি ভাগলপুবেই আপন বাস-ভবন নির্ম্মাণ করেন। সেই অবধি আমরা এখানেই আছি। তিনি কলেজে ইংরাজী বিভাগের প্রধান এবং পাটনা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সিনেটের সদস্য ছিলেন। আমরা পাঁচ ভাই অতুলচন্দ্র, অনিলচন্দ্র, পরিমল, অমল ও নির্ম্মলচন্দ্র।

১২-১২-৬৯ স্বাঃ অনিলচন্দ্র সরখেল

১০। শ্রীমতী ভবানীবালা সেনগুপ্তা (৬০)

জন্মভূমি তোমায় আমি প্রণাম করি।
"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী।"

সোনারঙ্গ আমার জন্মভূমি, সোনারঙ্গ আমার স্বর্গ, তাই সোনারঙ্গের কথা আমার মনে হইলেই, 'মা মা' বলিয়া প্রাণ ভরিয়া ডাকিতে ইচ্ছা করে আর আমার মায়েব সাথেই জন্মভূমিরও স্নেহমাখা মধুব সম্পর্ক একই রকম অতুলনীয় স্বর্গীয় আনন্দ মনের মধ্যে ভবিয়া দেয়। তাই মুনি ঋষিদের এই মূল্যবান বাক্য "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী" আমার প্রাণের মধ্যে গাঁথা হইয়া আছে। সোনারঙ্গ গ্রামকে আমার কি রকম ভাল লাগে আর তাকে আমি কি চোখে দেখি তাহা আমি কাহাকেও ভাষায় প্রকাশ করিয়া বলিতে পারিব না।

এই সোনাবঙ্গ গ্রাম হারানোর ব্যাপারেই আজ আমি আকুল হইয়া গ্রামবাসীদের কাছে ঘুবিয়া বেড়াইতেছি। গ্রামবাসীদের সাথে পবিচয রাখার জন্য আর নূতন সোনারঙ্গ গড়িবার জন্য। জানি দুধের সাধ কখনও ঘোলে মিটে না, তবুও একেবারেই যাতে লোপ না পাইয়া যায় সেই জন্যই আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছি। জন্মভূমি, গ্রামেব বাড়ী, বাড়ী-বাড়ীর গৃহদেবতা, গ্রামের জোড়া মঠেব মহাদেব বাবা আর মা কালী, লক্ষ্মী গোবিন্দ, গ্রামের গুরুজন ব্যক্তিরা সবাই মিলিয়া আমাদের আশীর্ব্বাদ করুন, আমরা যেন এ কাজটুকু করিয়া উঠিতে পারি, আর গৃহদেবতাদের ভালভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া আবার নূতন সোনারঙ্গ গড়িয়া তুলিতে পারি। গ্রামবাসীদের কাছে আমার এইটুকুই বিনীত আবেদন তাঁহারা আমার কাজে যেন সহায় হউন। সকলের সাহায্য ব্যতীত কিছুই হইবার আশা নাই। সোনারঙ্গের স্মৃতি বড় মধুর, ছোট বেলার কথা মনে হইলে চোখে জল আসে, আর সেদিন ফিরিয়া আসিবে না, সে মধুর দিনগুলি আর কোথাও খুঁজিয়া পাইব না। ১৩৫০ সনের ভীষণ দুর্ভিক্ষের পরের বৎসর শেষ বার সোনারঙ্গ যাই;

সেবার কলিকাতা যখন ফিরিয়া আসি, তখন তো একবারও ভাবি নাই বাকী জীবনে আমার এই শেষ সোনারঙ্গ দেখা। জানি না শ্রীভগবান কেন আমাদের এই দারুণ দুঃখ দিলেন, চিরকালের জন্য জন্মভূমির সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিলেন।

আমার ছোটবেলা সোনারঙ্গেই কাটে। আর আমার পরম সৌভাগ্য আমি সোনারঙ্গেই বৌ হইয়া অপর বাড়ী যাই। সাড়ে পনর বৎসরেই গ্রাম ছাড়িয়া বৌ হইয়া সেই সুদূর বিহার প্রদেশে ভাগলপুর আমাকে যাইতে হয়। সেইবারেই প্রথম দেশ ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যাওয়ায় খুবই ব্যথা পাই। গ্রাম ছাড়িয়া শহরবাসী হইয়া পড়িলাম। গ্রামের কথা কিন্তু একটুও ভুলি নাই তখনও। প্রতি কাজে, প্রতি ব্যাপারেই বাড়ীর কথা মনে করিয়া কত কাঁদিয়াছি। আর কাঁদিয়াছি ১৯৪৭ সনে আমরা স্বাধীনতা লাভ করার পর। জন্মভূমি হারাইয়া . স্বাধীনতা আসিবে এটাও কল্পনার বাহিরে। যদিও দ্বিতীয় পর্য্যায়ে আমি সোনারঙ্গ খুব বেশী দিন থাকিতে পারি নাই তবুও যখন যাইতাম আর যতদিনই থাকিতাম সে থাকার আনন্দটুকু আর কোন কিছুর সাথেই তুলনা হয় না। সেটুকুই আমার স্বর্গের চেয়েও গরিয়সী, আমার সারা জীবনের পাথেয়।

ছোটবেলার কথা কি মধুর, সকালে উঠিয়া পুকুরে মুখ ধোওয়া, বাগানে ফুল তোলা, বাড়ী বাড়ী হইতেও ফুল আনা, গৃহ দেবতার পূজার জন্য পূজার সাজ করা, ঠাকুরমার জন্য পূজার সাজ করা, পরে লেখাপড়া যেটুকু করা যাইত সেটুকু করা, শীতকালে গাছের নীচে রৌদ্রের মধ্যে বসিয়া পড়া, সেটাও যেন কত আনন্দ ছিল। এই শহরের বাতাসে কি সে-আনন্দ . কেহ পায় বলিতে পারেন? পুকুরে নামিয়া স্নান করার মধ্যে কতই যে আনন্দ ছিল, সে সব

আনন্দ আর এখন কোথায়? গ্রামের ভাই-বোনদের সাথে একত্রে কত খেলাধূলা করিয়াছি। ভাইদের সাথে গাবের আঠা দিয়া ঘুড়ি পর্য্যন্ত বানাইয়াছি। আজকাল সে অনাবিল আনন্দ আর নাই।

বৈশাখ মাসে ছিল ছোট আম সংগ্রহের ধূম। ১লা বৈশাখে গোলৈয়ার মেলা বসিত বড় সরকার বাড়ীর বাহির-বাড়ীর খোলা জায়গায় আর পুকুরধারে। রায়ের বাড়ীর খানিকটা জায়গাতে মেলা বসিত। সারা বছরের আশা আকাঙ্ক্ষার দিনটি হইল এই গোলৈয়ার মেলা ও রথের মেলা। এই মেলাতে কি-ই বা জিনিষ আসিত! গ্রামের মেলা, তাই আমাদের আনন্দের সীমা থাকিত না। দাদু, ঠাকুরমা, দিদিমারা এইসব মেলা উপলক্ষে আমাদের দু-চার আনা করিয়া পয়সা দিতেন তাতেই আমরা সব ভুলিয়া যাইতাম। মনের আনন্দে লাফাইতে লাফাইতে মেলাতে যাইতাম। সেখানে সাধারণত মাটির পুতুল, বাঁশী, ফিতা, চিরুণী, আয়না, ছুরি, কাঁচি, খাবার জিনিষ, তরিতরকারী, মশল্লা এই রকম সব জিনিষ উঠিত। আমার ঠাকুরদাকে দেখিয়াছি, এই গোলৈয়ার মেলা হইতেই সারা বছরের জন্য মশল্লা কিনিয়া রাখিতেন। 'গোলৈয়ার আহ্লাদী' বলিয়া এক রকম পেট মোটা মাটির নাম করা বিখ্যাত পুতুল ছিল। তাহা নিয়া অনেকেই ঠাট্টা তামাসাও করিত। অনেকে আবার ছেলেমেয়েদের তুলনামূলক কথায় বলিত তুই যেন "গোলৈয়ার আহ্লাদী"। শহরের মত তো আর গ্রামে বেশী জিনিষ থাকিত না, তাতেই বা কি আসে যায়, আমরা গ্রামের ভাই-বোনেরা এই সব জিনিষ পাইয়াই আনন্দে আত্মহারা হইয়া যাইতাম।

জ্যৈষ্ঠ মাসে পাকা আম পাওয়ার জন্য আমাদের উৎসাহের সীমা থাকিত না। বানর তাড়াইয়া আম সংগ্রহ করার ব্যাপার বড়ই

কঠিন ছিল। সোনারঙ্গ এদিকে বানরের জন্য খুবই বিখ্যাত। জ্যৈষ্ঠ মাসেই জামাই ষষ্ঠির পূজাও ঘরে ঘরে বেশ ধুমধামে হইত। বাঁশের করুল তোলা ছিল অন্যতম প্রধান অঙ্গ ।

আষাঢ় মাসে আবার রথের মেলা সেই বড় সরকারের বাড়ী আর রায়ের বাড়ীর খোলা জায়গাতেই হইত। বড় সরকারের বাড়ী হইতে রায়ের বাড়ীর নাটমন্দিরের পিছনে রথ টানিয়া নিত। দেশের রথেই দেখিয়াছি নারিকেলের খেলা। নারিকেলের গায়ে কলা মাখিয়া পিছল করিয়া কাড়াকাড়ি করিয়া একজনের কাছ হইতে আর একজন নিত। সেটাই ছিল আনন্দ। তখন দেশে জল আসিয়া সমস্ত জায়গা ভরিয়া যাইত। এ বাড়ী হইতে অন্য বাড়ী যাইতেও অনেক সময় নৌকা ব্যবহার করিতে হইত। বর্ষার সময় নৌকা করিয়া যখন আত্মীয়-স্বজনের বাড়ীতে বেড়াইতে যাইতাম তখন যাতায়াত করার সময়ে জলের ভিতরেও আনন্দ ছিল। ধানক্ষেতের মধ্যে কত পুঁটি মাছের ঝাঁক, নলা (পোনা) মাছের ঝাঁক দেখিতাম। তাতেই বা কত আনন্দ, এ আনন্দ আর কোথায় পাইব !

শ্রাবণ মাসে আমাদের গ্রামের অনেক বাড়ীতেই মনসা মঙ্গল পাঠ করা হইত। বেশীর ভাগ মহিলারাই পাঠ করিতেন। ভাদ্র মাসে প্যারী জ্যেঠা ও মরণ কাকাকে দুর্গা প্রতিমা বানাইতে দেখিতাম আমাদের বাহির বাড়ীর মণ্ডপের ঘরে। কুমোর বাড়ী তো বাড়ীর পাশেই ছিল। যখন যে পূজা হইত আমরা সেখানে গিয়া প্রতিমা বানানো দেখিতাম, তাতে খুবই আনন্দ পাইতাম। জন্মাষ্টমীর পূজাও ঠাকুর ঘরে হইত। এক এক পূজা আসিত আর আমরা খুসীতে আত্মহারা হইয়া যাইতাম। ফুল তোলাই যেন একটা মস্ত কাজ ছিল। দল বাঁধিয়া কাজ করার তখন খুবই উৎসাহের ব্যাপার

ছিল আমাদের। আমরা অনেক সময় মেয়েরা এক বাড়ী হইতে অন্য বাড়ীতে যার যার বাড়া ভাত নিয়া একত্র হইয়া এক সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া পর্য্যন্ত করিয়াছি। তাহাতেই বা কত আন্তরিকতা ও ভালবাসা ফুটিয়া উঠিত, সেসব কথা মনে হইলে এখনও মনটা খুশীতে ভরিয়া উঠে।

আশ্বিন মাসে শ্রীশ্রীদুর্গা পূজায় যে আনন্দ পাওয়া যাইত অন্য কিছুর সাথেই তার তুলনা হয় না। বড় পুকুর বলিতে আমাদের পোষ্ট অফিসের কাছের এই পুকুরটাকেই বুঝাইত। এই পুকুরেই আমরা ছোটবেলায় দশহরার দিন প্রতিমা নিয়া নৌকার খেলা দেখিয়াছি। তখন গ্রামে ৩৫।৪০ খানা পূজা হইত। আমরা সেই পুকুরেরই দুই ধারের রাস্তা দিয়া প্রতিমা আসিতে দেখিয়াছি। নৌকা আসার দুইটি রাস্তা ছিল। ৫১।৫২ বৎসর আগে এই প্রতিমা বিসর্জনের খেলা বন্ধ হইয়া যায়। পরে মুন্সী বাড়ীর দীঘিতে দুর্গা প্রতিমার ভাসান হইত।

পূজার সময়ে পূজার কিছুদিন আগে হইতেই আমাদের একটা মজার ব্যাপার ছিল, বিদেশ হইতে যে কোন বাড়ীর লোকই পূজায় বাড়ী আসিত তাদের দেখিতে আমাদের খুব ভাল লাগিত। কাছাকাছি সব বাড়ীতেই গিয়া দেখিতাম। আনন্দে মন ভরিয়া যাইত। বাড়ী বাড়ী শেফালী ফুলের ও স্থলপদ্মের তখন ছড়াছড়ি। দুর্গা পূজার প্রধান অর্ঘ।

কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসে নানা ঠাকুর দেবতার পূজার মধ্যে আনন্দে মন ভরিয়া থাকিত। এই সময়ই ঠাকুরপাড়া হইতে অনেক লোক দল বাঁধিয়া সন্ধ্যার পর হরি সংকীর্ত্তন গান করিতে করিতে গ্রাম প্রদক্ষিণ করিতেন। তাহা শুনিয়া যে কি আনন্দ পাইতাম বলিতে পারি না। এসবের পুনরাবৃত্তির জন্যই আবার এক সোনারঙ্গ গড়িয়া তুলিতে চাই।

পৌষ ও মাঘ মাসে শীতকালের নানা রকম পিঠা পুলি খাওয়ার ধুম পড়িয়া যাইত। দেশের খেজুরের রসের স্বাদ ছিল অপূর্ব্ব। এ রকম রসের গন্ধ কিন্তু আর কোথাও পাই নাই। শীতকালে প্রচুর মাছও গ্রামের বাজারে উঠিত। তু আনার মাছে 'ডুলা' ভরিয়া যাইত। এখন উহা কল্পনার বাহিরে। এই সময়েই আমাদের দেশে ঘুরি উড়ানোর প্রথা প্রচলিত ছিল। এক গ্রাম হইতে অন্য গ্রামে হাঁটিয়া যাওয়ার মধ্যেও খুব প্রাণবন্ত স্ফূর্ত্তি ছিল। গ্রামের মধ্যে নানা রকম গাছ-গাছড়ার সাথে ফুরফুরে হাওয়াটা গায়ে লাগা খুবই মধুর ব্যাপার ছিল। কলই শাকের ও সরিষার ক্ষেত দেখাও খুব আনন্দদায়ক ছিল। অনেক জায়গায় পলাশ গাছে ফুল ফোটার দৃশ্য দেখিয়া মনটা ভরিয়া যাইত। এই পলাশ ও গেন্দা (গাঁদা) ফুলই ছিল সরস্বতী পূজার প্রধান উপাদান। সরস্বতী পূজার আনন্দটাও স্বপ্নের মতই মনের মধ্যে জাগে। দেশ ছাড়ার পর পলাশ ফুল এ রকম ভাবে দেখি নাই বলিলেই চলে। পাখীর ডাকও শুনি না। সেই "বৌ কথা কও, বৌ কথা কও" পাখী আর পাপিয়া পাখীর মিষ্টি ডাক পূর্ববঙ্গ ছাড়া আর শুনিলাম না। পাপিয়া পাখীর ডাক তবু শুনিয়াছি কিন্তু করুণ সুরে বৌকে কথা বলিতে অনুরোধ করা আর শুনিলাম না এখনও। তাই বাড়ীর কথাই মনে পড়ে খুব, আমার বাড়ী বড় মধুর ছিল। বাড়ীর সাথে আর কোন জায়গারই তুলনা হয় না। এত সুন্দর আর মধুর! মাঘ মাসে আবার অতি ভোরে সূর্য্য উঠিবার আগেই মাঘমণ্ডলের ব্রত করিত মেয়েরা। সে সব ব্রতের ছড়ার সুরগুলি অদ্যাপিও কানে বাজিয়া আছে। মাঘমণ্ডলের ব্রত আর তারার ব্রত গ্রামে প্রায় সব মেয়েরাই করিত আমার মনে পড়ে। পুকুরে লাউল ভাসান ফুলের সাজে-ভরা সারা পুকুরে ভাসিত, দেখিতেও ভাল লাগিত।

ফাল্গুন চৈত্র মাসেও ফুলের বাহার ও পাখীর ডাকই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। দোলের সময় রং নিয়া দুই-তিনদিন খেলা হইত। দোলেরদিন শুকানা আবির একদিন, আর পরের দিন (বুলনীর দিন) জলে রং গুলিয়া খেলা। অনেক দল ছিল। গ্রামের প্রায় সব বাড়ীর ছেলেমেয়েরাই যার যার পরিচিতদের বাড়ীতে গিয়া হৈ-চৈ করিয়া রং খেলিত। বিকালবেলা সব বাড়ীর নারায়ণ নিয়া গোঁসাই পূজার ঠাকুর গ্রামের মধ্যে অনেক বড় বড় রাস্তা ও লস্কর বাড়ীর সেই বড় পুকুরের চারি পার ঘুরিয়া প্রদক্ষিণ করিতেন। ছেলেমেয়েদের দল ঐ সঙ্গেই যাইত। আমরাও কত বার সেই সঙ্গে গিয়াছি। বার মাসের তের পার্বণ তো ছিলই গ্রামে, তাতে কত আনন্দই না পাইত সবাই।

সোনারং গ্রাম সব রকমেই যেন সেরা মনে হইত। মনে হইত সব বিষয়ে সে ভরপুর ছিল। রূপে গুণে সব জায়গাই সমান কিন্তু আমাদের সোনারঙ্গ গুণের দিকেই বেশী ছিল। অনেক উচ্চ স্তরে অনেকেই চাকুরী করিতেন এখনও করেন। লেখাপড়াতেও অনেকেই শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছেন ও ছিলেন। অফুরন্ত কথা মনে জাগে, কিন্তু প্রকাশ করার ক্ষমতা আমার নাই।

"হে ভগবান!
তোমারে কোটি কোটি প্রণাম,
মোদের ফিরায়ে দাও
মোর 'সোনারঙ্গ'।"

১-১-৭০

স্বাঃ ভবানীবালা সেনগুপ্তা
রামধন মিত্র লেন, কলি-৪

১১। ডাঃ অবলাকান্ত সেন (৭০)

অনেক দিন যাবত মনে একটা ইচ্ছা ছিল সোনারঙ্গের ইতিহাস রচিত হউক। সে জন্য অনেককে অনুরোধ করেছি, কেহ কান দেন

নাই। তাই প্রফুল্ল যখন ইতিহাস লিখার ইচ্ছা প্রকাশ করল তখন খুব খুশী হলাম। চৈতা (শ্রীপ্রফুল্লনাথ সেন, ডাক্তার) আমার বাল্যবন্ধু, সহপাঠী, খেলার সাথী, জ্ঞাতি কাকা, পরে বিবাহ করিলেন আমার এক মাসীমাকে। তার সঙ্গে জড়িয়ে পরলাম নানা রকমে। সে আমাকে অনুরোধ করল কিছু লিখতে, আমার সোনারঙ্গের স্মৃতি। লিখতে বসলাম যদিও আমার লিখার ক্ষমতা নাই এতটুকুও।

বাড়ী ছেড়েছি ১৯৪২ সনে, সোনারঙ্গেরও অনেক কথা ভুলে গিয়েছি। আমার জন্ম সোনারঙ্গে, তাই সোনারঙ্গের জন্য প্রাণ এত কাঁদে। সোনারঙ্গকে আমি খুব ভালবাসি। সেখানকার সবকিছুই আমার প্রাণে আনন্দ দেয়। ভালবাসি আমার ভারতবর্ষকে। সেই আমার অতি সুন্দর ভারত অসৎ দুশমনদের চক্রান্তে ভেঙ্গে টুকরো হয়ে গেল। সৃষ্টি হল পাকিস্তান। বিদেশীরাজ যাবার সময় সৃষ্টি করে গেল কতকগুলি শয়তান। তাই আজ দেশ ভরে গেছে শয়তানীতে, অসাধুতায়। সৎলোক খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

সিদ্ধ পুরুষ মহাত্মা সূর্য্য সেন সোনারঙ্গ গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। তিনি রাজা শ্রীহর্ষ সেনের বংশধর, অধস্তন চতুর্দ্দশ পুরুষ। আমিও মহাত্মা সূর্য্য সেন হইতে চতুর্দ্দশ পুরুষ অধস্তন। রাজা শ্রীহর্ষ সেনের নিবাস ছিল বীরভূম জেলার সেনভূম গ্রামে। আমার পিতৃদেব ৺প্রিয়কান্ত সেন, বীরভূম জেলার রামপুরহাটে থাকাকালীন (১৯০৭-৮ খৃঃ) একবার সেনভূমে গিয়েছিলেন। তখন সেখানে কয়েক ঘর বৈদ্যের বাস দেখেছিলেন। শুনলেন ম্যালেরিয়ায় গ্রাম শূন্য হয়ে গিয়েছে। আমার ৺পিতৃদেবের নিকট শুনেছি তিনি সাধক সূর্য্য সেনের পঞ্চমুণ্ডী আসনের

ধ্বংসাবশেষ দক্ষিণ পাড়ার জঙ্গলের পশ্চিম দিকে দেখেছেন। সাধক সূর্য্য সেন নিত্য দুর্গা পূজা করতেন। সেজন্য দুর্গা পূজা পদ্ধতিকে কিছু সংক্ষেপ করে নিয়েছিলেন। তাঁহার বংশধররা সেই পদ্ধতি অনুসারে পূজা করেন।

সোনারঙ্গ বিক্রমপুরের মধ্যে তথা ভারতবর্ষের মধ্যে একটি বিখ্যাত গ্রাম ছিল। আমাদের গ্রামে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, কুম্ভকার, কৈবর্ত্ত, নমশুদ্র, ঋষি প্রভৃতি নানা বর্ণের হিন্দু ও কয়েক ঘর মুসলমান বাস করতেন। বিক্রমপুরের বৈদ্য প্রধান গ্রামগুলির মধ্যে সোনারঙ্গ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল।

সুন্দর জীবন যাপনের জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন—অন্ন, বস্ত্র, গৃহ, শিক্ষা, ধর্ম্ম, চিকিৎসা ইত্যাদির ব্যবস্থা সবই ছিল সোনারঙ্গে। প্রতি বাড়ীতে প্রাতে ও সন্ধ্যায় বেজে উঠত নারায়ণ পূজার শঙ্খ ধ্বনি। মুন্সী বাড়ীর সুউচ্চ জোড়া মঠে ছিল মা কালী ও বাবা শিব। নিত্য পূজা হত মহা সমারোহে। প্রায়ই পাড়ায় পাড়ায় হত হরি সংকীর্ত্তন, হরির লুট, প্রসাদ খেতে খেতে বাড়ী ফিরতাম রাত্রিতে।

আমাদের উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ও চিন্ময়ী বালিকা বিদ্যালয় ছিল। বহু ছাত্র ওখান থেকে পাশ করে উন্নতির উচ্চ শিখরে উঠেছেন। এই গ্রামে শিক্ষিতের সংখ্যা খুব বেশী ছিল যাহা একটি গ্রামের পক্ষে বড়ই প্রশংসার বিষয়। এক বৎসর কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় হতে আমাদের গ্রামের পাঁচটি মেয়ে বি-এ, ও দুইটি মেয়ে এম-এ পাশ করেন। সে বৎসর ৺রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 'প্রবাসী'তে লিখেন—একটি গ্রাম হইতে সাতটি মেয়ে এক বৎসরে বি-এ ও এম-এ পাশ করা বিশ্ব রেকর্ড। বি-এ, এম-এ, পি. আর. এস., পি. এইচ. ডি., আই. সি. এস., আই. এ. এস.,

বার. এট্-ল, এম. বি, বি. ই, ডি ফিল, এম আর. সি ও. জি, এফ. আর সি. এস, Ph C, D. Bio, B L. ইত্যাদি সোনারঙ্গে সবই আছে। বাংলার প্রথম মেয়ে পি, আর, এস শ্রীযুক্তা বিভা সেন (এখন মজুমদার) আমাদের গ্রামের মেয়ে। এক সময় কলিকাতায় মেডিকেল কলেজে এগারটি ছেলে প্রথম বর্ষ থেকে ষষ্ঠ বর্ষের মধ্যে পড়ত।

স্বাধীনতা যজ্ঞেও সোনারঙ্গের দান বড় কম নহে। রাউলেট কমিটির রিপোর্টে সোনারঙ্গের নাম উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা আছে। ৺মাখনলাল সেন সোনারঙ্গে ন্যাশন্যাল স্কুল স্থাপন করেছিলেন। তিনি, ৺ললিত বারড়ী, ৺অতুল সেন, তাঁহার ভ্রাতা মনীন্দ্র সেন, শ্রীশান্তিগোপাল সেন প্রভৃতি প্রয়োজন হলে প্রাণ দিতে কুণ্ঠিত ছিলেন না। নিবারণ' সেনের পুত্র ত্রিপুরা সেন চট্টগ্রাম আর্মারী রেইড-এ জীবন দেন। তাঁদের অনেককেই ইংরাজ সরকারের অতিথি হয়ে অনেক দিন কাটাতে হয়েছে। তাঁদের প্রতি অশেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

সবারই খাওয়া পড়া, মাথা গোজবার স্থান মোটামুটি ছিল। আমাদের গ্রামের বাজার যদিও আয়তনে বেশী বড় ছিল না তথাপি সেখানে মাছ খুব বেশী উঠত এবং অন্যান্য জিনিস সবই বেশ উঠত। বাজার খুব সকালেই মিলত। আশে পাশের গ্রাম থেকে অনেকে এখানে বাজার করতে আসত।

১৯২১ সনে ডাঃ কালীমোহন সেনকে সভাপতি, অধ্যাপক হেমচন্দ্র সেনকে সম্পাদক এবং আমাকে সহঃ সম্পাদক করে 'সোনারঙ্গ সম্মিলনী' স্থাপিত হয়। কলিকাতার ১নং রাজা লেনের মেসে থাকাকালে আমার মনে একটি সম্মিলনী করার ইচ্ছা জাগে। আমি তাহা অনতিবিলম্বে গ্রামবাসীদের মধ্যে প্রকাশ করি এবং

তাঁহাদের আন্তরিক সমর্থন লাভ করি। কালবিলম্ব না করিয়া সম্মিলনী স্থাপিত হয়। আজও সেই সম্মিলনী নানা দুর্যোগ ও বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে। কলিকাতাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে সম্মিলনী। সোনারঙ্গ গ্রাম থেকে শুরু করে ভারতের নানা স্থানে তার কর্ম্মক্ষেত্র ছড়িয়ে পড়ল।

সম্মিলনীর কাজে অপূর্ব্ব সাড়া পাওয়া গেল, এগিয়ে এলেন আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সবাই। ইহার উদ্দেশ্য ছিল গ্রামের সর্ব্ব প্রকার উন্নতি করা, তাই টাকা যাহা আদায় হ'ত সোনারঙ্গের কল্যাণেই তাহা খরচ হ'ত।

রায়ের বাড়ীর সুশীল সেন (পাগল) সম্মিলনী পরিকল্পনায়, সুষ্ঠু পরিচালনায় এবং উন্নতিকল্পে আপ্রাণ চেষ্টা করেন। পাগল আমার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিল। তাহার অকাল মৃত্যুতে সম্মিলনীর যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে। তাহার আত্মা সদ্‌গতি লাভ করুক। কালীপ্রসাদ সেন ঢাকা শাখার ভার নিয়া উহার যথেষ্ট উপকার করেন। গ্রামবাসী সকলের সমবেত চেষ্টায় উহা এগিয়ে চলল।

সম্মিলনীর দ্বারা ডাঃ তারক সেনের পরিচালনায় গ্রামে একটি দাতব্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয় স্থাপিত হয়। পরবর্ত্তীকালে ললিত মোহন সেনের অর্থানুকূল্যে সম্মিলনী কর্তৃক 'শ্যামাসুন্দরী দাতব্য চিকিৎসালয়' স্থাপন করে আর্ত্তের সেবার ব্যবস্থা করা হয়।

ইহা 'অপূর্ব পাঠাগার' নামে অপূর্ব কাকার স্মৃতি রক্ষার্থে একটি পাঠাগার স্থাপন করে। গ্রামবাসীগণ তাহারই সুষ্ঠু পরিচালনা করেন।

১৯৩০ খৃঃ সম্মিলনীর চেষ্টায় মুন্সেফ বাড়ীতে শিল্প প্রদর্শনী করা হয়। তখন বেতারের প্রথম যুগ, সুদূর পল্লী অঞ্চলে প্রদর্শনী

প্রাঙ্গনে বেতার সঙ্গীত ধ্বনিত হয়েছিল সেদিন। এই প্রদর্শনীর সফলতার মূলে ছিল প্রদর্শনীর সুযোগ্য সম্পাদক ডাঃ সতীন্দ্র কুমার সেন এবং সভাপতি প্রিয়কান্ত সেনের অপূর্ব্ব কর্ম্ম দক্ষতা আর উমাচরণ ব্যানার্জী, ডাঃ কালীমোহন সেন, চিন্ময়ী দেবী, মহামায়া দেবী, উত্তমাসুন্দরী দেবী, বগলা দেবী ও অন্যান্য গ্রামবাসীদের ঐকান্তিক সহযোগিতা। বেতাব পরিচালনাব জন্য কালীসাধন সেন বিশেষ শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। কালীসাধনের মামাতো ভাই, কলমা নিবাসী বামানন্দ দাশগুপ্ত বেতার পরিচালনায় খুবই সাহায্য করেছিলেন। শিল্প প্রদর্শকদের পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল।

সম্মিলনীর একটি নাট্যাভিনয়ের শাখা ছিল। গ্রামের ছেলেরা প্রতি বৎসর গ্রীষ্ম ও পূজাবকাশে অভিনয় করত। এই নাট্য আন্দোলনের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত ছিল অতুলানন্দ রায়, ব্রজেন দাশগুপ্ত, রমেশ চন্দ্র রায়, সুরেশ চন্দ্র রায়, সুধীর চন্দ্র সেন সন্তোষ সেন, যদু বারড়ী, জগদীশ চন্দ্র সেন, অসিত চন্দ্র সেন, মুরারী মোহন সেন প্রভৃতি নাট্যামোদীরা। আমাদের গ্রামে অবিনাশ সেন রায়, চারুচন্দ্র সেন প্রভৃতি কয়েকজন অভিনেতা ছিলেন যাঁদের বাংলার যে কোনও উচ্চাঙ্গ অভিনেতাদের সহিত তুলনা চলতে পারে। মনে পরে একবার অল্প বয়সী মেয়েরা অতি সফলতার সহিত দক্ষিণ পাড়ায় নাট্যাভিনয় করেছিল।

সাহিত্য চর্চার জন্য হাতে লেখা 'সোনারঙ্গ' নামে একটি মাসিক পত্রিকা বের হত। সুবোধ সেন রায়, সুশীল সেন, সত্যেন সেন (লস্কর) মুরারী সেন, অমলেন্দু দাশগুপ্ত প্রভৃতি উৎসাহী লেখক ছিলেন। শ্রীমতী ইন্দিরা সেন, স্মৃতি সেন প্রভৃতি গ্রামের মেয়েরা পত্রিকার অঙ্গ সজ্জা করতেন।

সম্মিলনী যখন দ্রুত অগ্রগতির পথে চলেছে তখন আরম্ভ হ'ল রণ দেবতার তাণ্ডব, দেশ ভাগ হল রণের শেষে। আমরা ছড়িয়ে পড়লাম নানা জায়গায় নিরাশ্রয় হয়ে। শ্রীমতী ভবানী সেনগুপ্তার একান্ত আগ্রহে পুনরায় সোনারঙ্গ গড়ার জন্য সবাই লেগে পড়ল। সোনারঙ্গ কলোনী কো-অপারেটিভ সোসাইটি করা হল, শ্রীক্ষিতীন্দ্র নাথ সেনকে সভাপতি ও শ্রীহিমাংশু রঞ্জন সেনকে সম্পাদক এবং শ্রীসদাশিব সেনকে কোষাধ্যক্ষ, শ্রীধীরেন্দ্র মোহন দাশগুপ্ত ও মানবেন্দ্র সেনকে সহঃ সম্পাদক করে। বর্ত্তমান সম্পাদক রমাকান্ত পাড়ার শ্রীবিমলেন্দু সেন। হাওড়া জেলার 'শাঁকরাইলে' ৫ বিঘা জমি কিনা হযেছে, আরও কিনবার চেষ্টা চলতেছে। সোনারঙ্গ-বাসীরা সকলে এগিয়ে আসুন।

পূজা পার্বণাদি সবই আমাদের গ্রামে হত। ৺পিতৃদেবের নিকট শুনেছি তিনি বাল্যকালে গ্রামে ১০৭ খানা দুর্গা পূজা দেখেছেন। আমি গ্রাম ছাড়ার পূর্ব্বে ১৭ খানা পূজা দেখেছি। গত ১০ বৎসর যাবত কলিকাতায় মা দুর্গার অর্চ্চনা হচ্ছে। সে বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা উৎসাহী শ্রীমতী ভবানী দেবী ও সম্মিলনীর সম্পাদক শ্রীহিমাংশুরঞ্জন সেন। কবিরাজ বাড়ীর কুমুদিনী দেবী, বিশারদ বাড়ীর চারুদেবী, লস্কর বাড়ীর রাণীবালা দেবী, লখার বাড়ীর প্রতিমা দেবী, অরুণা দেবী ও তাহার কন্যারা, জ্যোৎস্না রায়, শকুন্তলা দেবী প্রভৃতি মহিলারা এবং অরুণ সেন, কামাখ্যা সেন, রবি রায়, সমর সেন, বরেণ সেন, অজিত সেন (মণ্টু) প্রভৃতি মহাশয়গণ যথেষ্ট সাহায্য করেন।

সোনারঙ্গ সম্মিলনীর প্রাক্তন ও বর্ত্তমান সভাপতি ও সম্পাদকগণ—কালীমোহন সেন, প্রিয়কান্ত সেন, হেম সেন, প্রফুল্ল সেন, ক্ষীরোদ রায়, অমূল্য সেন, ক্ষিতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত,

প্রমোদ সেন, ডাঃ সতীন্দ্রকুমার সেন, অবলাকান্ত সেনগুপ্ত, অকিঞ্চনকুমার সেন (বর্ত্তমান সভাপতি)।

সম্পাদকগণ—হেম সেন, উপেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (মুন্সীপাড়া), নলিনীকান্ত সেনগুপ্ত, ক্ষীরোদ রায়, সতীন্দ্রকুমার সেন, অবলাকান্ত সেনগুপ্ত, হিমাংশুরঞ্জন সেনগুপ্ত বর্ত্তমান সম্পাদক)।

সম্মিলনীর উন্নতির জন্য নৃপেন্দ্রনাথ সেন মুন্সীবাড়ী), বিনোদ-সেন প্রফুল্ল সেন বিশারদ, সত্যরঞ্জন সেন, সর্ব্বশ্রী চিত্তরঞ্জন সেন, হরিসাধন সেন, অরুণকান্ত সেনগুপ্ত, গোবিন্দ গুপ্ত, ফণীভূষণ সেন, কেশব সেন, রবীন্দ্র সেন (উলুবাড়ী ', রবি রায, কালীসাধন রায়, অমলানন্দ সেন, শঙ্কর সেন (১), শঙ্কর সেন বিশারদ (২), জীতেন সেন ভূঞা প্রভৃতির বুদ্ধি ও শ্রমদান অমূল্য। গ্রামের মেয়ে, ছেলে, তাঁদের সন্তানাদি যে কেহ সোনারঙ্গকে ভালবেসে তার উন্নতির চেষ্টা করেছেন, করছেন এবং করবেন তাদের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ।

শ্রীযুক্তা অনুপমা দেবী, সর্ব্বশ্রী সুরেশ দাশগুপ্ত, অতুল সেন লস্কর, নীরেন্দ্রমোহন সেন, নরেন্দ্রনাথ সেন, বামাচরণ ব্যানার্জী, প্রফুল্ল বন্দ্যোপাধ্যায়, রমণী সেন লস্কব প্রভৃতি অশীতিপর বৃদ্ধা ও বৃদ্ধগণ যাঁরা এখনও আমাদের মধ্যে আছেন তাঁদের শতায়ু কামনা করি ভগবানের চরণে। তাঁদের বুদ্ধি ও পরামর্শ দিয়ে আমাদের উন্নত করুন। তাঁদের অসীম জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা জগতের কল্যাণ করুক।

নিতাই সাধু (চিন্তাহরণ সেন) ও তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহাপণ্ডিত আশুতোষ সেনের ন্যায় সৎ ও সাধু প্রকৃতির লোক অতি বিরল। আমার ঠাকুরদাদা, বাবা, কাকাদের সাধু ও অতি সৎলোক বলে খ্যাতি ছিল। আমার সুন্দর খুড়া (যামিনী কাকা) ডাক্তার ছিলেন। তাঁকে দেখেছি রোগী দেখতে গিয়ে রোগীর দরিদ্রাবস্থা দেখে টাকা

নেওয়ার পরিবর্ত্তে ঔষধ পথ্যাদির জন্য আরো টাকা দিয়ে এসেছেন। আমার ছোটখুড়া ডাঃ সুধীর সেনও সুন্দর খুড়ার পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন। অতি ভক্তি ভরে তাঁদের প্রণাম করি।

আমার আন্তরিক বিশ্বাস আমরা আবার মিলে যাব এক সঙ্গে। প্রেম, ভালবাসা জুড়ে দিবে ভাঙ্গা ভারত। বল প্রয়োগে কিছু হবে না। হাঁ-হাঁ করে ছুটে আসবে অনেক বিদেশী দরদী, যেন পৃথিবী রসাতলে গেল। সত্যের জয় একদিন হবেই।

সবই ভগবানের লীলা। তিনি এক হয়েও বহু, বহু হয়েও এক। সবই সেই এক। 'সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর।'

কথা হল শেষ—

রয়ে গেল বহু কথা, বহু ব্যথা.

অন্তরের নিভৃত সে কোণে—।

১-১-৭০ স্বাঃ অবলাকান্ত সেনগুপ্ত

ছোট উত্তর পাড়া

১২। অতুলচন্দ্র দাশগুপ্ত (৮২)

আমার জন্ম সোনারঙ্গ। নয় বৎসর বয়স পর্য্যন্ত গ্রামেই ছিলাম। আমাদের গ্রামে তখন কোন হাই স্কুল না থাকার দরুণ হাই স্কুলে পড়িবার নিমিত্ত দশ বৎসর বয়সে অন্যত্র যাই। গ্রামের বাহিরে থাকাকালীন বৎসরে তিন বার গ্রামে আসিতাম। গ্রীষ্মের ছুটি, পূজার ছুটি, বড়দিনের ছুটিতে। তারপর যুবক সময়ে আনুমানিক এক বৎসর কাল (১৯০৯-১০) গ্রামের হাই স্কুলে শিক্ষকতা করি। তৎকালীন গ্রামের জীবন, সামাজিক অবস্থা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সম্বন্ধে ব্যক্তিগত ভাবে যাহা দেখিয়াছি তাহাই নিম্নে উল্লেখ করিতেছি।

শিক্ষা ঃ—আমাদের গ্রামে বিদ্যার অনুরাগ প্রথম হইতেই ছিল। গ্রাম-হিতৈষীদের চেষ্টায় গ্রামে ছেলেদের শিক্ষার্থে মাইনর স্কুল, পাঠশালা ও সংস্কৃত টোল ছিল। বালিকাদের শিক্ষার জন্য বালিকা বিদ্যালয় ছিল। পরে ১৯০১ সালে আমাদের মাইনর স্কুলটিকে হাই স্কুলে উন্নীত করা হয়। এই সকল বিদ্যালয়ের বহু কৃতী ছাত্র ভবিষ্যৎ জীবনে প্রভূত খ্যাতি লাভ করেন। ইহাদের মধ্যে নাম করা যাইতে পারে ডাঃ হর্ষনাথ সেন প্রফুল্ল ব্যানার্জী সাব ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, অমৃতলাল মজুমদার উকিল, অতুল সেন আই, ই, এস অধ্যাপক প্রমোদ সেন, সুকুমার সেন আই, সি, এস, ডাঃ ধীরেন সেন পি, এইচ, ডি, ডাঃ মেজর পি, এন, সেন, হরেন বাবড়ী সাব ডেপুটী, বিখ্যাত ব্যবসায়ী বি, এম, সেন ইত্যাদি।

আমোদ প্রমোদ ঃ—গ্রামে ভারতী নাট্য সমিতি নামে এক থিয়েটার পার্টি ছিল। বিজয় বসন্ত নাটকে মহারাজের ভূমিকায় অভিনয় করিয়া মুন্সী বাড়ীর অখিল সেন 'মহারাজ' নামে পরিচিত ছিলেন। পরবর্ত্তীকালে চারু রায় এই থিয়েটারে খুব নাম করেন।

ক্রীড়া ঃ—গ্রামে ফুটবল ও ক্রিকেট খেলা হইত। মাঝে ব্যাটমিণ্টন ও টেনিস্ খেলাও আরম্ভ হইয়াছিল।

পূজা পার্বণ ঃ—পূজা পার্বণ উপলক্ষে যাত্রাগান, রামায়ণ গান ও নীল পূজা উপলক্ষে গাজন গান, লোকনৃত্য ও নানা রকম বহুরূপীর খেলা প্রচলিত ছিল। মনে পড়ে বিজয়া দশমী ভাসানের অতুলনীয় দৃশ্য। প্রত্যেক বাড়ীর প্রতিমা বড় নৌকায় উঠাইয়া লস্কর বাড়ীর বড় দীঘিতে নাচ, গান, বাজনা আরতির সহিত একে একে বিসর্জ্জন হইত। তারপর শান্তিজল ও কোলাকুলির পালা। কি অপার ভক্তির সহিত ছোটরা বড়দের পদধূলি মস্তকে লইয়া প্রণাম করিত।

কি অসীম স্নেহে গুরুজনেরা আশীর্ব্বাদ করিতেন। গ্রামে রথযাত্রা হইত। বাঁশ, কাঠ ও লোহার চাকা দিয়া সুন্দর রথ প্রস্তুত হইত। এই উপলক্ষে মেলা বসিত। রথ ও মেলা আমাদের বাড়ীর বাহিরের দিকে হইত। পহেলা বৈশাখ 'গলইয়া' নামে এক মেলা এক দিনের জন্য বসিত। ইহাও আমাদের বাড়ীর বর্হিভাগে বসিত।

স্বদেশী আন্দোলন ঃ- জাতীয় আন্দোলনে সোনারঙ্গ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। জাতীয় সঙ্গীত গাহিয়া ছেলেমেয়েরা বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া বিদেশী দ্রব্য বর্জ্জনের প্রতিশ্রুতি চাহিতেন। স্বনামধন্য মাখনলাল সেন National School প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার পরেই সরকারী কর্তৃপক্ষ গ্রামের উপর নানা রকম অত্যাচার আরম্ভ করেন। ধর-পাকড়, খানা তল্লাসী, Punitive Tax ইত্যাদিতে গ্রামবাসীদের জীবন অতিষ্ঠ হয়। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে ৩০শে আশ্বিন রাখী বন্ধন পালিত হইত এবং প্রত্যেক গৃহে অরন্ধন পালিত হইত। এই অকৃত্রিম দেশপ্রেমের জন্য সোনারঙ্গ গ্রাম তদানীন্তন সরকারের বিষ নজরে পড়ে, এমন কি এই গ্রামের বাসিন্দা হইবার অপরাধে কোনও ব্যক্তিকে সরকারী চাকুরী হইতে বঞ্চিত করিবার ভীতি প্রদর্শন করা হয়। এই গ্রামের অধিবাসীদিগের তেজস্বিতা, নিঃস্বার্থপরতা, স্বদেশপ্রেম ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা বাংলার জাতীয় নেতৃবৃন্দের বহু বার উচ্চ প্রশংসা পাইয়াছে। আমার খুল্লতাত ভ্রাতা সুরেশ দাশ গ্রামের উন্নতির জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন। তিনি সোনারঙ্গ পঞ্চায়েত ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট ছিলেন এবং হাই স্কুলেরও প্রেসিডেন্ট ছিলেন। এই প্রসঙ্গে আর একজন পরম গ্রাম-হিতৈষীর নাম উল্লেখযোগ্য, তিনি সরকার বাড়ীর অপূর্ব্ব সেন। গ্রামের প্রতি তাঁর দান অনেক। দুঃস্থ বিধবাদিগের সামান্য অর্থ

সম্বল ও অলঙ্কার তাহারা তাঁহার নিকট গচ্ছিত রাখিত এবং তিনি তাহা তাহাদের প্রয়োজনের সময় দিতেন। হাই স্কুলের জন্য তিনি অকাতরে পরিশ্রম করিয়াছেন। তাঁহার মাতৃভক্তি অনুকরণীয়। ভাল চাকুরী পাইয়াও তিনি মায়ের সেবার যেন কোন ত্রুটী না হয় সেজন্য গ্রামে রহিয়া গেলেন।

হাট বাজর ঃ—আমাদের গ্রামে নিত্য প্রাতে বাজার বসিত। নিত্য নৈমিত্তিক ব্যবহারের সকল দ্রব্যাদি যথা—মাছ, তরকারী, ফল, মুদি ও মনোহারী দ্রব্যাদি পাওয়া যাইত।

মিলন স্থান ও সামাজিক ধর্ম্ম ঃ—সকালে পোষ্ট অফিস ও বাজারে গেলেই সকলের সহিত দেখা হইত। বিকালে রায়ের বাড়ীর নাট-মন্দিরে তাস, পাশা ও দাবা খেলার স্থান ছিল। সন্ধ্যাবেলা মঠবাড়ীতে অনেকে মিলিত হইতেন।

সেই সময়ে একের জন্য অপরের দরদ, স্নেহ ভালবাসা ও সৌহার্দ গভীর ছিল। প্রত্যেক পরিবারের মধ্যে প্রীতি ও জ্ঞাতিভাব এবং সহানুভূতি সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। একে অপরের সুখ দুঃখের ভাগী ছিল এবং একজনের আপদে-বিপদে অন্যে সর্বদা উপস্থিত থাকিত। সেইহেতু কেহ একাকী বা অসহায় বোধ করিত না। গ্রামের লোকদের মধ্যে ঐক্য বজায় রাখিবার জন্য কলিকাতায় একটি 'সোনারঙ্গ সম্মিলনী' বর্ত্তমান আছে। গ্রামের উচ্চ আদর্শকে সঞ্জীবিত রাখিতে যাহারা সচেষ্ট তাহাদের ধন্যবাদ জানাই। বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রণাম, সমবয়স্কদের শুভেচ্ছা ও ছোটদের আশীর্বাদ জানাইয়া আমার স্মৃতিকথা শেষ করি।

৩।৪।৭০ স্বাঃ অতুলচন্দ্র দাশগুপ্ত।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

আধুনিক সোনারঙ্গ ১৯৬১

ফেণী (নোয়াখালি কলেজের অধ্যাপক সুরেশচন্দ্র সেন মহাশয় ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে সোনারঙ্গ গিয়াছিলেন। গ্রাম সম্বন্ধে তাঁহার লিখিত বিবরণ এখানে সন্নিবিষ্ট হইল। তিনি ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দে কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ভারতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। সুরেশ সেন চাঁদপুরের উকিল গিরীশচন্দ্র সেনের তৃতীয় পুত্র এবং প্রফেসর হেমচন্দ্র সেনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তিনি ১৯১৪ সালে ১৫ টাকা বৃত্তি নিয়া ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন, পরে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে সংস্কৃতে এম-এ পাশ করিয়া ফেণী (পূর্ব্ব পাকিস্তান) কলেজে সংস্কৃতে লেক্চারার হইয়া যোগ দেন। তিনি তাঁহার সোনারঙ্গ ভ্রমণ কাহিনীতে লিখিয়াছেন—

আমি ৩।৫।৬১ ইং সোনারঙ্গ গিয়াছিলাম, আমি নারায়ণগঞ্জ হইতে ফেরী স্টীমারে কমলাঘাট গিয়া সেখান হইতে ডিঙ্গি নৌকায় টঙ্গিবাড়ী বাজারে যাই, সেখান হইতে নৌকায় সোনারঙ্গ যাই। আমাদের বাড়ীর পিছন দিকটা পাট ক্ষেতে ভরা থাকায় খাল দিয়া একটু পশ্চিমে গিয়া নূতন লস্কর বাড়ীতে উঠি। সেখান হইতে উত্তর দিকে গুপ্তের বাড়ীর মধ্য দিয়া আমাদের বাড়ীতে যাই। তারপর বড় লস্কর বাড়ীতে সোনারঙ্গ পোষ্ট অফিসে যাই। পরে উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে যাই। সেখানে চিন্ময়ী বালিকা বিদ্যালয় স্থানান্তরিত হইয়াছে এবং ডাঃ অবলাকান্ত সেনদের বাড়ীর ভিতর দিয়া একটু পশ্চিম দিকে গিয়া মুন্সী বাড়ীতে যাই। তথা হইতে নয়াবাদারের পুলে গিয়া ডিঙ্গি নৌকায় কমলাঘাট হইয়া লরীতে নারায়ণগঞ্জে যাই। সেইখান হইতে ৩।৬।৬১ ইং রাত্রিতে রংপুর চলিয়া যাই। আমি গ্রামের পূর্ব দিকে পশ্চিম দিকে ও উত্তর দিকে

যাই নাই। আমাদের গ্রামের পূর্ব দিকে গোবিন্দ টঙ্গির বাড়ীতে এক ঘর মুসলমান। নূতন লস্কর বাড়ীতে এক ঘর মুসলমান। ৺রায় বাহাদুর ললিত সেনদের বাড়ীতে এক ঘর মুসলমান ও মধ্য সরকার বাড়ীতে এক বা এক্বাধিক ঘর মুসলমান পরিবার বাস করিতেছিল। আনন্দ বিশারদ মহাশয়দের বাড়ীতে একজন বয়স্কা বৈদ্য বিধবা এবং গোসাই পাড়াতে বোধ হয় একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন। মুন্সী বাড়ীতে অখিল সেনের দালানে দোতালার পশ্চিমাংশে শ্রীইন্দ্রমোহন বিশ্বাস, তাহার স্ত্রী, এক ছেলে এবং একটি বিবাহযোগ্যা মেয়ে আর গোবিন্দ টঙ্গির বি-পত্নীক জামাই, গোসাই ও তাহার ছোট ছোট ২।৩টি মেয়ে থাকে।

পুর্ব্ব অংশে একদল মুসলমান, স্বাস্থ্য বিভাগের ইন্সপেক্টর এবং উত্তর অংশে রহমান নামে একজন মুসলমান থাকে ও রান্না করে। গ্রামের উত্তর দিকে কিছু (হিন্দু) ধোপা, কৈবর্ত্ত দাস ও বাড়ই থাকে। গ্রামে আর কোন হিন্দু বা মুসলমান থাকে বলিয়া শুনি নাই। উত্তর প্রান্তে মিঠু ব্যাপারীর বাড়ীতে ও তাহার আশেপাশে কিছু মুসলমান থাকিতে পারে। গ্রামে একটিও বড় গাছ চোখে পড়ে নাই। সর্বত্র কেবল পাট ক্ষেত।

শ্রীইন্দ্রমোহন বিশ্বাস সূতারমিস্ত্রি, পুরাপারা গ্রামের কিছু কতদিন হইতে সোনারঙ্গ মুন্সী বাড়ীতে থাকে এবং ঐ বাড়ীর ও জোড়া মঠের তত্ত্বাবধান করে আর মিস্ত্রির কাজ করে। ইন্দ্রমোহনের স্ত্রী প্রত্যহ জোড়ামঠে সন্ধ্যাবাত্তি দেয়। জোড়ামঠের পূর্ব দিকে শিবলিঙ্গ আছে কিন্তু দরজা নাই। চারিদিকের মেঝের পাথরও নাই। ইন্দ্রমোহন, গোসাই ও মুসলমান অফিসারটি বেশ মিলে মিশেই আছে। আমরা বড় খাল দিয়া সোনারঙ্গ যাবার সময় আমাদের নৌকার পাশ দিয়া দুইখানা ছোট ছোট লঞ্চ (Launch) যাত্রীসহ

দীঘি পাড় হইতেছিল। ১৯৬০ ইং বর্ষাকাল হইতে এই লঞ্চ দুইখানা ঢাকা —নারায়ণগঞ্জ—কমলাঘাট দীঘির পাড় যাতায়াত করিতেছিল। ইহার কোন নির্দ্দিষ্ট ষ্টেশন ছিল না। পাড় হইতে যাত্রীরা ডাকিলেই আসিত। ঋষি বাড়ীর খাল দিয়া গ্রামে ঢুকিয়াছিলাম। ঋষি বাড়ীতে তখনও ২।৩ জন লোক ছিল। তাহারা উৎসবাদিতে বাদ্য বাজাইত, অন্য সময়ে অন্য কাজ করিত। মুন্সী বাড়ীতে যাবার আগে চিন্ময়ী বালিকা বিদ্যালয় দেখিয়া ঐ বাড়ী গেলাম। সেখানে অখিল সেনের দালান ভিন্ন অন্য কোন দালানের অস্তিত্ব ছিল না। সেখান হইতে আমি ও ইন্দ্র বিশ্বাস সোনারঙ্গ স্কুলে গেলাম। স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীআবদুর রসিদ সরকার, বি,এ, অন্যান্য শিক্ষকগণ ও ছাত্ররা অতি আন্তরিকতার সহিত আমাকে অভ্যর্থনা করিল এবং কথাবার্ত্তার পর আমাকে মিষ্টি, সবরি (মর্ত্তমান) কলা ও চা দিল। স্কুলের শিক্ষক মোট আটজন তন্মধ্যে হিন্দু শিক্ষক তিনজন। ছাত্র-সংখ্যা ৪০০ তন্মধ্যে হিন্দু ছাত্র ২০০ (অন্য গ্রামের) সোনারঙ্গেরই বাসিন্দা। একজন মুসলমান শিক্ষক, হেড মাষ্টার ও অন্যান্য শিক্ষক-দিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন দেখুন এই গ্রামের যা কিছু ভাল জিনিস দেখিতেছেন সবই হিন্দুদের বিশেষতঃ বৈদ্যদের দান। ইহারা গ্রাম ছাড়িয়া যাওয়ায় আমরা অন্ধকারে ডুবিয়া আছি। হেড মাষ্টারটি বাস্তবিকই কৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। স্কুল হইতে নয়া বাজার কাঠের পুলের নীচে আসিয়া আমরা কমলাঘাটগামী একটি নৌকায় চড়িয়া কমলাঘাট আসি। ঐ নৌকায় একটি বিবাহিতা মুসলমান মহিলা ছিলেন। তাঁহার স্বামী একজন কনেষ্টবল। পরে কমলাঘাট হইতে নারায়ণগঞ্জ হইয়া রংপুর ফিরিয়া আসি।—স্বাঃ সুরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত।

সমাপ্ত

কয়েকটি শোক প্রস্তাব

Karolbagh Bangiya Sansad
7A/45, W.E.A. Karolbagh, New Delhi—5.

করোলবাগ বঙ্গীয় সংসদের এই সভা, অন্যতম সংসদ সদস্য সর্ব্বজন শ্রদ্ধেয় ডঃ পি. এন. সেন মহাশয়ের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করিতেছে এবং তাঁর আত্মার চিরশান্তি কামনা করিতেছে। তাঁর শোকসন্ত' পরিবারবর্গের প্রতি সহানুভূতি জানাইতেছে।

১লা এপ্রিল
১৯৭১

শ্রীসুখেন্দ্রকুমার গুপ্ত
সভাপতি—করোলবাগ বঙ্গীয় সংসদ

Jana Kalyan Samity, New Delhi.
Dated 3. 4. 1971

২রা এপ্রিল, ১৯৭১ তারিখে কালী বাড়ীতে শ্রীসুবিমল দত্ত (I. C. S.) মহাশয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমিতির পরিচালক পরিষদের সভায় স্বর্গীয় ডঃ সেনের পরলোক গমনে যে শোক প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছে তাহার অনুলিপি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—

"সমিতির আজীবন সদস্য ডঃ প্রফুল্লনাথ সেনের আকস্মিক পরলোক গমনে এই সভা গভীর দুঃখ প্রকাশ করিতেছে।

এই সভা তাঁহার আত্মার চিরশান্তি প্রার্থনা করিতেছে এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছে।"

এই শোক প্রস্তাবটি গৃহীত হইলে সভায় উপস্থিত সদস্যগণ দুই মিনিটকাল নীরবে দণ্ডায়মান থাকিয়া ডঃ সেনের আত্মার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

ব্যক্তিগতভাবে আমি শোকসন্তপ্ত সকলের সহিত আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি।

শ্রীষষ্ঠীকুমার মুখোপাধ্যায়
কর্ম্মসচীব

R. B. H. S. School,
Reading Road, New Delhi
Date 2. 4. 71.

ডাঃ পি. এন. সেন মহাশয়ের আকস্মিক পরলোক গমনের সংবাদ শ্রবণে আমরা সকলে মর্মাহত। ডাঃ সেনেব পরলোক গমনে শুধু রাইসিনা বঙ্গীয় উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই, দিল্লীর সমস্ত প্রবাসী বাঙ্গালীই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

ডাঃ সেন দীর্ঘকাল ধরিয়া এই বিদ্যালয়ের সহিত জড়িত ছিলেন এবং কায়মনোবাক্যে এই বিদ্যালয়ের সেবা করিয়াছেন। তাঁহার কীর্ত্তিরূপে এই বিদ্যালয়ের প্রাথমিক বিভাগের বাড়ীটি এবং বিজ্ঞান কক্ষ বর্ত্তমান রহিয়াছে। তাঁহার প্রাণপাত পরিশ্রম ছাড়া এই বাড়ী দুইটি তৈরী হইতে পারিত কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। তিনি একদিকে যেমন ছাত্রদের মঙ্গলের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন, তেমনি শিক্ষকদের সুবিধা অসুবিধার কথাও চিন্তা করিয়াছেন।

এই মানব দরদী ডাঃ সেনের পরলোক গমনে তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারকে সান্ত্বনা দিবার ভাষা আমাদের নাই। তবে যাহা অনিবার্য্য, তাহা স্বীকার করিয়া লইতেই হইবে।

তাই পরম মঙ্গলময় ভগবানের নিকট আমাদের একান্ত প্রার্থনা ডাঃ সেনের লোকান্তরিত আত্মা যেন অক্ষয় শান্তিলাভ করে।

শোকসন্তপ্ত
রাইসিনা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের
ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক শিক্ষিকাবৃন্দ.

R. B. H. S. School,
Mandir Marg, New Delhi.
Date 10. 4. 71.

The Committee of Management of the Raisina Bengali Higher Secondary School has learnt with

profound regret of the death of Dr. Profulla Nath Sen on April 1, 1971. In this connection the Committee recalls with feeling of gratitude the unique services rendered by Late Dr. Sen to the cause of Social and educational upliftment of the Bengali Community of Delhi in general or for the all round progress of the Raisina Bengali Higher Secondary School in particular. Dr. Sen gave his utmost attention & energy for the betterment of this School during his long associations with it as a Member, Secretary and President consequtively of the Managing Committee of the School. The Committee conveys its heartfel sympathy to his wife and other members of his family and pays deep respect to the departed Soul.

Sd/- P. Bhattacharya,
Secretary & Manager,
R. B. H. S. School
Reading Road, New Delhi.

কয়েকটি সংবাদপত্রের মন্তব্য

The Statesman, April 13, 71
Dr. P. N. Sen Dead
By a Staff-reporter,

Dr. P. N. Sen a distinguished medical man who loved Sports and was the Delhi Olympic Association's Secretary at its foundation, died in Delhi on Thursday.

He was 72 but active enough to keep up his practice till a few days ago. Also he had just completed his memois.

Dr. Sen was a member of the Indian Medical Service, serving in West Asia almost althrough World War—II. Back home in 1946, he began a private practice.

Always willing to sparehis time to promote health & culture, Dr. Sen was also associated with a large number of Cultural and Social Organisations. He was respected everywhere & particularly by the youngsrters of Raisina Bengali H. S S. with whom he was connected, for a long time, in an administrative capacity.

The Hindustan Times : Saturday, April 3, 1971.

DR. SEN DEAD. New Delhi, April 2, (UNI)—Dr. P. N. Sen, Founder—Secretary of the Delhi Olympic Association & former President of the local Raisina Bengali Higher Secondary School died here yesterday. He was 72.

The Times of India : Saturday April 3, 1971.

DR. P N. SEN DEAD. New Delhi, April 2. Dr. P. N. Sen, the Founder secretary of the Delhi Olympic Association and former President of the local Raisina Bengali School, died in New Delhi yesterday. He was 72. Dr. Sen was one of the leading medical practitioner.

The Motherland : April 3, 71.

DOA's Founder secretary Dead : Dr. P. N. Sen founder Secretary of Delhi Olympic Association & former President of local R. B. H. S. School died here yesterday. He was 72.

One of the leading medical practitioners of the Capital, Dr. Sen was called to the Indian Medical Service during the World War—II.

Northern India Patrika, April 3, 71 (Allahabad).

DOA founder dead. New Delhi April 2, (UNI) : Dr. P. N. Sen, founder Secretary of the Delhi Olympic Association and former President of local Raisina Bengali Higher Secondary School died here yesterday. He was 72.

One of the leading medical practitioner in the Capital, Dr. Sen was called to the Indian Medical Service during the World War—II

The Indian Express : April 3, 71,

Dr. P. N Sen Dead. Express News Service.

New Delhi 2 : Dr. P. N. Sen, founder Secretary of the Delhi Olympic Association & former President of the local Raisina Bengali Higher Secondary School Society, died here yest rday. He was 72.

A leading medical practitioner, he was called to the Indian Medical Service during the World War—II. He served with distinction in West Asia from 1939 to 1946. After his release from the I M. S. he resumed his practice.

Dr. Sen was closely associated with a large number of Cultural & Social Organisations He comple'ed writing his memoirs a few days before his death.

১। রোষবংশ

শ্রীহর্ষসেন (সেনভূমের রাজা)।

১ম পুত্র কমল পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত।

২য় পুত্র বিমল পিতৃরাজ্য ছাড়িয়া অন্যত্র বাস স্থাপন করেন।

তাঁহার বংশধরগণ : বিমল, বিনায়ক, ধন্বন্তরী, রোষ (ইহার নামে রোষবংশ পরিচিত), সাংকেত, মনোহর, স্বাহা, কাকুস্থ, লক্ষ্মীপতি, উর্দ্ধরণ, বিদ্যাধর, সূর্যসেন (ইনি প্রথমে সোনারং আসিয়া বাস ক:রন)।

- ১। সূর্য্য সেন (কবিরাজ)
  - ২। হৃদয়ানন্দ সেন (কবিরাজ)
    - ৩ গঙ্গাধর সেন কবিরাজ
      - ৪ মধুসূদন
        - ৫ শ্রীহরি
          - ৬ রামনাথ (মুন্সীপাড়া)
          - ৬ যদুনাথ
          - ৬ গোপীনাথ (ছোট উত্তর পাড়া)
        - ৫ রমাকান্ত (রমাকান্ত পাড়া)
        - ৫ গোপাল (সরকার, লস্কর, মজুমদার)
    - ৩ রঘুনাথ সেন কবিরাজ (ভুঁয়া উপাধি পান)
      - ৪ লক্ষ্মণ সেন কবিরাজ
        - ৫ বিশ্বেশ্বর (পশ্চিম পাড়া ভুঁয়া)
        - ৫ শিবপ্রসাদ দক্ষিণ পাড়া ভুঁয়া
      - ৪ গোবিন্দ, ৫ রামকৃষ্ণ, ৬ রামরাম, ৭ বৈদ্যনাথ, ৮ শিবচন্দ্র, ৯ ঈশানচন্দ্র, ১০ মাহমচন্দ্র—দুই পুত্র যোগেশ ও সুরেশ বেড়াগ্রামে চলিয়া যান।
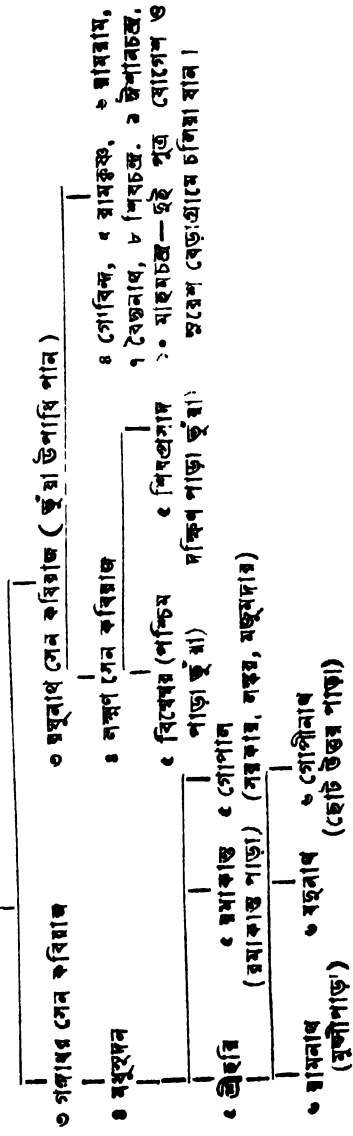
২। দক্ষিণপাড়া ভুঁঞাবাড়ী

৫। শিবপ্রসাদ সেন

৬ কাশীশ্বর, ৭ হরিসেন, ৮ রামচন্দ্র, ৯ রাসমণি — ৬ ধনসেন, ৭ শ্যামসেন, ৮ জয়নারায়ণ — ৬ পরাণ সেন — ৬ রামদেব সেন

৯ কাশীনাথ — ১০ নবকুমার ও ভগ্নী মোক্ষদা × — × × — × × ×

১০ বৈকুণ্ঠ

১১ ভুবন — ১১ অমরেন্দ্র — ১১ সমরেন্দ্র — ১১ ভূপতি

১২ রাজেন্দ্র

১৩ শিবেন্দ্র ও রবীন্দ্র

১১ প্রসন্ন — ১১ পূর্ণচন্দ্র — ১১ রাজমোহন ও ১১ ভগবান *

১২ নিবারণ

১৩ শান্তিরঞ্জন

১২ রজনীকান্ত

১৩ নরেন্দ্র — ১৩ লোকেন্দ্র — ১৩ শৈলেন্দ্র — ১৩ নগেন্দ্র — ১৩ প্রফুল্ল

১৪ নীলমণি

১৫ ত্রিদিব

১৪ কল্যাণ, ১৪ রণজিৎ, ১৪ দেবব্রত

১৪ অশোক, ১৪ অরুণ, ১৪ শেখর — ১৫ রাণা

× ১০ ভগিনী মোক্ষদা
১১ পুত্র আনন্দচন্দ্র সেন
১২ গোবিন্দ
১২ দেবেন্দ্র ১৩ হীরেন্দ্র
১২ উপেন্দ্র ১৩ বিশ্বরঞ্জন
১২ জ্ঞানেন্দ্র ১৩ স্বদেশ, সীতেশ,
পরেশ, নরেশ,
ভোলানাথ ও প্রদীপ

× × ৬ পরাণ সেন ৭ রামশরণ
৮ রতন কৃষ্ণ ৯ নন্দকুমার
১০ দ্বারকানাথ ১১ প্রিয়নাথ
১১ ভগিনী সরোজিনী +
ডাঃ নিবারণ সেন = ১২ শৈলেশ
১৩প্রিতীশ ১৩বাদল ১৩অরুণ ১৩সুধীর
১২ ক্ষিতীশ ১২ স্মৃতিরঞ্জন

× × × ৬ রামদেব ৭ গঙ্গাহরি
৮ রামসুন্দর ৯ কৃষ্ণকুমার
১০ কন্যা বান্দিঠাকুরাণী
১১ পুত্র জগৎনারায়ণ
১২ অমৃতনারায়ণ
১৩ হরগৌরী

* রাজমোহন দ্বিপাড়া এবং
ভগবান ষ.শালঙ্গ চলিয়া যান

৩। পশ্চিমপাড়া ভুঁঞাবাড়ী

- ৫ বিশ্বেশ্বর
  - ৬ বলরাম
    - ৭ ভোলানাথ
      - ৮ সদাশিব
        - ৯ শিবানন্দ
          - ১০ ঈশান
          - ১১ যজ্ঞেশ্বর
          - ১২ প্রমথনাথ
        - ৯ কালীপ্রসাদ
          - ১০ চন্দ্রকান্ত
            - ১১ ললিত
            - ১২ গণেশ
          - ১০ রজনীকান্ত
            - ১১ উপেন্দ্র
            - ১১ ক্ষিতীশ
            - ১১ নরেন্দ্র
      - ৮ রূপচন্দ্র
        - ৯ কাশীচন্দ্র
          - ১০ অক্ষয়কুমার
            - ১১ সতীশ
            - ১১ শ্রীশ
            - ১১ যতীশ
    - ৭ শম্ভুনাথ
      - ৮ গঙ্গাধর
        - ৯ রামনারায়ণ
          - ১০ প্রকাশচন্দ্র
            - ১১ জ্ঞানচন্দ্র, ১২ দেবেন্দ্র
            - ১১ যতীন্দ্র, ১২ রাজেন্দ্র
            - ১১ দ্বিজেন্দ্র, নগেন্দ্র, মনীন্দ্র
            - ১১ হীরেন্দ্র ১২ কল্যাণ
            - ১১ শৈলেন্দ্র
            - ১১ জিতেন্দ্র ১২ অশোক
      - ৮ হরচন্দ্র
        - ৯ বঙ্গচন্দ্র
          - ১০ নারায়ণ
            - ১১ মানু

৪। রমাকান্তপাড়া

৫ রমাকান্ত সেন

৬ রামকৃষ্ণ — ৬ শ্রীকৃষ্ণ (গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া যান) — ৬ জয়কৃষ্ণ (ক)

৭ রামেশ্বর (রামকৃষ্ণের পুত্র) — ৭ কামদেব

৮ পঞ্চানন — ৮ লোকনাথ (চুড়াইন)

৯ জয়নারাণ (উলুবাড়ী) — ৯ শ্রীমন্ত (খ)

১০ গঙ্গাধর

১১ নবকুমার ১১ শশীকুমার

১২ বীরেশ্বর ১২ অমৃতলাল

১৩ কুমুদ ১৩ মাখনলাল ১৪ দক্ষিণা, অরুণ, দেব, অমর ও খোকা

১৪ পরিমল ১৩ রবীন্দ্র

৭ কামদেব
৮ রামধন
৯ যশোবন্ত
১০ রামদুর্লভ
১১ ঈশানচন্দ্র
১২ জগৎবন্ধু (গ)
১২ দীনবন্ধু (ঘ)
১২ বিপিন-বিহারী (ঙ)

ক] ৬ জয়কৃষ্ণ
৭ রঘুদেব
৮ রামমোহন
৯ রামানন্দ
১০ লক্ষ্মীকান্ত
১১ ভগবানচন্দ্র
১২ অতুল ১৩ নির্ম্মলেন্দু
১২ প্রতুল ১৩ বিমলেন্দু ১২ অবনীমোহন

খ] ৯ শ্রীমন্ত
১০ কৃষ্ণমণি
১১ আনন্দ
১২ মনোমোহন
১৩ সুধীর ১৪ পঙ্কজ
১৩ সুশীল
১৩ সুবোধ
১৩ রেণু
১৩ শান্তি ১৩ ইন্দু ১৩ প্রিয়

১ মদনচন্দ্র (মধ্যপাড়া)

গ] ১২ জগবন্ধু
১৩ কামাখ্যা ১৪ প্রমোদ ১৫ (অমূল্য 'হিমাংশু, জ্যোৎস্না, পবিত্র ও শঙ্কর)
১৪ রবীন্দ্র
১৩ প্রফুল্ল ১৪ জীবনকুমার

ঘ] ১২ দীনবন্ধু
১৩ যোগেন্দ্র
১৪ দেবপ্রসাদ

ঙ] ১২ বিপিনবিহারী
১৩ বিনোদ ১৪ পরিমল, গণেশ ও কার্ত্তিক
১৩ পুলিন ১৪ দিলীপ, কুমকুম ও প্রসূন
১৩ অটল ১৪ অরুণ ও তরুণ

কন্যাবংশ ১] কৈলাস দাস—পুত্র গোপাল দাস
২] ললিত দাস কবিরাজ—পুত্র আশুতোষ, সন্তোষ, পরিতোষ

(মধ্যম সরকারবাড়ী)

৮ চণ্ডীপ্রসাদ সরকার

- ৯ রাজচন্দ্র
  - ১০ মৃত্যুঞ্জয়
  - ১১ রামকিঙ্কর
  - ১২ শ্রীনাথ
  - ১৩ সন্তোষ
  - ১৩ গোপাল
- ৯ চন্দ্রমাধব
  - ১০ গঙ্গাজয়
  - ১১ তারিণী—কন্যার পুত্র নিশিকান্ত পুত্র পাঁচু
  - ১১ মহিম
    - ১২ অমৃত
      - ১৩ মতি
        - ১৪ পাঁচু
      - ১৩ প্রমোদ
      - ১৩ অমূল্য
      - ১৩ অমিয়
    - ১২ মহেন্দ্র
      - ১৩ মনীন্দ্র
      - ১৩ সুরেন্দ্র
      - ১৩ ভূপেন্দ্র
        - ১৪ ননী
        - ১৪ রামকৃষ্ণ
  - ১১ বিশ্বেশ্বর
    - ১২ ব্রহ্মানন্দ
      - ১৪ গৌরাঙ্গ
    - ১২ রাজেশ্বর
    - ১২ সত্যানন্দ
  - ১১ ভগ্নি অন্নদা—দোহিত্র বীরেন সেন
- ৯ কাশীনাথ ১০ দুর্গাজয় ১১ চন্দ্রকুমার
  - ১২ নবীন ১৩ সুরেশ
    - ১৩ রমেশ ১৪ সত্যব্রত
    - ১৩ দীনেশ
    - ১৩ নরেশ
    - ১৩ পরেশ
  - ১২ ভুবন
  - ১২ প্রতাপ
  - ১২ রাধিকা
  - ১২ অবিনাশ
  - ১২ বরদা

১১ কালীপ্রসন্ন
১২ উপেন্দ্র
১৩ সঞ্জীব
১৩ উৎফুল্ল
১৩ নীহার

১১ যতীন্দ্র
১২ বিনয়
১২ সুশীল
১২ সুবোধ
১২ প্রবোধ

১১ সত্যেন্দ্র
১২ কালাচাঁদ
১২ গোপাল
১২ নির্মল

৭। মুন্সীপাড়া

৬ রামনাথ সেন

- ৭ অভিরাম
  - ৮ রামপ্রসাদ
    - ৯ রামচন্দ্র
      - ১০ কাশীনাথ
      - ১১ রাজনারায়ণ
        - ১২ অন্নদা
          - ১৩ কুঞ্জলাল ১৪ কিরণকুমার
          - ১৩ লালবিহারী ১৪ হিরণ, স্বর্ণকুমার
          - ১৩ বিপিন ১৪ পান্না
        - ১২ বরদা
          - ১৩ বিনোদ ১৪ সত্যব্রত
          - ১৪ শান্তিব্রত
    - ৯ রামরতন
      - ১০ চন্দ্রশেখর
      - ১১ রজনীকান্ত
      - ১২ হর্ষনাথ ১৩ প্রমোদ, বিশ্ব, চিত্ত, শিশির, মিহির
        - ১৪ রাহুল,
        - ১৪ প্রদীপ, প্রবীর
      - ১২ দেবেন্দ্রনাথ ১৩ পাঁচ পুত্র
      - ১২ হরেন্দ্রনাথ ১৩ অধীর, দিলীপ, অসিত
  - ৮ বিনোদরাম
    - ৯ গৌরীশঙ্কর
    - ১০ মহেশচন্দ্র
    - ১১ কালীকুমার
      - ১১ হরকুমার
      - ১২ সরোজকুমার
      - ১২ শিশির
      - ১২ চুনী
        - ১৩ মণিলাল
        - ১৩ বেণীমাধব
      - ১২ অমূল্য
      - ১২ অনিল
- ৭ লোকনাথ
  - ৮ সদানন্দ
  - ৯ নীলকণ্ঠ
- ৭ গোড়াই সেন
  - ৮ জীবনকৃষ্ণ
  - ৯ কানাই
  - ১০ বিশ্বনাথ
  - ১১ কালিদাস
  - ১২ শৈলেন্দ্র
  - ১২ জ্যোতিরিন্দ্র
  - ১২ খগেন্দ্র
  - ১২ সমরেন্দ্র
  - ১২ বিনয়েন্দ্র

রজনীকান্ত

১১ তারাকান্ত
১২ সুধীর
১৩ পবিত্র
১৩ দিলীপ
১৩ দীপক

১২ প্রিয়কান্ত
১৩ অবলাকান্ত
১৪ প্রিয়রঞ্জন

১২ শশধর
১৩ হরিসাধন
১৩ কালীসাধন
৩ বাণীসাধন

১২ নলিনী
১৩ তরুণ
১৩ তপন ১৪ উদয়, ভানু, ঝণ্টু,
১৩ নীরেন ১৪ ঝণ্টু,
১৩ কমল
১৩ শক্তি

১২ যামিনী
১৩ অরুণ

১০ নবকিশোর
১১ হরিপ্রসন্ন ১২ সুরেশ
১১ তারাপ্রসন্ন
১১ নিবারণ, ১২ নির্ম্মল, অমল
১১ মনোরঞ্জন
১১ নগেন

১০ ভারতচন্দ্র
১১ নিত্যানন্দ
১২ পুত্র
১১ আশুতোষ
১২ ধ্রুবজ্যোতি
১২ বিমলজ্যোতি

১০ পূর্ণচন্দ্র
১১ সতীশ ১২ শৈলেশ, সুবোধ
১১ জ্যোতিশ ১২ বিজয়
১১ ক্ষিতীশ ১২ নৃপেন্দ্র
১১ নীতিশ

১৪। মুন্সেফ বাড়ী

দাশগুপ্ত বংশ

মুদ্গল ঋষি, দাশদেব শর্মা, কবিদাস, রামদাস, চায়ুদাস, পুরন্দর, নরসিংহ, কার্ণদাস, রবিদাস, বাসুদেব, উমাপতি, চণ্ডীশ্বর, বলভদ্র, বিদ্যাধর, অনিরুদ্ধ, মহহরি, মধুসূদন, রঘুরাম, কৃষ্ণজীবন, রামনারায়ণ, ১ গোবিন্দপ্রসাদ (মজুমদারের কন্যা বিবাহ করিয়া প্রথম সোনারঙ্গ আসেন) ২ রাজচন্দ্র

২ রাজচন্দ্র →
- ৩ কালীদাস
  - ৪ মহিমচন্দ্র
    - ৫ মনোরঞ্জন
      - ৬ কালীপদ, বিষ্টু
    - ৫ নারায়ণ
      - ৬ প্রদীপ
- ৩ কালিদাস কবিরাজ
  - ৪ জানকীনাথ
    - ৫ রমণীমোহন
      - ৬ হিরণ, চারু, উষা
  - ৪ বিশ্বেশ্বর
    - ৫ সুরেশ
      - ৬ অমল
      - ৬ নীহার
      - ৬ ইন্দু
      - ৬ বিষ্ণুপদ
    - ৫ জিতেন
      - ৬ পূর্ণানন্দ
    - ৫ তড়িৎ
      - ৬ শ্যামানন্দ
      - ৬ নরেন
      - ৬ হৃদয়
      - ৬ প্রদ্যোৎ
      - ৬ প্রণব
- ৩ রামদুর্লভ
  - ৪ অম্বিকা
    - ৫ হেম
    - ৫ বিমলা
    - ৫ নৃপেন্দ্র
  - ৪ হারাণ
    - ৫ ক্ষিতীশ
      - ৬ শৈলেশ
      - ৬ তুহিনাংশু
      - ৬ নেকটর
      - ৬ সৌরেন্দ্র
      - ৬ পান্না
    - ৫ প্রমথ
      - ৬ দেবশরণ
- ৩ পদ্মলোচন (ক)
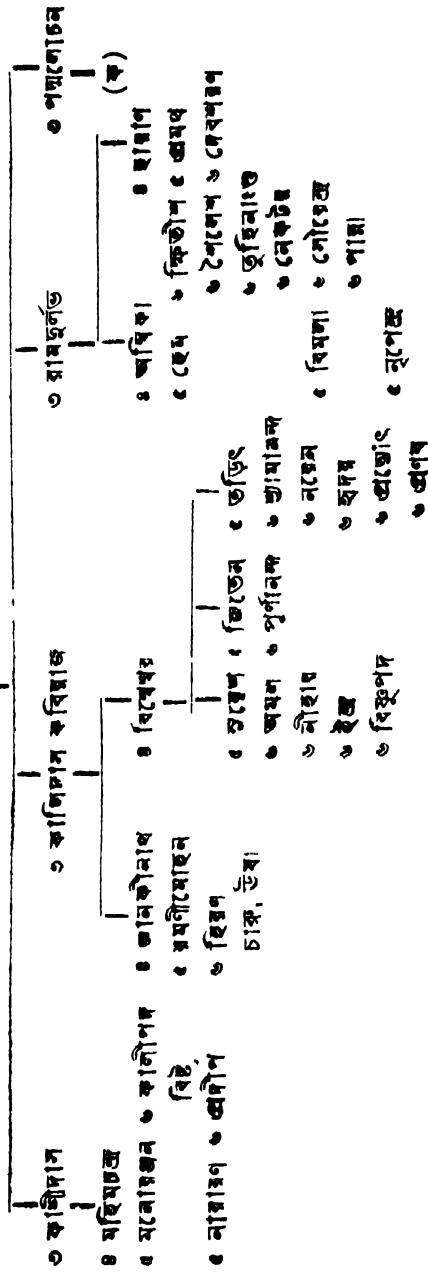
(ক) ৩ পদ্মলোচন →

১০ নীলমণি

১৬। জয়ব্রহ্মণার—চক্রবর্ত্তী পরিবার ও ব্যানার্জ্জী পরিবার

দুই ভাই

১ নীলকান্ত চক্রবর্ত্তী

২ কন্যা গৌরমণি + পদ্মলোচন বন্দ্যোপাধ্যায় বজ্রযোগিনী)

৩ দীনবন্ধু বিদ্যালঙ্কার ৪ রাজেন্দ্র

৩ আনন্দ ৪ প্রফুল্ল

৪ প্রবোধ ৫ রবীন্দ্র, সোমনাথ মঙ্গল,

৩ আদিত্য সুখময়, পাঁচুগোপাল

১ কমলাকান্ত শিরোমণি

২ প্রসন্ন শিরোমণি

৩ যজ্ঞেশ্বর ৩ নগেন্দ্র

৩ নরেন্দ্র

। মিনী

১৭ ব্যানার্জ্জী (বাঁড়ুজ্যে বাড়ী)

১ দুর্গাচরণ ব্যানার্জ্জী

ত সোনারং আসেন)

২ উমাচরণ

চরণ

৩ বামাচরণ ৩ প্রফুল্লচরণ ৩ দীনেশচরণ

৪ শান্তিকুমার ৪ দিলীপকুমার ৪ পুলক

৪ অরুণকুমার

৪ প্রণবকুমার

৪ মিহিরকুমার

৩ সরোজ

৩ কেশব

উমাচরণের খুল্লতাত ভ্রাতার পুত্র : রমেশচন্দ্র : ইহার পুত্রগণ দমদমে থাকেন।

উমাচরণের খুল্লতাত ভ্রাতা : অবিনাশ, যোগেশ, সতীশ

উম পের দূরসম্পর্কী ভ্র : গঙ্গামোহন ও রেবতীমে হ